নাজমুদ্দিন এরবাকান

দাওয়াম

আমার সংগ্রাম

যা কিছু করেছি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই করেছি

দাওয়াম

www.pathagar.com

দাওয়াম

(আমার সংগ্রাম)

প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান

অনুবাদঃ
বুরহান উদ্দিন

সম্পাদনায়ঃ
ড. মোহাম্মদ নূরুল আমিন

মেধা বিকাশ প্রকাশন
৩৮/৩, বাংলা বাজার, ঢাকা

www.pathagar.com

দাওয়াম

(আমার সংগ্রাম)

প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান

অনুবাদ: বুরহান উদ্দিন

সম্পাদনায়: ড. মোহাম্মদ নূরুল আমিন

প্রকাশনায়:

বুরহান উদ্দিন

মেধা বিকাশ প্রকাশন

৩৮/৩, বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল: ০১৭১১-১২৮৫৮৬

পরিবেশনায়:

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

প্রকাশকাল:

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল-২০১৬ ইং

গ্রন্থস্বত্ব : @ লেখক

মুদ্রণে: ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা।

ISBN : 984-31-1426-0

শুভেচ্ছা মূল্য: ৩০০ টাকা মাত্র

DAVAM by Professor Dr. Najmuddin Erbakan, Edit by Borhan Uddin, Published by Meda Bikash Prokashon, Price Tk. 300.00 Only. US$ 5.00

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমি ১৯২৬ সালের ২৬ অক্টোবর তুরস্কের সিনপ শহরে জন্মগ্রহণ করি। বাবার নাম মোহাম্মদ সাবরি এরবাকান। আর মা ছিলেন সিনপ শহরেরই সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের মেয়ে, নাম খামের।

সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে হরহামেশা বদলি হতে থাকা বাবার সাথে আমার শৈশব-কৈশরও কাটে। বাবা ট্রাবজনে বদলি হওয়ার আগেই কায়সেরীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে সক্ষম হই। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর শেষ করেছিলাম ১৯৪৩ সালে। উভয় পরীক্ষায়ই অংশ নিই ইস্তানবুল বয়েজ কলেজ থেকে।

উচ্চশিক্ষার শুরুতেই ভর্তি হয়েছিলাম ইস্তানবুল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে সময় ভর্তি পরীক্ষার প্রচলন না থাকলেও বিশেষ পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সরাসরি ২য় বর্ষের ক্লাস থেকেই শুরু করেছিলাম আমি। আর ১৯৪৮ সালে স্নাতক শেষ হতে না হতেই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষানবিশ শিক্ষক হিসেবে যোগ দিই। এখানে যন্ত্র প্রকৌশল অনুষদের অটোমোবাইল বিভাগই ছিল আমার কর্মস্থল।

১৯৫১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আসলে জার্মানির বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় Aachen Technical University-তে পাঠানো হয়। জার্মান সেনাবাহিনীর জন্য প্রতিষ্ঠিত DVL গবেষণা কেন্দ্রে প্রফেসর স্কিমিদ (Schimidt) এর সাথে কাজ করেছি। দেড় বছরের এই গবেষণা কাজে আমার দায়িত্ব ছিল একটি সমীক্ষা রিপোর্ট তৈরি করা। কিন্তু আমি তিনটি গবেষণাপত্র এই সময় প্রস্তুত করি। জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ডক্টরেট ডিগ্রি আমি এখান থেকেই লাভ করি। আমার তৈরি করা গবেষণাপত্র জার্মানির অর্থ মন্ত্রণালয়ে যাওয়ার পর তারা এটাকে খুব মূল্যায়ন করেন। পাশাপাশি কিভাবে কম জ্বালানি ব্যয় করে গাড়ি তৈরি করা যায় সে ব্যাপারেও একটি থিসিস (গবেষণা) পত্র বের করার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়। আমি এই সময়ের মধ্যে 'How the fuel injected in the Diesel Engines : A Mathenmatial explantions এই শিরোনামে আমার থিসিস প্রস্তুত করি। আমার এই থিসিস বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও জার্নালে প্রকাশিত হওয়ার পরই জার্মানির তৎকালীন

www.pathagar.com

সর্ববৃহৎ ইঞ্জিন ফ্যাক্টরি ডয়েজের (Deutz ইঞ্জিন) এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রফেসর ড. ফ্লাটস (Flats) লিওপার্ডো ট্যাংকের ইঞ্জিন বিষয়ে কাজ করার জন্য তার ফ্যাক্টরিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানান। আমার ডক্টরেট এর থিসিস এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় সেখানে গবেষণা কাজে আমাকে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রযুক্তিগত দিক থেকে লিওপার্ডো ট্যাংকটি অনেক সমস্যাযুক্ত ছিল এবং যার প্রযুক্তিগত উন্নতিকরণ প্রক্রিয়াটাও ছিল খুবই কঠিন। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের সময় জার্মানদের এই লিওপার্ডো ট্যাংকগুলোর জ্বালানি জমে গিয়েছিল ও ট্যাংকগুলো অকেজো হয়ে পড়েছিল। লিওপার্ডো যাতে খুবই প্রতিকূল পরিবেশে সচল থাকে ও জ্বালানি যাতে কোনোভাবেই জমে না যায় তার জন্য জ্বালানি পদ্ধতিকে (ignition system) নতুনভাবে উদ্ভাবনের উপর গুরুত্বারোপ করে। আমরা খুব সফলতার সাথে এই কাজ সম্পন্ন করি।

এক সময়, জার্মান অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত রুহুর (Ruhr) নামক অঞ্চলের কারখানাসমূহের উপর গবেষণা করার জন্য একটি প্রতিনিধিদলের সদস্য হওয়ার জন্য আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই সময় জার্মানিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়। সেই সময় জার্মানির অবস্থা এমন ছিল যে, কোনো একটি বিল্ডিংও সম্পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে ছিল না। আমি জার্মানিতে থাকা অবস্থায় জার্মানি তার অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নতুন করে শুরু করেছিল আর আমি তাদের এই সকল কর্মকাণ্ড নিজে উপস্থিত থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। এই সকল কর্মকাণ্ড ও জার্মানিতে (Ruhr) রুহর অঞ্চলে যে সকল কারখানা দেখেছি সেগুলোর অভিজ্ঞতা, পরবর্তীতে তুরস্কে ভারী শিল্পায়ন ও নগরায়নের কাজে আমার জন্য মাইলফলক হিসেবে কাজ করে।

স্থানীয়ভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠায় এবং এ সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় স্থানীয়ভাবে নতুন করে তুরস্কে ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম। 'জাতীয় ভারী শিল্পায়ন' (National heavy industrialization) প্রকল্প মূলত এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই আমাদের সংগঠনেরও একটা মূল প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করি। এমনকি এটা আমার জীবনেরও একটা লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করি।

www.pathagar.com

আমি জার্মানিতে থাকা অবস্থায় আমাকে ব্যাপকভাবে যে ব্যাপারটি প্রভাবিত করেছিল সেটা হলো: আমি যখন বিভিন্ন কারখানায় গবেষণায় কর্মরত ছিলাম তখন দেখতে পেয়েছি তুরস্কে কৃষি কাজের জন্য ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ আমদানি করা হতো আমার এই অভিজ্ঞতা তুরস্কে 'জাতীয় ইঞ্জিন শিল্প' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাকে ব্যাপকভাবে প্রেরণা যুগিয়েছিল। আমার দেশ ও আমার দেশের মানুষ এই সব যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে পারত। উদাহরণস্বরূপ: তুরস্কে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত 'গোমুশ ইঞ্জিন ফ্যাক্টরি' দেশপ্রেমিক ২০০ জন উদ্যোক্তার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পেছনেও মূল কারণ ছিল দেশকে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত করা। দেশীয় প্রযুক্তিতে উন্নয়ন ঘটানো। কিন্তু শিল্পায়ন আন্দোলন খুব সহজভাবে এগুতে পারেনি। 'গুমুশ' ইঞ্জিন ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার সময় দেশে গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঘটনায় ঘটে যায়। আমরা যাতে আমাদের ফ্যাক্টরিকে চালু করতে না পারি সে জন্য মুদ্রার দু'ধরনের অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়। যেখানে ১ মার্কিন ডলার সমান ২ লিরা/ ৪০ ক্রুশ ছিল সেটাকে ৯ লিরা ২০ ক্রুশে বর্ধিত করা হয়। যার কারণে আমাদের পরিকল্পিত ৬ মিলিয়ন লিরা দিয়ে যে ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম সেটার জন্য ২৫ মিলিয়ন লিরা বরাদ্দ করতে হয়। আর এর মূল উদ্দেশ্য ছিল আমরা যাতে ফ্যাক্টরি খুলতে সমর্থ না হই।

আমাদের এই প্রকল্পের পেছনে, কোনো ব্যাংক ও কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থন না থাকায় এতো বড় একটি প্রকল্প যাতে অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে না যায় সে জন্য সে বছরের পুরোটা সময় আমাদেরকে হাজার বার পরামর্শ করতে হয়। কিন্তু এতো সকল সমস্যার পরও ফ্যাক্টরিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাত দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম, অনেকের স্বেচ্ছাশ্রমের কারণে আমরা সকল বাধাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হই। গোমুশ মোটরের প্রথম নমুনা (Prototype) পরীক্ষা করার জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠালে তাদের পক্ষ থেকে এটা মানসম্মত নয় বলে ঘোষণা করা হয়। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রতি ঘণ্টায় এটার জন্য জ্বালানি হতে হবে ৫.৬ লিটার কিন্তু আমাদের ইঞ্জিন/মোটর এ ছিল এটা ৫.৭ মিটার। এ জন্যই আমাদের ইঞ্জিনকে বাজারজাতকরণের অনুমতি প্রদান করা হয়নি। পরবর্তীতে আমরা আবারো আমাদের ফ্যাক্টরি এটাকে ৫.৬ লিটার জ্বালানিতে নামানোর জন্য কাজ শুরু করি। ইউরোপীয় মান অনুযায়ী ঘণ্টায়

www.pathagar.com

৫.৬ লিটার জ্বালানিতে আমাদের 'গুমুশ মোটর'কে উন্নীত করার প্রচেষ্টা করার সময় আমরা এটাকে ৫.৫ লিটারে নামিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হই। কিন্তু আবারো এটা মানসম্মত হয়নি বলে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। এটা তো বটেই এর পেছনে মানসম্পন্ন হওয়া ও না হওয়ার কোনো ব্যাপার ছিল না। মূল ব্যাপার ছিল শুধু শেফতালি (একটি তারকিশ ফল) যারা উৎপাদন করবে, তারা কেন মোটর উৎপাদন করবে। 'গুমুশ মোটর' ফ্যাক্টরিতে বিনিয়োগকারী, কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের প্রবল উৎসাহে আমরা সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হই। ১৯৬০ সালের মার্চে আমরা 'গুমুশ মোটর' এর যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন করতে শুরু করি। কিন্তু এবার ডাম্পিং (মাল খালাস করা) করা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। আমদানিকারক কোম্পানিসমূহ যে মালামালকে দশ হাজার লিরায় বিক্রি করত সেটাকে ৫ হাজার লিরাতে নামিয়ে নিয়ে আসে। 'গুমুশ মোটর' এই প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে উঠার জন্য একটি ঝুঁকি নিয়ে এর দামকে ৫ হাজার লিরাতে নামিয়ে নিয়ে আসে। তাদের উদ্দেশ্য আমাদের নিকট দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিল। 'গুমুশ মোটর'কে একটি দেউলিয়া কোম্পানিতে পরিণত করা। তাদের এই সকল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যই ছিল তাদের দাসত্ববাদী মানসিকতা। তাদের এই দাসত্ববাদী মানসিকতা কোনো দিন চাইত না যে, তুরস্ক যাতে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নতি লাভ করুক।

'গুমুশ মোটর' সত্যিকার অর্থেই এই জাতির শিল্পায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। একটা ব্যাপার চিন্তা করুন। ১৯৫৬ সালে একটা ফ্যাক্টরি চালু করা হয়েছিল সেটা কোনো দেশের সহযোগিতা ছাড়াই স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই জাতি এটা বিশ্বাস করতে পেরেছে যে, তারা শিল্পায়নে অবশ্যই অগ্রগতি ও সফলতা লাভ করবে। সত্যিকারের সফলতা ছিল আমাদের এটাই।

কেননা একই বছর অটোমোবাইল সেমিনারে এমন কথা বলার মতো লোক ছিল যে, 'আমরা শেফতালি ছাড়া কিছু উৎপাদন করতে পারব না।' কিন্তু আমরা সেই একই সেমিনারে দাঁড়িয়ে বক্তব্যে যখন এই কথা বলেছি যে, 'আমরা মোটর উৎপাদন করতে পারি এবং এই যে, আমরা করেছি'। এই কথা বলা এবং আমাদের আবিষ্কৃত মোটরকে তাদের সামনে উপস্থাপিত করার পর তারা চুপ থাকতে বাধ্য হয়েছে।

www.pathagar.com

আমাদের এই শিল্পায়ন সংগ্রামে তথা এই আন্দোলনকে যিনি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছিলেন তিনি হলেন মেহমেদ জাহিদ কতকু। তিনি ছিলেন তৎকালীন আলেমদের মধ্যে অন্যতম স্বনামধন্য। আমাদের দেশে সর্বপ্রথম এ রকম একটি মোটর কোম্পানি হতে যাচ্ছে এটা জেনে তিনি এটার ব্যাপারে অনেক উন্নয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। আমাদের মহান উস্তাদ তার বক্তব্যে আমাদেরকে সর্বদাই জাতীয় শিল্পায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করতেন। তিনি যে স্থানটিতে বসে আমাদের উদ্দেশ্যে বয়ান করতেন তার সামনে থাকা গাড়িগুলোকে দেখিয়ে বলতেন, 'যদি বাইরে থেকে আমদানিকৃত এসব গাড়ির জায়গায় আমাদের দেশে তৈরি নিজস্ব গাড়ির ব্যবহার করতে পারতাম, আর আমাদের জাতির ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে দূর করে সবার জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে পারতাম।' তিনি আরও বলতেন যে, 'পাশ্চাত্যের সাথে আমাদের এই অর্থনৈতিক সম্পর্কও একই সাথে আমাদের দেশ পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকেও আমদানি করেছে। আমাদের জাতির মুক্তি ও উন্নতির জন্য সচেতন মুসলিমদের একত্রিত হওয়া ও আমাদের সকল শক্তিকে একত্রিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা দুনিয়াবী পদমর্যাদাকে গুরুত্ব না দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টিকেই মূল উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে তারা যদি শত্রু হতে পারে তাহলেই এই জাতির উন্নতি ও উন্নয়ন সম্ভব।' তার এসব কথা ও তার বেদনাস্পর্শী বক্তব্য আমাদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলত। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তার উপর সন্তুষ্ট হোন।

অবশেষে সকল প্রকার বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করে 'গুমুশ মোটর' যখন উৎপাদন শুরু হয় তখন ১৯৬০ সালের শুরুর দিকে আমাদের এই ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করার জন্য আসেন মরহুম আদনান মেন্দরেস। মরহুম আদনান মেন্দরেস যেদিন আমাদের কারখানা পরিদর্শন করার জন্য আসেন, সেই দিনই তিনি প্রথম শুনতে পান আমাদের দেশে সর্বপ্রথম মোটর উৎপাদিত হচ্ছে। এটা দেখে তিনি যে পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিলেন তা ভোলা সম্ভব নয়। একই দিনে তিনি, ফ্যাক্টরির উন্নতির জন্য ও এর স্থবিরাবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য ১ মিলিয়ন ৩০০ হাজার ডলার সাহায্য প্রদান করেন। মরহুম মেন্দরেস সেদিন বলেছিলেন যে, 'আমি একজন কৃষক, এ সব মোটর থেকে আমিও ব্যবহার করেছি। এখন এই একই মোটর/ইঞ্জিনসমূহ তুরস্কেই উৎপাদিত হচ্ছে। আর আমি খুব ভালো করেই জানি যে, এটা কত বড় একটা পদক্ষেপ। আমি আজ সত্যিই আনন্দিত

www.pathagar.com

ও পুলকিত যে, আমার দেশে আজ এগুলো উৎপাদিত হচ্ছে।' তার এই কথাগুলো আজও আমার কানে বাজে।

আমার দেশপ্রেমিক কিছু মানুষ যখন জাতীয় শিল্পায়ন আন্দোলনে রত, তখন একই বছরে আমেরিকান মার্শাল Fonu (ফনো) থেকে আগত সাহায্যের টাকায় মেশিন, জাহাজ, টায়ার, ট্রাক্টর, বাস ও পিকআপ ট্রাক আমদানি আমাদের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। তা না হলে আমরা এর সকল কিছুই নিজেরাই উৎপাদনে সক্ষম ছিলাম। সদ্য যুদ্ধ ফেরত জার্মান জাতি যদি অল্প সময়ের ব্যবধানে শিল্পায়নে এত উন্নতি লাভ করতে পারে আমার দেশ ও জাতি তাদের থেকেও দ্রুতগতিতে শিল্পে ও প্রযুক্তিতে উন্নতি লাভ করত।

কিন্তু আজকের মতো অতীতেও অনেক মানুষ ছিলেন যারা তুরস্কে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও শিল্পায়নে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করুক এটা পছন্দ করতো না। ঐ সময় ক্রেডিট ইউনিয়ন (The union of chamber and comodity exchange of Turkey) রপ্তানি আয় ও আমদানির অর্থসমূহ নিয়ন্ত্রণ করত আর এই (ক্রেডিট) আয়ের সিংহভাগই চলে যেত আমদানিকারকদের হাতে। উদাহরণ স্বরূপ ২০ মিলিয়ন ডলারের যদি বাণিজ্য হতো সেখান থেকে ১৯ মিলিয়ন ডলারই দিতে হতো ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে আর বাকি ১ মিলিয়ন থাকত দেশীয় ব্যবসায়ীদের হাতে। আর এ কারণে দেশীয় ব্যবসায়ীগণ বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটে থাকত। ফলে তারা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে পারত না। কিন্তু মূলত পাওনাদার ছিল দেশীয় ব্যবসায়ীরা। আর এজন্যই বৈদেশিক মুদ্রা ও ক্রেডিট (ঋণ) সমতার ভিত্তিতে দেশীয় উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের দেয়ার দরকার ছিল। এক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা করা, বৈদেশিক মুদ্রাকে দেশীয় উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য মূল ভূমিকা পালন করার দরকার ছিল TOBB'র। এই প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে ১৯৬৬ সালের পূর্বে (TOBB) এই প্রতিষ্ঠানের শিল্প বিভাগের প্রধান হই। এর পর TOBB এর সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হই। এরপর থেকে যখন বৈদেশিক মুদ্রা ও বাণিজ্যিক ঋণকে সমতার ভিত্তিতে বণ্টন করতে শুরু করি তখন থেকেই যারা আগে নিজেদের ইচ্ছামত মুদ্রা ও ঋণ নিতে পারত তারা অসন্তুষ্ট হওয়া শুরু করে। আমাদের এই সুষম বণ্টন নীতির কারণে দেশীয় বিনিয়োগকারীরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। এর পরবর্তী নির্বাচনে TOBB এর সভাপতি নির্বাচিত হই। এরপর থেকেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্র

www.pathagar.com

আমাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি সরকারও আমাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে শুরু করে। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে আমাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করা হয়।

তখন পর্যন্ত Chamber and comodity exchange-কে দেওয়া পৃষ্ঠপোষকতা TOBB (Union of chamber and comodity exchange Turkey) রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হঠাৎ করেই পরিবর্তন করে সকল সম্পদকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। কিন্তু আমরা আমাদের জাতীয় সেবায় কখনো থেমে থাকিনি। যেহেতু তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে আমাদের থেকে সকল অর্থকে স্থানান্তরিত করেছেন। তাহলে আমরাও রাজনীতিতে প্রবেশ করে রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই এই অধিকারকে আদায় করব। ফলে জাতির উন্নতি ও প্রগতির জন্য আমরা নতুন এক পথে যাত্রা শুরু করি।

মাঝে-মধ্যে তারা আমাকে প্রশ্ন করে 'আপনি শিক্ষাগত জীবনে সারাজীবন প্রথম হয়েছেন, প্রখর মেধা ও প্রতিভার অধিকারী একজন মানুষ আপনি। বিজ্ঞান ও গবেষণার নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে যদি আরো নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষকে সেবা করতেন সেটা অনেক বেশি ভালো হতো না?' এক্ষেত্রে আমার উত্তর হলো 'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হতে পারি, নোবেল পুরস্কারও হয়তো পেতে পারি কিন্তু যদি আমার দেশের মানুষ আজকের মতো ক্ষুধা ও দারিদ্রে ভোগে, দুর্বিপাক ও দুর্বিষহ জীবন-যাপন করে দুনিয়াতে ৩ লাখ শিশু প্রতিবছর ক্ষুধায় ও অপুষ্টিতে মৃত্যুবরণ করে তাহলে আপনার সে নোবেল কোন কাজে আসবে?

এজন্যই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এ রকম একটি কল্যাণকর কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দান করেছেন বলে সবাই মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সবচেয়ে উত্তম ও কল্যাণময় কাজ হলো ৭০ মিলিয়ন মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা।

দুনিয়ার সকল মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা। দুনিয়ার সকল পরীক্ষায় জান ও মাল দিয়ে কাজ করে একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়াই হলো সত্যিকারের সার্থকতা। কেননা জীবনের মানেই হলো ঈমান ও জিহাদ।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকানের সংক্ষিপ্ত জীবনী/ ১৩
২. মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং মানুষ / ১৯
৩. শাশ্বত বিধান ইসলামের দিকেই আমাদের দাওয়াত / ৩৭
৪. দুনিয়াকে শাসনকারী শক্তিবর্গ / ৮৫
৫. ইসলামী ঐক্য আন্দোলন / ১১৭
৬. সাইপ্রাস শান্তি মিশন / ১৪২
৭. আমাদের সভ্যতা / ১৫৫
৮. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা / ১৬৭
৯. শিল্পায়ন / ১৭১
১০. ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা / ১৮১
১১. শেষ কথা / ২১৪

www.pathagar.com

প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান -এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম

প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান ১৯২৬ সালের ২৯শে অক্টোবর তুরস্কের সিনপ শহরের সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাহমুদ সাবরি এরবাকান। তার পিতা একজন সরকারী কর্মকর্তা হওয়ায় তিনি বিভিন্ন শহরে বদলি হন। সেই জন্য প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকানকেও বিভিন্ন শহরে পরিবারের সাথে বসবাস করতে হয়।

শিক্ষা জীবন

তিনি কায়সেরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি গৃহশিক্ষকদের মাধ্যমে তিনি ইসলামী শিক্ষাও লাভ করতে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি ইস্তাম্বুলে তার মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু করেন। তার প্রখর মেধা ও অসীম প্রতিভা দেখে শিক্ষকগণ তাকে দেরিয়া নাজমুদ্দিন (জ্ঞানের সাগর) বলে ডাকতেন। সেই সময়ে ভাল ফলাফলধারী ছাত্র-ছাত্রীগণ কোন প্রকার ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারত। কিন্তু প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সমগ্র তুরস্কে প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং ইস্তানবুল টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বিতীয় বর্ষ থেকে তার পড়াশুনা শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে সেখানে ছাত্রদের জন্য নামাজের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। তিনি ছাত্রদের নিয়ে আন্দোলন করে সেখানে একটি ছোট মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি রেকর্ডসংখ্যক নাম্বার পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এরপর তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সহকারী হিসাবে যোগদান করেন। শুধুমাত্র PhD ডিগ্রিধারীগণ ছাড়া অন্য কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়ার সুযোগ পেতনা কিন্তু প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকানকে ক্লাস নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। আর এই সময়ের মধ্যেই তিনি তার PhD'র থিসিস তৈরি করেন। ১৯৫১ সালে তিনি জার্মানির

www.pathagar.com

Aachen Technical University তে গবেষণার জন্য চলে যান। সেখানে তিনি প্রখ্যাত জার্মানবিজ্ঞানী স্কিমি-এর সাথে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাজ করেন। তিনি সেখানে দুই বছরে ৩টি থিসিসপেপার তৈরি করেন। এবং সেখানে থেকে তিনি তার PhD ডিগ্রি লাভ করেন। তার গবেষণায় অল্প জ্বালানি ব্যবহার করে কিভাবে ইঞ্জিন চালানো যায় এই ব্যাপারে তিনি সফল হন। পরবর্তীতে তার থিসিস পেপারগুলো কিছু গুরুত্বপূর্ণ জার্নালে প্রকাশিত হয়। জার্মানির বিখ্যাত ইঞ্জিন গবেষণা কেন্দ্র DEUTZ-র ডিরেক্টর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর ডক্টর ফ্ল্যাটস তাকে Leopard Tank এর গবেষণার জন্য আহ্বান জানান। তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়ে Leopard Tank কে এক অনন্য সাধারণ Tank-কে পরিনত করেন এবং পুনরায় তুরস্কে ফিরে এসে ইস্তানবুল টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী প্রফেসর হিসাবে যোগদান করেন। তিনি মাত্র ২৭ বছর বয়সে এই পদ পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। তিনি ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৫ সালে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি সেকেন্ড লেফটেনেন্ট হিসাবে প্রথম ৬ মাস এবং পরবর্তী ৬ মাস লেফটেনেন্ট হিসাবে কাজ করেন। এই সময়ে তিনি রেগুলার সেনাবাহিনীর কেমন অস্ত্রের প্রয়োজন এমন একটি তালিকা তৈরি করেন। এটা দেখে আমেরিকার ক্যাপ্টেন তার সাথে দেখা করতে চান। ক্যাপ্টেন তাকে প্রশ্ন করেন আপনি কেন এমন অস্ত্র তৈরি করার কথা বলছেন?

এ সকল অস্ত্রের ব্যাপারেতো আমেরিকার সাথে আগেই চুক্তি করা হয়েছে। এরবাকান উত্তর দেন এ সকল অস্ত্র উৎপাদন করার ক্ষমতা আমেরিকার থাকলে আমাদের থাকবেনা কেন? এই সময়কালে তুরস্কে সালাম শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এরবাকানের পিতা শিশুকাল থেকেই তার জন্য গৃহশিক্ষক রেখে তাকে পরিপূর্ণ একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে তুলেন। ইস্তানবুলে আসার পর তিনি প্রখ্যাত আলেম যাহিদ আহমেদের কাছ থেকে ইসলামী শিক্ষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। এরবাকান যখন বক্তব্য রাখতেন তখন তা জুড়ে থাকত কুরআন হাদিস ইসলামের সোনালী ইতিহাস।

কর্মজীবন

সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করে তিনি পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং গুমুশ মোটর" নামে একটি ইঞ্জিন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তুরস্কের ইতিহাসে এটাই ছিল সর্বপ্রথম দেশীয় কোন ইঞ্জিন কোম্পানি। এটা একটি

www.pathagar.com

অনেক বড় সংগ্রাম ছিল তার জীবনে এবং এই জন্য অভ্যন্তরীণ ইয়াহুদি লবির ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং অনেক চড়াই উতরাই এর মধ্য দিয়ে এই কোম্পানিকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তার এই কার্যক্রমে এত কষ্টের কথা শুনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দ্রেস স্বআবেগে কেঁদে ফেলেন এবং বলেন তিনি আগে এই সম্পর্কে জানতে পারলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এটা করে দিতেন। এবং সেই প্রোগ্রামে এরবাকান শিল্পায়নের উপর একটি যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করে। তার এই বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আদনান মেন্দ্রেস তাঁকে Otomobile ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করতে বলেন; তিনি অল্পদিনের মধ্যেই দেভরিম নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু এর অল্প কিছুদিন পরেই একসামরিক অভ্যুত্থানে আদনান মেন্দ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক সরকার তাঁকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে। তার ইঞ্জিন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার সময় তিনি দেখতে পান যে দেশীয় শিল্পউদ্যোক্তাগণ যাতে কোনভাবেই অগ্রসর হতে না পারে এই জন্য The Union of Chambers and Commodity exchange of Turkey এক অদৃশ্য হাতের ইশারায় দেশীয় উদ্যোক্তাদের সাথে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে যাচ্ছিল। এটার অবসানের জন্য তিনি এই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেন এবং অল্পসময়ের মধ্যে তিনি The Union of Chambers and Commodity exchange of Turkey'র সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি সভাপতি হওয়ার পরপরই সেখানে সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে গুরুত্ব দেন যার কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই রাজনৈতিক শক্তির বলে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তিনি রাজনীতিতে আসার ঘোষণা দেন।

রাজনৈতিক জীবন

প্রফেসর ডঃ নাজমুদ্দিন এরবাকান কনিয়া থেকে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করে সংসদ সদস্য হন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারন বক্তা। তার বক্তব্যে সকলেরই মন জুড়িয়ে যেত। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই একজন সুবক্তা হিসাবে সকলের মনে জায়গা করে নেন। এর পাশাপাশি সমগ্র তুরস্কে ইসলাম ও বিজ্ঞান এই বিষয়ে কনফারেন্স করতে শুরু করেন। (এটা বাংলা ভাষায়ও অনুদিত হয়েছে) এবং তার শিক্ষক প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন জাহিদ আহমাদ কতকু এবং অন্যান্য যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের পরামর্শে গঠন করেন মিল্লি গরুশ। এর মাধ্যমেই তুরস্কে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী আন্দোলনের পদযাত্রা শুরু হয়।

www.pathagar.com

মিল্লি গরুশ

তুরস্কে ইসলামের নামে যে কোন ধরণের সংগঠন করা নিষিদ্ধ। যার কারণে তিনি প্রতিকী শব্দ ব্যবহার করে মানুষকে ইসলাম বুঝাতেন মিল্লি গরুশ তেমনি একটি বাক্যাংশ। মিল্লি গরুশ অর্থ হল জাতীয় ভিশন কিন্তু তিনি মিল্লি গরুশ দ্বারা দ্বারা মুসলিম মিল্লাতের ভিশনকে বুঝাতেন।

মিল্লি গরুশের উদ্দেশ্য হল

১. আধ্যাত্মিক উন্নতি। ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া জাতিকে পুনরায় ইসলামের দিকে আহ্বান ও তাদেরকে যোগ্য মুসলিম রূপে গড়ে তোলা। বিশেষ করে যুবকদের মাঝে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করা।

২. অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বিতা। আমেরিকা ও রাশিয়ার থেকে স্বতন্ত্রভাবে শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নতি করে নতুন এক তুরস্ক গঠন।

৩. ইসলামীক ইউনিয়ন গড়ে তোলা ও সকল মুসলিমদেরকে একই প্লাট ফরমে নিয়ে এসে সকল সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করা।

মিল্লি গরুশ প্রতিষ্ঠা করে এর পরেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মিল্লি নিজামপার্টি কিন্তু এই দলটিকে মাত্র ১ বছরের ব্যবধানে নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর তিনি গঠন করেন মিল্লিসালামেত পার্টি এই দলটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৪৮টি আসন লাভ করে এবং কোয়ালিশনের মাধ্যমে শর্তভিত্তিক সরকার গঠন করে। এরবাকান হন সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী (অর্থনীতি বিষয়ক) এবং তার দল থেকে শিল্পমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।

তার এই কোয়ালিশন সরকারের সময় ৬ হাজার মুসলিমকে মুক্ত করে দেয়া, সাইপ্রাসকে গ্রীস থেকে মুক্ত করে তুরকিশ সাইপ্রাস গঠন করা ও মুসলিমদেরকে যুলুমমুক্ত করা, নতুন করে মাদ্রাসা শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা; হাজার হাজার কুরআন কোর্স চালু করা; মাদাসার ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া; সাইদ বদিউযযামান নুরসির রিসালায়ই নুরের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা; সেনানিবাসসহ সকল সরকারি অফিস আদালতে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা; ইসলামী বই পুস্তক প্রকাশের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া; অশ্লীলতা বেহায়াপনা দূর করার লক্ষ্যে আইন করাসহ অনেক কাজ করেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ এই সময়ের মধ্যে তিনি ২৭০টি ভারি শিল্প

www.pathagar.com

কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন যার মধ্যে বিমান তৈরির কারখানা থেকে শুরু করে সকল কিছুই ছিল। তার এই উদ্দম দেখে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অন্য দলকে তার সাথে কোয়ালিশন ছিন্ন করতে বাধ্য করে।

এরপর ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮০তে তুরস্কের কোনিয়াতে কুদ্‌স দিবসের সমাবেশ পালনের অভিযোগে ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০তে সামরিক শাসকগণ ক্যু করে এই পার্টিকেও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। সেই সাথে সকল রাজনৈতিক দলকেও নিষিদ্ধ করা হয়। এরবাকানকে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করে এবং তাকে গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ করে।

তার উপর এই সকল যুলুম নির্যাতন ও তাকে রাজনীতিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর ১৯৮৩ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। মুক্তিলাভের পর দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে দিয়ে তিনি রেফাহ পার্টি গঠন করান। এই পার্টি খুব অল্পসময়েই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ১৯৮৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে ডঃ নাজমুদ্দিন এরবাকানের উপর রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় তিনি আবারো রাজনীতিতে আসেন ও রেফাহ পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর পরই রেফাহ পার্টি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের স্থানীয় মেয়র নির্বাচনে ইস্তানবুল ও আঙ্কারাসহ অনেক সিটি কর্পোরেশনে বিজয় লাভ করে। এরপর নতুন উদ্দমে কাজ করে 'ন্যায়ভিত্তিক সমাজ' এই স্লোগান নিয়ে ১৯৯৬ সালে জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেন। কিন্তু এই সরকার মাত্র ১১ মাস ক্ষমতায় থাকতে পারে পরবর্তীতে এক post modern সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

প্রফেসর ডঃ নাজিমুদ্দিন এরবাকান তার ১১ মাসের শাসনামলে D-8 প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সুদের হারকে কমিয়ে নিয়ে আসেন। মাত্র ১১ মাসের শাসনামলে ৩৩ বিলিয়ন ডলার ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন। সকলের বেতন তিনি ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করেন। জনগণের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার দিকে মনোযোগী হন। শিল্পায়নে গতি ফিরিয়ে এনে ৫ বছরের মধ্যে তুরস্ককে জাপান ও জার্মানির শিল্পায়নকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। মুসলিম দেশগুলোকে নিয়ে কমন মার্কেট চালু করেন। তার এই সকল উত্তোরত্তর সফলতায় ইয়াহুদিরা রেফাহ পার্টিকে বন্ধ করার লক্ষ্যে সকল প্রকার প্রপাগান্ডা চালায় ও তার পার্টি শরিয়ত কায়েম করবে এই

www.pathagar.com

অভিযোগে তাকে সরানোর জন্য সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ কামনা করে। এই অবস্থায় এরবাকান এই শর্তে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তফা দেন যে তার কোয়ালিশন পার্টির নেত্রী তানসু'কে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। কিন্তু ম্যাসন ও ইয়াহুদিদের ধারক বাহক সোলাইমান দেমিরেল বিশ্বাসঘাতকতা করে মেসুদ ইলমাজকে প্রধানমন্ত্রী করে। এইভাবে রেফাহ পার্টিকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকানকেও রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। এরপরে মিল্লি গরুসের অপর নেতা রেজাইকুতানের মাধ্যমে ফজিলত পার্টি গঠন করা হয় যা খুব অল্পসময়েই নিষিদ্ধ করা হয়।

২০০১ এর ২০ জুলাই সা'দাত পার্টি যাত্রা শুরু করে কিন্তু মিল্লি গরুশ-এর ভিতরে তরুন প্রজন্ম ও নতুনদের নেতৃত্ব নেয়ার নামে এবং ইসলাম এর আগে লিবারেল ডেমোক্রেসিকে নিয়ে আসেন কতিপয় নেতা। তারা পরবর্তীতে মিল্লি গরুশকে ভেঙ্গে গঠন করেন একে পার্টি। মিল্লি গরুশ দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। সা'দত পার্টি রয়ে যায় মূলধারার ইসলামী আন্দোলন হিসাবে। সা'দত পাটিতে নেতৃত্ব নিয়ে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। ৮৪ বছর বয়সে ২০১০ সালে এরবাকানকে পুনরায় সাদেত পাটির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সা'দত পার্টি এখনো তাদের এ স্পিরিট ধরে রেখে এগিয়ে চলেছে শত প্রতিকূলতার মাঝেও তুরস্কে ৪র্থ বৃহত্তম দল হিসাবে।

মৃত্যু

দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ৮৫ বছর বয়সে ২০১১ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারী সবাইকে কাঁদিয়ে মহান প্রভুর কাছে চলে যান মহান এ নেতা। তার জানাজায় এত পরিমানে লোক হয়েছিল যে ইস্তানবুলের ৩০০০ বছরের ইতিহাসে এর আগে আর কোন ইস্তানবুলে এত লোকের সমাগম হয়নি। বিশ্বের প্রায় সকল দেশ থেকেই তার জানা যায় অংশগ্রহণ করে। মিডিয়ার ভাষ্য মতে তার জানাযায় প্রায় ৩৫-৪০ লাখ লোকের সমাগম হয়েছিল। তিনি মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর সরকার বিশেষ কোন সম্মানে তাকে যেন দাফন না করে। তারপর ২ ছাত্র তুরস্কের বর্তমান ও তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রজব তায়্যিপ এরদগান এবং আব্দুল্লাহ গুল লাশের খাটিয়া ধরে তার লাশ বহন করেন এবং সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করেন।

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং মানুষ

যে ব্যক্তি নিজেকে চেনে সে তার রবকেও চিনতে পারে। পশুপাখি, মানুষ থেকে শুরু করে দুনিয়ার সকল সৃষ্টি মহান রবের এক অপরূপ কারুকাজ। যে কোনো চিন্তাশীল মানুষ মহান রবের এ সৃষ্টিই দেখে মহান প্রভুকে স্মরণ করে তার সিজদায় অবনত হতে বাধ্য। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন যে, যাতে সে নিজেকে জানতে ও চিনতে পারে। কিন্তু আমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখতে পাই না। আমাদের যে শক্তি সে শক্তি দিয়ে মহান রবকে দেখা সম্ভবও নয়। মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। আল্লাহ তায়ালা তার নূরের ঝলক দেয়ার সাথে সাথে পাহাড় পর্যন্ত পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। আমরা মহান রবের একটি দুর্বল সৃষ্টি। তিনি আমাদেরকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন যার কারণে দুনিয়াতে তাকে দেখা সম্ভব নয়। ইনশাআল্লাহ জান্নাতে আমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখতে পাব। যদি এই হয় অবস্থা, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালাকে চেনার জন্য আমরা কি করব?

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন মানুষকে কাজ করার ও নতুন নতুন চিন্তা করার ক্ষমতা দান করেছেন। মানুষ একটি কাজকে দেখে সে কাজের মতো করে অন্য একটি কাজ করতে পারে। একটি ছবিকে দেখে একজন চিত্রশিল্পী অনুরূপ একটি ছবি আঁকতে পারে।

আমরা যখন আমাদের দৃষ্টিকে আকাশ পানে ঘুরাই তখন কি দেখতে পাই? সীমাহীন সৃষ্টি, অপরূপ সাজানো, অতুলনীয় এক শিল্প ও অনবদ্য শৃঙ্খলা! এটা এতোটাই বড় সৃষ্টি যে, আকাশে থাকা তারকারাজির একটি থেকে অপরটিতে পৌঁছতে ১০০ মিলিয়ন বছর লাগে। যদিও আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সাত স্তবক আসমান সৃষ্টি করেছেন। সাহারা মরুভূমিতে একটি আংটি যেমন এক আকাশ অপর আকাশের কাছে তেমনি একটা কিছু। এই সাত আসমানের উপর রয়েছে আরশে আজীম, আরশে আজীমের উপর রয়েছে কুরসি। তোমার সৃষ্টি কত বিশাল কত মহান হে প্রভু! মহান রবের অস্তিত্বের ও তার মহাবিশ্বের পরিচালনায় তার নিদর্শনসমূহের

www.pathagar.com

অন্যতম একটি বড় নিদর্শন হলো পানি। দুনিয়াতে যত কঠিন পদার্থ, তরল পদার্থ ও গ্যাসীয় পদার্থ আছে এগুলোকে তাপ দিলে এদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ঘনত্ব হ্রাস পায়। আর ঠাণ্ডা করলে এর পরিমাণ কমে যায় এবং ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম আছে আর সেটা হলো পানি। শুধুমাত্র পানি এই নিয়মের আওতাধীন নয়। পানিকে ১০০ ডিগ্রি থেকে +৪ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করলে এর আয়তন কমে যায়। সবচেয়ে ভারি পানি হলো +৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি। আর এজন্যই সাগরে, নদীতে, পুকুরে ও খালেবিলের নিচে অর্থাৎ নিম্নস্তরে +৪ ডিগ্রির চেয়ে ঠাণ্ডা পানি পাওয়া যায় না। এটি যখন +৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে +৩ ডিগ্রি, + ২ ডিগ্রি ও + ১ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা হতে থাকে তখন এর আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে এক ইউনিট পানির আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে যখন এর ওজন কমে যায় তখন এটি উপরের স্তরে উঠে আসে। শূন্য ডিগ্রিতে আসার পর এর আয়তন সর্বোচ্চ পর্যায়ে বৃদ্ধি পায় এবং এটি পানির সর্বোচ্চ স্তরে উঠে আসে। এজন্য পুকুর, নদী ও সাগরের পানি নিচ থেকে নয় উপর থেকে জমাট বাঁধা বরফ খণ্ডে পরিণত হতে শুরু করে। পানির ব্যাপারে মহান রবের এই ব্যতিক্রম নিয়মনীতিকে আমরা একটি রহমতস্বরূপ দেখতে পাই। তার এই রহমতের মাধ্যমে পানির নিচে জীবন্ত অসংখ্য সৃষ্টি যাতে বেঁচে থাকতে পারে এই ব্যবস্থা তিনি করেছেন। আমি ভাবছি যে, পানি কেন অন্যান্য তরল পদার্থের মতো একই বিধান এর অন্তর্গত নয়? এটা কি আপনা-আপনি ঘটেছে। অথবা পানি কি? আমি ঐ নিয়মের অধীন হতে চাই না। এ কথা বলে নিজে নিজেই একটি বিধান রচনা করেছি? এখানেই রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষা ও দলিল। এটা হলো মহান রবের একটি মুজিযা এবং এটা যে কোনো দৈবক্রমিক ঘটনা নয়। আমাদের বিবেক এ কথার সাক্ষী দেয়।

মহান রবের এই বিশাল সৃষ্টি জগতের দিকে যখন আমরা শিক্ষা নেয়ার জন্য সতর্ক দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করি এখানে আমরা খুঁজে পাই না বিন্দুমাত্র কোনো ত্রুটি। কোনো দুর্বলতা। তার সৃষ্টিতে না আছে কোনো গোঁজামিল এবং না আছে কোনো অপূর্ণতার ছোঁয়া। এই মহাবিশ্বের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি সকল প্রকার ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত।

আমাদের মহান রব সকল প্রকার ভুলত্রুটি ও অপূর্ণাঙ্গতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। অসীম কুদরত ও রহমতের মালিক হলেন তিনি 'সুবহান আল্লাহ্'। হে

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তুমি সকল প্রকার ভুলত্রুটি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত এক মহান পবিত্র সত্তা। যদি সাধারণ কোনো মানুষ মহান আল্লাহ্ তায়ালার বিশাল সৃষ্টি জগতের দিকে তাকান তাহলে তিনি মহান আল্লাহ্ তায়ালার কিছু গুণাবলীকে অবলোকন করতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানী মানুষগণ যখন মহান রবের এই অপার সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তারা মহান আল্লাহ্ তায়ালার ৯৯টি সিফাতি নামের মুজিজাকেই অবলোকন করেন।

মানুষ কেমন সৃষ্টি? আমরা হলাম আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব। আহসানে তাকভীম অর্থাৎ ফেরেশতাদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদায় সৃষ্টি। আল্লাহ্ তায়ালার খেলাফতের দায়িত্ব পালনের উপযোগী এক সৃষ্টি।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, পশুদের থেকে মানুষকে মর্যাদাসম্পন্ন করেছে কোন বৈশিষ্ট্যগুলো? সেগুলো কি? সেগুলো হলো :

* সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারা। এর থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি।

* উপকারিতা ও অপকারিতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারা। এখান থেকেই অর্থনীতির জন্ম।

* ন্যায়ের সাথে অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারা। এখান থেকেই উৎপত্তি 'রাজনীতি ও আইনের।'

* সুন্দর এর সাথে অসুন্দরের, ভালোর সাথে মন্দের পার্থক্য করতে উদাহরণস্বরূপ পৃথিবীর হাজার বছরের ইতিহাসে কেউ কি এমন কথা বলতে পারবে যে, একটি বিড়াল একটি বাগানে ঘোরাফেরা করার সময় একটি সুন্দর সুগন্ধি ফুলকে দেখে এ কথা বলেছে যে, 'কি সুন্দর একটি ফুল, কি সুন্দর তার গন্ধ?' না এমনটি কখনো হয়নি হবেও না। কেন? কারণ হলো বিড়াল জানে না সুন্দর কি? শিল্প কি? সে ব্যক্তি এই চারটি বিষয় অর্থাৎ মিথ্যাকে সত্য থেকে, মন্দকে ভালো থেকে, অপকারিতাকে উপকারিতা থেকে জুলুম থেকে আদালতকে পৃথক করতে পারে না সে কখনো সত্যিকারের মানুষ হতে পারে না। বস্তুবাদী চিন্তার অধিকারী মানুষ সর্বদা দুনিয়া ও মানুষের অস্তিত্বকে হঠাৎ সৃষ্টি বলে স্বীকৃতি দান করে। এই চিন্তা সর্বদা আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করে এই বস্তুবাদী চিন্তার অধিকারী মানুষ জাগতিক উপায়-উপকরণকেই সকল কিছুর উৎস মনে করে থাকেন। আর এর ফলাফল হিসেবে বস্তুবাদী (materialism) চিন্তার মাধ্যমে মানবতার কোনো কল্যাণ হতে পারে না। অপরদিকে

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিকতার (Spirituality) মূল কথা হলো মানুষ ও এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির পেছনে এক মহান সত্তার হাত রয়েছে। বস্তুবাদ এবং আধ্যাত্মিকতা একটি অপরটির পরিপূরক। এই দুয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমেই কেবলমাত্র একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠন করা সম্ভব।

এই মহাবিশ্বের জীবনীশক্তিসম্পন্ন সবকিছুকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষ। সবচেয়ে ছোট জীবন্ত বস্তু হলো প্রাণীদের বিভিন্ন কোষ (cell)। জীববিজ্ঞানীদের সর্বশেষ গবেষণা মতে জীবন্ত প্রাণীদের ক্ষুদ্রতম কোষগুলো (cell) একটি অপরটির চেয়ে ভিন্নতর। আর এই পার্থক্যই ডারউনের থিওরির অসারতা প্রমাণ করে। জীববিজ্ঞানীদের মতে, জীবজন্তু, গাছপালা ও মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কোষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। গাছপালার কোষের গঠন হলো, একক ক্রমোজম বিশিষ্ট। জীবজন্তুর কোষের গঠন হলো, দুই ক্রমোজম থেকে (Two nodes chromosomal) শুধুমাত্র মানুষের কোষ তিনটি ক্রোমোজম থেকে গঠিত।

আমরা বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা থেকে জানতে পারলাম যে, একটি ক্রমোজম (Single node chromosomal) থেকে গঠিত গাছপালা, দ্বিক্রমোজম থেকে সৃষ্টি হয়েছে জীবজন্তু। এই দ্বিক্রমোজম বিশিষ্ট জীবজন্তু থেকে তিন ক্রমোজম বিশিষ্ট মানুষ সৃষ্টি হওয়া বা বিবর্তন হওয়া কোনো ক্রমেই সম্ভবপর নয়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই জীব জগৎকে তার স্ব-স্ব কোষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই কোষগুলোকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করে একই প্রাণের মাধ্যমে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। তারা যখন বলে থাকে যে, পৃথিবীতে এই জীববৈচিত্র্য দৈবক্রমে বা অতিপ্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আর অপরদিকে শুধুমাত্র মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে যখন বানরকে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের উদ্দেশ্যই হলো নাস্তিকতাকে সমর্থন করা। সত্যিকার অর্থে বাস্তবতা বা সত্যের সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই।

অপরদিকে আমরা যখন আকাশের দিকে তাকাই অসংখ্য তারকার মিতালী দেখতে পাই। তারকা দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তারা সুন্দরভাবে সাঁতার কেটে চলেছে। এগুলোর মধ্যেকার এই সুন্দর শৃঙ্খলা তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে করে নেওয়া কখনো সম্ভবপর নয়। এরা সবাই তার নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরছে। নিঃসন্দেহে এই অপরূপ শৃঙ্খলা সৃষ্টি মহান আল্লাহ্ তায়ালার। মানুষকে

www.pathagar.com

যেসব বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো 'স্বাধীন ইচ্ছা বা স্বাধীন চিন্তা-চেতনা।' এজন্য এটি হলো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। আর এজন্যই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ময়দান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছার মাধ্যমে যাতে ভালো এবং মন্দের পার্থক্য করতে পারে। এজন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। 'নিজেরটা নিজে বেছে নাও' এমন স্বাধীনতা তিনি মানুষকে প্রদান করেছেন। আমাদেরকে যদি ফেরেশতার মতো স্বাধীন ক্ষমতাহীনভাবে সৃষ্টি করা হতো তাহলে রোবটের সাথে আমাদের কোনো পার্থক্য থাকত না। আল্লাহ্ তায়ালার বিধান মোতাবেক চলার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য যে সম্মান, যে মর্যাদা সেটাও আমরা অর্জন করতে পারতাম না। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বাধীন ক্ষমতা দান করেছেন মানুষকে সম্মানিত করার জন্য। মানুষ তার এই স্বাধীন ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ভালো কাজে ব্যয় করতে পারে আবার খারাপ কাজও করতে পারে। সে যখন ভালো কাজ করবে তখন এর পুরস্কারও সে লাভ করবে।

আচ্ছা তাহলে হক ও বাতিল কাকে বলে? বৃষ্টিপাতের সময় ছাতা নিয়ে বাইরে যাওয়া একজন মানুষের জন্য সঠিক কাজ এবং বৃষ্টিপাতের সময় নিজের ছাতাটিকে ঘরের ভেতর খোলা রেখে বাইরে বের হওয়া নিঃসন্দেহে একটি ভুল কাজ। আমাদের তারকিশ ভাষায় ভুল ও সঠিক শব্দ দু'টি শর্তের সাথে সম্পৃক্ত অথবা সম্পৃক্ত নয় এমন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা জানি দুই গুণ দুই চার হয়। বৃষ্টিপাতের সময় ও চার, সূর্য উঠলে রোদের সময়ও চার, এক সপ্তাহ আগেও চার হাজার বছর পরেও চার। অর্থাৎ সত্য কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত নয়। শর্ত যাই হোক না কেন সকল শর্তের আওতাধীনে যা সঠিক তাই 'হক'। এর বিপরীতে, বিপরীতভাবে, যদি কোনো ব্যক্তি দুই গুণন দুই তিন বলে এটা নিঃসন্দেহে ভুল। যদি বৃষ্টি পড়ে তবুও এটা ভুল যদি রোদ উঠে তবুও ভুল। এক সপ্তাহ আগে বললেও ভুল। হাজার বছর আগে বললেও ভুল। যে কোনো শর্তের আওতাধীন যে কোনো ভুল সেটাকেই বাতিল বলে।

সকল মুসলমানের সর্বপ্রথম এবং মৌলিক কাজ হলো হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে জিহাদ করা। জিহাদ হলো, হককে বিজয়ী করা এবং সকল মানুষের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য। দুনিয়ার কোনো শক্তিকেও পরোয়া না করে নিজের

www.pathagar.com

সকল শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালানো। আমাদের দেশ ও জাতির জন্য সমগ্র উম্মতের জন্য সর্বোপরি দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য আমাদেরকে এই কাজ করতে হবে। পৃথিবীর বুকে বাতিলকে পরাজিত করে সত্য এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে।

জিহাদ একটি ফরজ ইবাদত এবং এর প্রতিদানও সবচেয়ে বড় হওয়ায় এর ব্যাপারে আমাদের দায়িত্বও অনেক বেশি। সকল মানুষের সুখ শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করার স্বার্থেই আমাদের জিহাদের পরিকল্পনা করা আবশ্যক।

একজন পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য এবং শান্তিময় একটি সমাজ কায়েম করার জন্য আমাদেরকে নফসের এবং রাজনৈতিক জিহাদ চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। সকল ইবাদতের জন্যই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যেমন ফজরের নামাজের সময় না হওয়া পর্যন্ত ফজর পড়া যাবে না। অন্যদিকে জিহাদ যে কোনো অবস্থায় যে কোনো সময় করার মতো একটি ইবাদত। সকল ইবাদত একটি পরিমাণে সীমিত। যেমন রোযা, বছরে একমাস, যাকাত চল্লিশ ভাগের একভাগ। কিন্তু জিহাদ নিজের সর্বোচ্চটুকু করা সম্ভব। কিন্তু অপরদিকে জিহাদ নামক ইবাদতটি সুশৃঙ্খলভাবে সংঘটিত হওয়াটা হচ্ছে সাংগঠনিক একটি ইবাদত। জিহাদ এমন একটি ইবাদত যেটা সবার আগে আদায় করা বাঞ্ছনীয়/কর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি মহাশূন্যে সৃষ্টি হতাম এবং সেখান থেকে যদি আমাদেরকে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হতো, তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের করণীয় কি ছিল? মুসলমানরা হলো একটি জিহাদের সেনাবাহিনী। যদি কোনো সংগঠন থাকে তাহলে সেটাতে শামিল হওয়া আর যদি না থাকে তাহলে সর্বপ্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার সৃষ্টি জগতের জন্য ইসলামকে একটি অনুকম্পা ও দয়ার দ্বীন হিসেবে দান করেছেন। আমাদের নিজেদেরকে সংশোধন করে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার পাশাপাশি অন্য মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে সকল শক্তি দিয়ে কাজ করাকেই জিহাদ বলে।

সাহাবীগণ রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বলেছেন, নামাজ হলো দ্বীনের স্তম্ভ আর জিহাদ হলো তার চূড়া/শিখর। জিহাদের মতো এতোবড় মর্যাদাবান আর অন্য কোনো ইবাদত আছে কি?'

www.pathagar.com

তখন রাসূল (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'সারাজীবন সারারাত, সারাদিন ইবাদত করা কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব? তারা বললেন যে, 'না ইয়া রাসূলুল্লাহ!'

রাসূল (সা.) পুনরায় তাদেরকে বলেন, 'তোমরা যদি সারাজীবন রাতদিন ইবাদত করো তবুও তোমরা জিহাদের মতো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না।' অর্থাৎ একজন মানুষ যদি বিরামহীনভাবে সারাজীবন রোযা রাখে, নামায পড়ে তবুও সে জিহাদের যে সওয়াব সেটা সে অর্জন করতে পারবে না।'

একজন মুসলমান তার পরিবারের জন্য রুটি রোজগারের ব্যবস্থা না করে কখনো এ কথা বলতে পারবে না যে, 'ওরা না খেয়ে থাকলে আমার কি? ওদের দায়িত্ব কর্তব্য কি আমার। সত্য পথ এবং সত্য পথের পথিক একজন মানুষ কখনো এই মনোভাবাপন্ন হতে পারে না। সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে তার চেতনায় সর্বদা এই বিষয়টি থাকবে যে, 'আমি মুসলমান, আমি জিহাদ করব। সকল মানুষের ক্ষুধা, দারিদ্র্য দূর করবে এমন একটি পদ্ধতির (system order) জন্য আমরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালাব। কারণ তা না হলে ক্ষুধা, দারিদ্র্যে কষ্ট পাওয়া ব্যক্তি, যে দারিদ্র্যের জন্য তার পরিবার-পরিজনের মুখে খাবার তুলে দিতে পারছে না তার সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাকে প্রশ্ন করবেন। এই জন্য আমি জিহাদ করব, জিহাদ করব জিহাদ করব।' মানুষ হওয়ার অর্থই হলো এমন হওয়া। ভালো মানুষ হওয়ার অর্থই হলো এমন মানুষ হওয়া। আমরা যে রাজনীতি করি সে রাজনীতিও এর জন্য। এরই নাম জিহাদ। রাজনীতি আমাকে কখনো প্রভাবিত করে না। কুরআনের অর্ধেক প্রতিষ্ঠার জন্যও আমি কাজ করি না। কারণ কুরআনুল কারিমে জিহাদ সম্পর্কে সর্বাধিক আয়াত রয়েছে। আর এজন্যই আমরা রাজনীতি করি না জিহাদ করি। যে ব্যক্তি জিহাদ করবে না সে দুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না।

কে বলেছেন এটা? এক হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এক বেদুঈন মুহম্মদ (সা.)-এর কাছে এলেন এবং বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ! আমি মুসলমান হতে চাই। আমি কী করব? রাসূল (সা.) তাকে দু'টি বিষয় সম্পর্কে বললেন, 'এক. কালিমায়ে শাহাদাত পড়ো, দুই. আমার হাতে বাইয়াত করবে।'

'কালেমায়ে শাহাদাত কিভাবে পড়ব?' এই বেদুঈন এই প্রশ্ন করলে রাসূল (সা.) তাকে কালেমায়ে শাহাদাত সম্পর্কে বললেন। এরপর বেদুঈন কালেমা

www.pathagar.com

পড়ে মুসলমান হলো।' এখন তুমি আমার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করবে। রাসূল (সা.) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমি কিসের উপর বাইয়াত করব?' বেদুঈন রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করল। রাসূল তাকে ৬টি বিষয়ে বাইয়াত করার জন্য বললেন, 'কালেমায়ে শাহাদাত, নামায, রোজা, যাকাত, হজ্ব এবং জিহাদ।'

বেদুঈন এগুলো শোনার পর বলল যে, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) আমি ঘনবসতিপূর্ণ একটি গোত্র থেকে এসেছি। আমার তিনটি উট আছে। এগুলোর দুধ দিয়ে আমার জীবন অতিবাহিত হয়। আপনি কি আমাকে যাকাত এর বিষয়টি মওকুফ করে দেবেন? আপনি আমাকে নতুন দেখছেন। আমি নিজেকে আমার ছোটকাল থেকে খুব ভালো করে চিনি। আমি খুবই ভীতু প্রকৃতির একজন মানুষ। আপনি যদি আমাকে সুযোগ দেন আমি জিহাদের উপরও বাইয়াত করব না। কারণ দুনিয়ার বুকে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমার সকল শক্তি দিয়ে কাজ করব এমন কথা যদি আজ আমি আপনাকে দিই। আগামীকাল এই পথে কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়ে, ভয় পেয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে যাই, কথা দিয়ে যদি না রাখতে পেরে যদি ধর্মত্যাগী হই নিঃসন্দেহে এর শাস্তি বেশি হবে। এজন্য সবচেয়ে ভালো হলো প্রথম থেকেই কথা দেবো না। আমি জিহাদ ও যাকাতের জন্য কথা দেবো না। কিন্তু আপনি যেভাবে বলেছেন, অন্যান্য শর্তের কথা কালেমায়ে শাহাদাত, নামায, রোযা, হজ্ব এসব ইবাদত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বরং এর চেয়েও বেশি করব।

হযরত মুহম্মদ (সা.) তাকে সতর্কতার জন্য বললেন, 'আচ্ছা তাহলে জান্নাতে কি নিয়ে যাবে?' ঈমান আছে, কালেমায়ে শাহাদাতও আছে জান্নাতে যেতে পারবা কিন্তু পরে যেতে হবে। নামাজ পড়ে, হ্যাঁ নামাজের হিসাব দিতে পারবে। রোযা রেখে, হ্যাঁ সে রোযার হিসাব দিতে পারবে। হজ্বে যাও বা না যাও হিসাব দিতে পারবে। কিন্তু জিহাদও তো ফরজ এর হিসাব কিভাবে দেবে? আর এজন্যই, যে জিহাদ করবে না সে দুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না।

আমি সব সময় সুযোগ পেলেই এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেই যে, আমরা দ্বীন ইসলামকে চিনি কিন্তু এর সম্পর্কে কতটুকু জানি? উদাহরণস্বরূপ আমি আমার একটি স্মৃতি শেয়ার করতে চাই। কিরগিজস্তানে গিয়েছিলাম। ১০০ জন

www.pathagar.com

ব্যবসায়ীর একটা গ্রুপ ছিল। কিরগিজস্তানের প্রেসিডেন্টের সাথে ৪ ঘণ্টা কথা বলেছি। তিনি বলেছিলেন, 'আমি অর্থনীতির একজন অধ্যাপক। আগে আমি কম্যুনিজমের প্রশংসা করতাম, পুঁজিবাদ (capitalism) এর বিরোধিতা করতাম। এখন কম্যুনিজম নেই পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে কাজ করতে হচ্ছে। যার কারণে আমি খুবই লজ্জাবোধ করি এবং আমার বন্ধু-বান্ধবদেরকে মুখ দেখাতে পারি না।' যে পুঁজিবাদের একসময় আমি ঘোর বিরোধী ছিলাম, গালাগালি করতাম আর সেটাকেই কিনা আজ আমি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। একটুও লজ্জা করে না। তারা আমাকে এটা বলবে এই চিন্তায়। আমি যে কি করব বুঝতে পারছি না।' পরে আমি তাকে বললাম–

'এর একটি সুন্দর পদ্ধতি আছে আর সেটা হলো ইনসাফভিত্তিক অর্থনীতি (just order)।' আমি তাকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত এই বিষয়টি বুঝিয়েছি। এরপর তারা এটা মন্ত্রিপরিষদে আলোচনা করেছে। আমরা যে কিতাব পত্র নিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলোকে তাদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তিনি তার পাশে থাকা বন্ধুদের বলে, 'এরবাকান আমার সম্মানকে বৃদ্ধিকারী একজন মেহমান। ইসলামের ইতিহাসে আমাদের অনেক অবদান রয়েছে। তিনি আমাকে বালাসাগুন নামক শহরে নিয়ে গিয়েছিলেন আর সেখানে জন্ম নিয়েছিলেন প্রখ্যাত আলেম ইউসুফ হাস হাজিবি। তার শহর দেখানোর জন্যই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।' আমাদের ১০০ জনের একটি গ্রুপ ছিল পরবর্তীতে এই ১০০ জনের সাথী হিসেবে যোগ দেন আরও ২০০ জন। আর বালাসাগুন হলো রেশম ঘেরা একটি ঐতিহাসিক শহর। এই পথ অতিক্রম করার সময় মরুযাত্রীদল নিজেদেরকে নতুনরূপে আবিষ্কার করত। এক হাজার বছর পূর্বেই এই শহরে এক মিলিয়ন মানুষের বসবাস ছিল। কিন্তু আজ এটি একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। মসজিদে গেলাম। শুধুমাত্র মিনার আর গম্বুজ এর সাথে মিহরাবটা অবশিষ্ট আছে। আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আমরা ৩০০ জনের একটি দল সবাইকে বললাম যে, আসেন আমাদের পিতৃপুরুষদের নামে এখানে একবার আজান দিয়ে আসর নামাজটা এখানেই পড়ে নিই। এরপর নামাজ পড়ে সালাম ফিরিয়ে পেছনে তাকিয়ে এক ৯০ বছর বয়স্ক কিরগিজকে দেখলাম উনি কাঁদছেন। আপনি কেন কাঁদছেন? তাকে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, আমি কাঁদব না তাহলে কে কাঁদবে? আমি ৯৬ বছর বয়স্ক একজন মানুষ। আমি একটি মুসলিম পরিবারের সন্তান। ৭-১১ বছর বয়সের সময়ও আমি এক

www.pathagar.com

ওয়াক্ত নামাজও ক্বাজা করিনি এবং আমি একজন হাফিজ ছিলাম। এই কম্যুনিজম (communism) নামক বিপদ আসার পর আমি যে হাফিজ ছিলাম তাও ভুলে গেছি এবং নামাজ কিভাবে পড়ব সেটাও ভুলে গেছি। আমি যদি না ভুলতাম আপনাদের এই জামায়াতে শামিল হয়ে নামাজ পড়তে পারতাম। ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় আমি ভুলে গেছি। এজন্যই আমি কাঁদছি।

কত বড় বেদনা! সে ইসলামের জন্য কাঁদছে। কিন্তু 'ইসলাম কি?' এটা সে জানে না। কিরগিজ এই মুসলিমের উপমা সাবধান আপনারা ভুলে যাবেন না। 'আমরাও কি এমন কিনা?' এ প্রশ্ন যদি আমাদেরকে করি। আল্‌হামদুলিল্লাহ্ আমি মুসলিম। মুসলিম হিসেবেই আমি বাঁচতে চাই। আচ্ছা তাহলে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম কি? তা কি আমরা জানি?

আমাদের বিশ্বাসের অন্যতম একটি দিক হলো আমাদের কেউ তার নিজের জন্য বেঁচে বসবাস করতে পারবে না। তার ভাইয়ের জন্য তাকে বেঁচে বসবাস করতে হবে। সে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের জন্য কাজ করতে চায় এটাই হলো তার পথ। সে শুধুমাত্র নিজের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করবে না। কারণ রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ততোক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না। যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তার মুমিন ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে। রাসূল (সা.) অপর একটি হাদিসে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে।' অর্থাৎ শুধুমাত্র নিজের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ভালো কাজ করাই ভালো কাজ নয়। ভালো কাজ, অপরের জন্যও করতে হবে। জিহাদের মাধ্যমে সকল মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে।

এখন যদি বলি, 'আমাদের পাশেই একজন প্রতিবেশী আছে। মাঝে মধ্যে উনার বাসার জানালা খোলা থাকে। জানালা দিয়ে দেখলাম কি ৯০ বছর বয়স্ক একজন মানুষ। যার কপাল সর্বদায় সিজদাবনত থাকে। অথবা তাসবীহ্ তাহ্‌লিলে ব্যস্ত থাকে অথবা নামাজ পড়ে। এখন যদি বলি কতো ভালো একজন মানুষ।' অনেক মানুষ আগ্রহভরে তার অনুসরণ করে বলবে যে, 'আহ্ আমিও যদি এমন মানুষ হতে পারতাম'। কিন্তু তারা কখনোই চিন্তা করে এ কথা বলবে না যে, 'এই লোকটি কি কখনো জিহাদ করে?' না সে জিহাদ করে না। যদি তাই হয় তাহলে সে দুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না।

www.pathagar.com

যদি এভাবে চিন্তা করি যে, আমি আমার অফিসে একটি সোফায় বসে আছি। আমি যে সোফায় বসে আছি, সেটার এক পাশের হাতলে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক একটা হাতল আছে। অপরদিকে আমি যে সোফায় বসে আছি তার সামনে আছে ১০,০০০ ভোল্টের বিদ্যুৎবাহী কেবল। এক অন্ধ বাইরে থেকে তার লাঠিতে ভর করে খট খট করে আসছে। বিদ্যুৎবাহী কেবলটির কথা সেই অন্ধ ব্যক্তিটি মোটেও জানে না। সে না জানার কারণে আস্তে আস্তে সেটার দিকে এগোচ্ছে। অপরদিকে আমিও আমার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

অন্য কোনো দিকে আমার কোনো খেয়াল নেই। আমি যদি এই অবস্থায় থাকি তাহলে অন্ধ ব্যক্তিটি বৈদ্যুতিক কেবলের সাথে জড়িয়ে কয়লা হয়ে যাবে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আমার হাতের কাছে থাকা বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক হাতলটি দিয়ে অনতিবিলম্বে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা। এই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে যদি আমার এক হাত ভেঙে যাওয়ারও উপক্রম হয় তবুও আমার সকল শক্তি দিয়ে আমার হাতকে রক্ষা করে সেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু আমি যদি এই কাজটি না করি তাহলে মানুষ আমাকে কি বলবে? বলবে যে, 'ভাই আপনি কি মানুষ না অন্য কিছু? এটা কিভাবে সম্ভব যে, আপনি এই কেবলের ক্ষতিকর দিক জানা সত্ত্বেও কিভাবে আপনি একজন মানুষের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন?' 'আমি আমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম সে আসছে আমি সেটা জানি না। এমনকি এই বৈদ্যুতিক কেবল আমি সেখানে সেটও করিনি। এর বিদ্যুৎ সংযোগও আমি দেইনি। এক্ষেত্রে আমার কোনো অপরাধ নেই।' তার আত্মপক্ষ সমর্থনের এই যুক্তি কোনো যুক্তিতে টিকবে? নিশ্চিত অর্থেই তার এই খোঁড়া যুক্তি কোনো কাজে আসবে না। কেননা একজন মানুষ তার আশপাশের সমাজের অবস্থা ও দেশ-জাতি সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। যদি তার দেশ তার সমাজ কোনো অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয় তাহলে সে অধঃপতন থেকে তার দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য কাজ করবে। তাহলে যখন বাতিলপন্থী সকল ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া একত্রিত হয়ে আমার দেশ ও জাতির ক্ষতি সাধনে ব্যস্ত। সাম্রাজ্যবাদীরা যখন সমগ্র দুনিয়ায় তার শোষণের হাত দিয়ে দুনিয়ার মানুষকে শোষণে মশগুল তখন আমি কিভাবে একজন সচেতন মানুষ হিসেবে আমার নিজের আরামদায়ক সোফায় বসে নিশ্চিন্ত মনে আমার কাজে ব্যস্ত থাকতে পারি? আমি যেমনিভাবে ঐ অন্ধ

www.pathagar.com

ব্যক্তিটির জীবন রক্ষার্থে আমার সকল শক্তি দিয়ে সেই বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য তেমনিভাবে আমার দেশ, আমার জাতি এবং দুনিয়ার সকল মানুষের কল্যাণের জন্য আমার সকল মেধা, যোগ্যতা ও শক্তি দিয়ে সংগ্রাম করতে আমি বাধ্য। আর এর মাধ্যমেই আমি একজন ভালো মানুষ হতে পারি। সকল মানুষের সুখ, শান্তি ও কল্যাণের জন্য মিথ্যার নয়, সত্যের, অসুন্দর নয় সুন্দরের, খারাপের নয় ভালোর, অপকারীর নয় উপকারীর, জুলুম-নির্যাতন নয় আদালতের পক্ষে আমাদের সকল শক্তি দিয়ে সাংগঠনিকভাবে প্রচেষ্টা চালানো আমাদের কর্তব্য। তা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে যে কর দিয়ে দেশের মানুষের সেবা করার কথা ছিল, দরিদ্র মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেয়ার কথা ছিল সেই টাকা চলে যাবে দেশীয় ও বিদেশী সুদি কারবারীদের কাছে। আর আমরা তখন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করব। জুলুম এবং শোষণের বিরুদ্ধে যদি আমরা সচেতন না হই তাহলে আমাদের মনের অজান্তেই তাদেরকে সমর্থন করে যাব। এ জন্য আমি বলি যে, 'হকের জন্য কাজ না করা, আর বাতিলের জন্য কাজ করা এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।'

যায়নবাদীরা আমাদের অন্যান্য ইবাদতে কখনোই বাধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু যখনই জিহাদের বিষয় আসে তখনই তারা তাদের সকল শক্তি দিয়ে এর থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে তারা তাদের সকল শক্তিকে নিয়োজিত করে। তোমার যত ইচ্ছা নামাজ পড়, রোযা রাখ তাতে তাদের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যখনই রাষ্ট্রীয় কাজে ইসলামী আইন ও অনুশাসন নিয়ে আসা হয় তখন তারা ইসলামকে সহ্য করতে পারে না। এজন্যই তারা ২০০ বছর ধরে এর বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক প্রচারণা চালিয়ে আসছে। মুসলমান শুধুমাত্র নামাজ পড়ে আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়ার চেষ্টা করবে। এটাই হলো তাদের প্রচেষ্টা। এক্ষেত্রে আমরা কি করব? আইনে একটি ধারা আছে, 'সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল হলো দুশমনের সাক্ষ্য'। আমরা জানি যে, দুশমন সবচেয়ে ভয় পায় জিহাদকে। এই জন্য সকল সামর্থ্য ও শক্তি দিয়ে আমাদেরকে জিহাদ করতে হবে। আর এটা যদি আমরা না করি তাহলে দুনিয়াতেও আমরা শোষিত, বঞ্চিত হব আখিরাতেও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। আর এই অবস্থায় জিহাদ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা আমাদের সামনে নেই।

www.pathagar.com

আবদুল হাকিম আরওয়াসী (র.) যাতে মানুষকে সত্য পথ দেখাতে না পারে, তাদেরকে সচেতন মুসলিম রূপে গড়ে তুলতে না পারে সে জন্য সরকার প্রথমে তাকে অন্য শহরে বদলি করেছিল। তিনি সেখানেও গিয়ে মানুষের মাঝে জিহাদী চেতনা জাগ্রত করতে থাকেন আর এই অপরাধে তাকে একটি ঘরে বন্দি করে রাখা হয়। সে তাদের চোখের সামনেই থাকবে এই শর্তে তাকে সপ্তাহে একবার মুক্ত বাতাস খাওয়ার জন্য বাইরে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। একদিন তিনি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দেখেন যে, তার ঘরের পাশেই একটি বাজার বসেছে। সেই সময় এক গ্রাম্য মূর্খ ব্যক্তি তার নূরানী চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করে যে, আপনি কে? তিনি উত্তর দেন আমি আবদুল হাকিম আরওয়াসী। এই কথা শুনে সে তার সামনে গিয়ে বলে, 'আমরা খুবই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আছি, আপনি এই উম্মতের মুক্তির জন্য দোয়া করুন।'

আরওয়াসী (র.) তাকে একপলক দেখে বাজারের মানুষের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বলেন, 'যে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে পালন করে না তার জন্য দোয়া করা যায় না, আর দোয়া করলেও সেটা কবুল হয় না।'

এজন্য ভাবনাহীন এবং ইসলাম থেকে দূরে থেকে যে জাতি তার জীবন অতিবাহিত করে তাদের জন্য যত দোয়াই করি না কেন কোনো লাভ হবে না। এ জন্য ইসলামের দুশমনরা জিহাদের মূল বিষয়বস্তুকে বুঝার ক্ষেত্রে এবং বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য তাদের সকল শক্তিকে ব্যবহার করে থাকে। 'আমরা জিহাদ করতে চাই কিন্তু তারা যে আমাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।' এ কথা অনেকেই বলে থাকেন। অবশ্যই তারা বাধা দেবে। তারা আমাদের ইতিহাস থেকে এ কথা খুব ভালোভাবেই জানে যে, মুসলিমরা যদি তাদের জিহাদী চেতনায় জেগে ওঠে তাহলে তাদের মানবতা বিধ্বংসী সকল পদ্ধতি (system) ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কিভাবে কাজ করব? জিহাদ ইবাদতকে আমরা পরিপূর্ণভাবে তার হক আদায় করে কিভাবে পালন করতে পারি? এ জন্য আমাদেরকে ১০টি বিষয় খুব ভালো করে জানতে হবে। সেগুলো কি?

১. ঈমানদার হওয়া: আমাদেরকে শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী হতে হবে। যে কোনো বাধা-বিপদে পিছপা না হওয়া।

www.pathagar.com

২. ইখলাসের অধিকারী হওয়াঃ পদ, মর্যাদা, গৌরব, খ্যাতির পেছনে ছুটে না চলা। প্রদর্শনেচ্ছা থেকে দূরে থেকে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

৩. তাক্ওয়াবান হওয়াঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ছাড়া আর অন্য কাউকে ভয় না করা। বিবেকের প্রশ্নে কোনো প্রকার সংকোচ ব্যতীত সত্য কথা বলা, দৃঢ়ভাবে উত্তর দেওয়া।

৪. 'ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সংগঠনভুক্ত হওয়াঃ আমরা যে সকল বন্ধু-বান্ধবের সাথে কাজ করব তাদের সাথে মতানৈক্যে জড়িয়ে পৃথক না হওয়া। কেননা পরিপূর্ণতা কেবলমাত্র সহনশীলতার মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে।

৫. সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হওয়াঃ গিবত, পরচর্চা, পরনিন্দা, হিংসা, অহংকার, ঘৃণা, অপবাদের মতো খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা এবং গুপ্তচর বৃত্তি না করা। আর এটা নফসের গোলাম হয়ে নয়, নফসকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমেই সম্ভব।

৬. ইহসানের অধিকারী হওয়াঃ আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বকে সুন্দরভাবে ও সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করা।

৭. পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করাঃ আমি যা বলেছি তাই হবে। এমন মনোভাব প্রকাশ না করা। পরামর্শে আমি আমার চিন্তাকে পেশ করব। আমার চিন্তা ভুলও হতে পারে এমন কথা বলে শুরু করা।

৮. আনুগত্য করাঃ যে সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছে সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সভাপতির আনুগত্য করা। অনীহা বা ঔদ্ধত্যবোধ প্রকাশ না করা।

৯. অবিচলতা অর্জন করাঃ জিহাদের সময় ইসলামের অন্যান্য বিধানকে ও ইবাদতকে সুন্দরভাবে পালন করা। কোনো অবস্থাতেই মৌলিক বিধান ও মৌলিক ইবাদতসমূহকে ত্যাগ না করা।

১০. বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করাঃ সাদাকাত তথা বিশ্বস্ততা হলো কঠিন সময় না পালানো। আকর্ষণীয় ও স্বার্থের মোহে বিশ্বাসঘাতকতা না করা।

আমাদের এই সকল কাজ করার সময় তিনটি বিষয় আমাদের মন মানসে সবসময় রাখতে হবে। আর এই তিনটি বিষয় হলো– প্রথমত ইসলাম ছাড়া কখনোই শান্তি সফলতা সম্ভব নয়। কুরআনে অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে এ কথা বলে দেওয়া হয়েছে :

www.pathagar.com

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। আমার নিয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি।' দ্বিতীয়তঃ আত্মজ্ঞান (consciousness) ছাড়া পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। আত্মজ্ঞান (consciousness) কাকে বলে? চেতনা (consciousness) বা আত্মজ্ঞান হলো ভালো এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারা। বাতিল পথ ও মত থেকে বের হয়ে সত্যের পথে আসা এবং সত্যের পক্ষাবলম্বন করা। নামাজ পড়া আয়াত অনুযায়ী বাইরের কাজকর্মে এক না হওয়া চেতনাহীন বা আত্মজ্ঞানহীন হওয়ার শামিল।

আমরা প্রতিদিন চল্লিশ রাকায়াত নামাজের প্রতি রাকায়াতে সূরা ফাতিহা পড়ি। কারণ ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না। আমরা ফাতিহাতে কি পড়ি (যাদের উপর গযব পড়েনি ও যারা পথভ্রষ্ট হয়নি)। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেন আমাদেরকে এই বাক্যটি দিনে চল্লিশবার পড়ান? কি এর অর্থ? হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে সিরাতে মুসতাকীম থেকে পৃথক করো না। যাদের উপর গযব পড়েছে তাদের পথে তুমি আমাদের পরিচালিত করো না। যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের পথে তুমি আমাদের পরিচালিত করো না। আর গযবে পড়েছে ও পথভ্রষ্ট হয়েছে এরা করা? এরা হলো ইয়াহুদিরা, খ্রিস্টানরা, ক্রুসেডাররা, সাম্রাজ্যবাদীরা। কে বলেন এ কথা। ইসলামের মহান আলেমগণ এ কথা বলেন।

তুমি নামাজে চল্লিশবার বলছ, 'হে আল্লাহ্ আপনি আমাদেরকে ইয়াহুদি, নাসারাদের পথে পরিচালিত করবেন না।' নামাজ শেষ করেই সালাম ফিরিয়ে বলছ, 'আমি তুরস্ককে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করব।' আমেরিকা ইসরাইলের সাথে কৌশলগত মিত্র হবো। ১১শ' বছর যে সভ্যতা পৃথিবীর বুকে হক এবং আদালতের প্রতিনিধিত্ব করেছে সে সভ্যতাকে ছেড়ে তুমি যাচ্ছ বাতিলের পেছনে? কি আশ্চর্য তুমি নামাজে আল্লাহ্কে কথা দিচ্ছ আর সালাম ফিরিয়েই তুমি কি করছ?

হে মুসলমান তুমি কি বলেছ এই ব্যাপারে তুমি ওয়াকিবহাল?

তৃতীয়তঃ জিহাদ ছাড়া ইসলাম সম্ভব নয়ঃ জিহাদ কি? জিহাদ হলো সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। সৎ ও ভালো কাজের আদেশ করা এবং সেটাকে পরিচালিত করা। মন্দ ও খারাপ কাজ নিষিদ্ধ করা এবং

www.pathagar.com

সেটাকে সমাজ থেকে দূর করার জন্য সুযোগ-সুবিধা ও কর্তৃত্বের ক্ষমতা হস্তগত করার চেষ্টা করা। আর এক্ষেত্রে সফলতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো সাংগঠনিক পদ্ধতিতে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করা। সংগঠন হলো শরীরের ভেতর শিরা-উপশিরার মতো (nerve)। গড়ে ৭০ কেজি ওজনের একজন মানুষের শরীরে তার শিরা-উপশিরার ওজন হলো মাত্র ৭০ গ্রাম। কিন্তু ৭০ কেজি এই শরীরকে সচল রাখে সেই ৭০ গ্রামের শিরা-উপশিরা (nerve)। সংগঠন একটা সম্প্রদায়ের শিরা (nerve)-এর মতো। একে-অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন মিলিয়ন মানুষের একটি সম্প্রদায় হতে সুশৃঙ্খল ছোট একটি সংগঠন অনেক বেশি শক্তিশালী এটা সুস্পষ্ট।

এই সকল কার্যকলাপ একজন মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় সকলে মিলে সাংগঠনিকভাবে কাজ করা আমাদের আবশ্যকীয় কর্তব্য। এজন্য শৃঙ্খলা এবং একাগ্রতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠনের সকল পর্যায়ে কাজের পর্যালোচনা করে, সেটাকে নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খল করা। অগোছালো, অবিন্যস্ত এবং বিশৃঙ্খল একটি সংগঠন কখনোই সফলতা আনতে পারে না।

সে কেন কাজ করছে এটা উপলব্ধিক্ষমতাসম্পন্ন একজন দা'য়ী অবশ্যই একাগ্রতার সাথে কাজ করবে। সংগঠন কর্তৃক নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব তার সকল শক্তি দিয়ে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাবে এবং বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াবে। যে ব্যক্তি তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জানে এবং তা পূর্ণভাবে পালন করে সেই ব্যক্তি হলো মহান আল্লাহ্ তায়ালার কাছে পছন্দনীয় ব্যক্তি। আমরা অন্যজনের কাজের নয় নিজের কাজের হিসাব করে, নিজেকে জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত করা আমাদের কর্তব্য। একজন দা'য়ীর জন্য তার সংগঠনের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা এবং সংগঠন কর্তৃক অর্পিত আমানত রক্ষা করা তাকে 'মুহসিনের' পর্যায়ে উপনীত করে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি সংগঠনের পদ মর্যাদা অনুযায়ী নয় নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব সবচেয়ে বড় দায়িত্ব মনে করে আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। সংগঠন মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাজনীতিকে সুশৃঙ্খল করে। আর এ জন্যই প্রতিটি মানুষ তার পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সকল পর্যায় পর্যন্ত এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্য। আমাদের সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের দেশ এবং

www.pathagar.com

জাতির কল্যাণ অর্জনের পাশাপাশি দুনিয়ার সকল মানুষের কল্যাণে কাজ করা। মানুষের সফলতার মৌলিক পাঁচটি শর্ত রয়েছে এবং এগুলো হচ্ছে শান্তি-শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব, হক (অধিকার) এবং স্বাধীনতা। ন্যায়পরায়ণতা (আদালত), কল্যাণ (welfare) এবং মানবিক মর্যাদার অর্থে আমাদের দেশ ও জাতিকে একটি মডেল হিসেবে গোটা দুনিয়াবাসীর সামনে পেশ করা। আর এটা কখনোই আপনা আপনি হবে না। রাজনীতিতে কোনো কিছুই রাতারাতি হয়ে ওঠে না। যদি মানুষের জন্য মানবতার কল্যাণের জন্য কাজ করা হয় (by chance) অবশ্যই এর প্রতিদান পাওয়া যাবে। আর এক্ষেত্রে সফলতার জন্য পূর্ব শর্ত হলো– একসাথে, পরিকল্পনামাফিক এবং সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করা। তাই সংগঠনবদ্ধ হওয়া ছাড়া এটা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়। আর সংগঠন হবে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য একমাত্র সিঁড়ি। যুগের চাহিদার আলোকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে সামনে আগানোর জন্য কাজ করতে হবে। একটি কাজে সফলতার জন্য পূর্ব শর্ত হলো, বিশ্বাস, জ্ঞান, পরিকল্পনা (plan), কার্যপ্রণালী (program), উপযুক্ত নেতৃত্ব (staff), পর্যবেক্ষণ এবং কাজের পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন করা। সর্বপ্রথম নিজের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে যে, আমি এই কাজে সফল হতে পারব। এরপর সেই কাজকে পূর্ণতায় পৌঁছার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা। কাজের একটি সুন্দর পরিকল্পনা করা। কোথায় কিভাবে বাস্তবায়ন করবো এর কার্যপ্রণালি (program) প্রস্তুত করা। এই কাজ যারা পরিচালনা করবেন এমন যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা বা তাদের হাতে অর্পণ করা। শুরু থেকে গভীর দূরদৃষ্টি দিয়ে কাজের পর্যবেক্ষণ করা এবং এর নিয়ন্ত্রণ করা। এরপর কাজের ফলাফলকে মূল্যায়ন করা, পর্যালোচনা করার পর এর উপর অবিচল থাকা। একটি সংগঠনের কার্যকলাপ শুরু করার আগে এর সমস্যা সম্পর্কে জানা। সমস্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা। এর সমাধানকে খুঁজে বের করা একান্ত প্রয়োজন। পরিকল্পনা, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ (control) এবং ফলাফল অর্জন করার জন্য অন্যতম শর্ত দায়িত্বশীলের/নেতার (leader) সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শিতা ও দূরদর্শিতা। কোনো সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে বিকল্প খুঁজে বের করা এবং এর মধ্যে কোনটি বেশি ফলপ্রসূ হবে সেটাকেই বেছে নেয়া। ধারণার ভিত্তিতে অথবা অসময়ে সিদ্ধান্ত দেয়া বা সিদ্ধান্ত দিতে দেরি করা সংগঠনের সফলতা অর্জনে বাধার সৃষ্টি করে বা কম সফলতা বয়ে আনে।

www.pathagar.com

আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে মডেল এর সাথে সঙ্গতি রেখে কাজ করাটাও সফলতা অর্জনের জন্য সহায়ক। আর মডেল কাজের ক্ষেত্রে মৌলিক ভিত্তি হলো সংগঠনের সকল স্তরের জনশক্তির সেই কাজকে ভালবাসা এবং খুবই যত্নসহকারে নেয়া। জনশক্তির মধ্যে এই ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা। দায়িত্বপ্রাপ্ত জনশক্তিকে যখন তার দায়িত্ব সচেতনার সাথে পালন করতে পারবে তখন তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জানতে হবে এবং এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সেটাও তাকে জানতে হবে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সংগঠনের সকল জনশক্তিকে এ ব্যাপারে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আর এই শিক্ষা আমাদের সফলতার মৌলিক ভিত্তি রচনা করবে।

সূর্য উঠার সাথে সাথেই যেমনভাবে সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায় তেমনিভাবে একদল ঈমানদার লোকের কাজের মধ্য দিয়ে সকল প্রকার অন্যায়-অনাচার, জুলুম-নির্যাতনও একদিন বিদায় নেবে। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তোমরাই বিজয়ী হবে। বিজয় অবশ্যই ঈমানদারদের জন্য আর বিজয় আমাদের সন্নিকটে। আর এটাই হলো আমাদের দাওয়াত। কতই না সুখের সংবাদ সেই সকল দা'য়ীর জন্য যারা তার জানমাল দিয়ে এই পথে দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে।

www.pathagar.com

শাশ্বত বিধান ইসলামের দিকেই আমাদের দাওয়াত

ইসলামের বাইরে হক এবং হাকিকতের অন্য কোনো উৎস নেই। বিজ্ঞান এবং হিকমাহ/শিল্পকর্ম এবং শিল্প (Art and industry) সহ সকল কিছুই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত এবং তার একটি শাখা-প্রশাখা মাত্র। কুরআন থেকেই ইলহাম নেয়া ব্যতীত কোনো জ্ঞান এবং পদ্ধতি, পন্থা (Technic) কখনোই ভালো কাজের ওসিলা হতে পারে না। মন্দ এবং ক্ষতি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়।

বিবেক হলো তুলনা করা এবং ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার একটি মাধ্যম। অর্থাৎ তুলনা করা এবং সিদ্ধান্ত প্রদানে সহায়তা করা। কিন্তু ইসলাম ছাড়া বিবেক একাকী কখনোই সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। ভালো এবং মন্দের পার্থক্য করতে পারবে না। একজন আলেমেরও বিবেক (আকল) আছে আবার একজন মদ্যপ (drunk) ব্যক্তির বিবেক (আকল) আছে।

আলেমের বিবেক সর্বদায় ওই চিন্তায় মশগুল যে, 'আমি মানুষকে কিভাবে সতর্ক করব, কিভাবে পথ দেখাব। যাতে তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গাতে সফলতা লাভ করতে পারে।'

অন্যদিকে মদ্যপ (drunk) ব্যক্তির বিবেক এই চিন্তায় মশগুল যে, 'আমি কি দোকানদারের সাথে প্রতারণা করে তার কাছ থেকে এক বোতল মদ বাগিয়ে নিতে পারি।' এই মৌলিক বিষয়টি হলো এই বিবেকের অন্তর্নিহিত মানসিকতা।

দর্শনের এবং দার্শনিকদের একে-অপরকে অস্বীকার করা, আদর্শের অবিরাম দ্বন্দ্বের ফল। মানুষের আইন, চিন্তা ও তত্ত্বের অপরিপক্কতা ও পরিবর্তন এর জন্য দায়ী। এমনকি তৈরিকৃত ওষুধ একটি নির্দিষ্ট সময় পার হবার পর আর কাজ করে না বরং বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইসলাম ব্যতীত সকল নিয়ামত ও সফলতা অপূর্ণ এবং অপর্যাপ্ত। আর এজন্যই 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি।' এই আয়াতটি সর্বশেষ নাযিল হয়েছে। বিবেক (আকল) যদি ঈমান ও ইসলামের অধীন থাকে তাহলে সেটা হলো সবচেয়ে বড় নিয়ামত। আর যদি শয়তানের অধীন থাকে তাহলে এটা হলো

www.pathagar.com

একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। দুনিয়ার জীবন অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষা। মুসলমানদের জন্য মৌলিক বিষয় হলো আখিরাতের প্রতি সম্মান। আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস হিসাবকৃত (calculated)। এগুলোকে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় ব্যয় করা জরুরি। কারণ মৃত্যু আমাদের অনেক নিকটে। সত্যিকারের একজন ঈমানদার ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজেকে রক্ষা করতে পারে। ঈমানের দৃষ্টান্ত হলো চাঁদে পাঠানো একটি রকেটের মতো। রকেটের প্রতিটি কোণ এবং হিসাবকে নিখুঁত হতে হয়। দুনিয়া থেকে প্রেরণকৃত একটি রকেটের কোণে যদি মিলিমিটার পরিমাণ কোনো খুঁত থাকে তাহলে এর কোণ আস্তে আস্তে বড় হয়ে চাঁদে তো নয়ই অন্য একটি গ্রহে ধাক্কা লেগে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তেমনিভাবে মানুষের ঈমান-আকিদায় যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ থাকে তাহলে মানুষকে আস্তে আস্তে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যেতে যেতে জান্নাতে নয় (আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন) জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে।

ইসলামের সাথে বিভিন্ন গোত্রীয়তা, সংশ্লেষণ অথবা বিভিন্ন বিশ্লেষণ যোগ করা চাঁদে প্রেরিত রকেটের কোণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার নামান্তর। ইসলাম এক মিলিমিটার পরিমাণ হলেও আকীদাগত ভ্রষ্টতাকে গ্রহণ করে না।

বর্তমান সময় আমরা দেখতে পাই যে, দূষিত চিন্তার মাধ্যমে, আধুনিক মুসলমান (modern muslim), মডারেট ইসলাম (moderate islam), লিবারেল ইসলাম (light islam) এর মতো বিভিন্ন বিশেষণ যুক্ত করে ইসলামকে ব্যবহার করা হচ্ছে। দুনিয়াকে ধ্বংসকারীরা যেমনভাবে কয়েক শতাব্দী পূর্বে খ্রিস্ট্রিয়ান ধর্মকে প্রোটেস্ট্যান খ্রিস্টিয়ান বানিয়েছে তেমনিভাবে তারা ইসলামের মধ্যেও প্রোটেস্ট্যান ইসলাম তৈরি করতে চায়। লিবারেল ইসলাম আবার কি! ইসলামের কোনো লিবারলিজম নেই। ইসলাম, ইসলামই।

কারণ ইসলাম হলো মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের একমাত্র মনোনীত বিধান। এজন্য ইসলাম হলো পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ। কখনো এখানে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে না আছে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি না আছে কম। এখানে কোনো কিছু যোগও করা যাবে না আবার বিয়োগও করা যাবে না। এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত হক কল্যাণকর এবং এটা সকলের জন্য সকল জায়গায় প্রয়োজনীয়। কারণ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার একমাত্র এবং কেবলমাত্র চাবিকাঠিই হলো ইসলাম।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন শুধুমাত্র আমাদের আচার-ব্যবহারই নয়, আমরা কোন উদ্দেশ্যে কোন নিয়তে এটা করছি এটা সম্পর্কেও অবগত। একজন অশ্বারোহী ব্যক্তি পানি পান করার উদ্দেশ্যে একটি ঝর্ণার সামনে দাঁড়াল। কিন্তু সে চারপাশে তাকিয়ে দেখল যে, ঘোড়াকে বাঁধার এমন কিছু নেই। সে নিজেকে নিজে বলল যে, 'উপরের পাহাড়ে গিয়ে একটি ডাল কেটে নিয়ে আসি। সেই ডালকে ঝর্ণার সামনে পুঁতে রাখব যাতে আমার পরে এসে অন্য কেউ আমার মতো সমস্যার সম্মুখীন না হয়। তাদের জন্য যাতে এটা উপকারে আসে।'

সে এভাবে কাজ করেছে বলে, তারপর যত মানুষ ঘোড়া নিয়ে এই ঝর্ণায় পানি পান করতে আসবে তারা ঘোড়াটি এর সাথে বাঁধবে এবং এই লোকটি সওয়াব পেতেই থাকবে।

সময় চলে গেছে। ঝর্ণার চারপাশের ঘাসগুলোও বড় হয়েছে। একপর্যায়ে তার পুঁতে রাখা ডালটি আর দেখা যাচ্ছে না। একদিন অপর একজন অশ্বারোহী ঝর্ণার দিকে হাঁটার সময় তার পা সেই খুঁটিতে আটকে পড়ে গিয়েছে। লোকটি উঠার পর মনে মনে বলল যে, 'আমি এই ডালটিকে এখান থেকে তুলে ফেলে দেবো। যাতে আমার পরে কোনো মানুষ এসে এটার সাথে লেগে পড়ে না যায়। এভাবে একটা উপকার হোক।'

এভাবে সে ঘাসের ভেতর থেকে খুঁটিটিকে তুলে ফেলে দিলো। সেও এই কাজটি করার কারণে সওয়াব অর্জন করল।

তাদের দু'জনের কাজ একজনেরটা অপরজনের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও ওই ডালটি অপসারণকারী এবং পুঁতা ব্যক্তি মহান আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রতিদান পেলো। কারণ দুই জনের নিয়তই খালেস ছিল। মানুষের কাজ এবং নিয়তের মধ্যকার সম্পর্কও গাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার উদাহরণের মাধ্যমে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারব।

কানাডাতে ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদনকারীদের পরীক্ষা করার জন্য বিশেষ একটি পদ্ধতি আছে যাকে Simulations System বলে। যে ড্রাইভার হতে চায়, সে এসে তার আইডি কার্ড প্রেস করলে প্রবেশের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। ভেতরে রয়েছে চাকা ছাড়া গাড়ি, যেটা সারা রাত ধরে চালনা সম্ভব। লাইসেন্স আবেদনকারী দরজা খুলে গাড়ির ভেতরে ঢুকে স্টার্ট করার সাথে সাথে তার সামনের দেয়ালে একটি পর্দায় বিশেষ একটি ভিডিও চালু করে দেয়া

www.pathagar.com

হয়। ড্রাইভার মনে করে যে, সত্যিকারের রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছে। উঠানামা আছে। চড়াই-উৎরাই আছে এবং বিভিন্ন ট্রাফিক সিগন্যাল সবকিছুই রয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি এই সকল নিয়ম-কানুন মানতে সকল কাজ সঠিকভাবে করতে বাধ্য। কেননা গাড়ির গিয়ার থেকে শুরু করে ব্রেক পর্যন্ত গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ডিরেকশন সকল কিছুই একটি মূল রিমোট কন্ট্রোল সেন্টারের সাথে সম্পৃক্ত। ট্রাফিক কমিশনারের কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য পরীক্ষা দিলে বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি হতে পারে। কিছু ব্যতিক্রম ঘটতে পারে অথবা তার চোখের আড়ালে কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু অটোমেটিক কোনো কিছুকে ধোঁকা দেয়া অসম্ভব।

তথাপি ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষের দুনিয়ার জীবনও একই রকম। সাধারণ একটি তকদীরের অধীনে গঠিত একটি জীবন প্রণালীর মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। মানুষের সকল কর্মকাণ্ড এবং নিয়তকে এক মহামহিম রবের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এবং মূল্যায়ন করার জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হচ্ছে।

তকদীরের বিষয়টিও এ রকম।

উঁচু-নিচু, আঁকা-বাঁকা মোড়সম্পন্ন একটি রাস্তায় আমরা আছি। এই রাস্তায় আদেশ-নিষেধ এবং বিপদজ্জনক অঞ্চলকে প্রদর্শন করার জন্য ট্রাফিক সিগন্যাল রয়েছে। এই রাস্তায় চলার সময় যদি ট্রাফিকের নিয়মনীতিকে না মেনে কোনো প্রকার দুর্ঘটনা ঘটাই, তাহলে অবশ্যই এর দায়-দায়িত্ব পালন না করার জন্য আমরা অপরাধী হব এবং এর জন্য আমাদেরকে শাস্তিও পেতে হবে। আমরা যে পথ দেখতে পাচ্ছি সেটা অনেক বড় এবং শক্তিশালী।

অপরদিকে অদৃশ্য একটি শক্তি এর উপর রয়েছে। আর এক্ষেত্রে, আমরা যেখানে পৌঁছার জন্য আরজ করি সেখানে নয়, সেই অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি (Locomotive power) আমাদেরকে যেখানে নিয়ে যাবে আমরাও সেখানে যেতে বাধ্য। গাড়ির ভেতর আমরা যা করেছি সেটার জন্য আমরা দায়ী কিন্তু এটা কোথায় গিয়ে পৌঁছল সেটার জন্য আমরা দায়ী নই। ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে অর্থাৎ কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে রাস্তার উপর গাড়ি চালনা করা মানুষের ইচ্ছাশক্তির অধীন। আর অদৃশ্য এবং সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি সকল ক্ষমতা এবং শক্তির মালিক এবং সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ একমাত্র তারই হাতে।

www.pathagar.com

দুনিয়ার জীবনকে এভাবে গ্রহণ করা এবং চিন্তা করা জরুরি। মুসলিম চিন্তার অধিকারী একজন মানুষ যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে তিনটি ভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। প্রথমত যে কাজটি করতে চায়, সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সকল শক্তি, সামর্থ্য এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নত কৌশল গ্রহণ করবে। দ্বিতীয়ত, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হবে সেটার জন্য কোনো প্রকার ভয় ও শঙ্কা বাদ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তায়ালার উপর নির্ভর করবে। সবশেষে, যে প্রতিফল পাবে সেটাকে তকদীরের লিখন বলে মনে করবে এবং প্রাপ্ত ফলাফলকে সবচেয়ে উত্তম এবং প্রাপ্য ফলাফল বলে মেনে নেবে।

কালিমায়ে শাহাদাতের পাঠের মাধ্যমে আমরা মুসলমান হতে পারি। কিন্তু কালামায়ে শাহাদাত পাঠ করে ঈমান আনলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না বরং সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে বান্দা হিসেবে আমাদের পরীক্ষাসমূহ মূলত সেই সময় শুরু হয়। মুসলমান বান্দা হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সমগ্র মানবতার মুক্তির জন্য দাওয়াতের কাজ করা। সমগ্র মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামকে প্রেরণ করা হয়েছে। এ জন্য কোনো প্রকার পার্থক্য ব্যতীত সকল মানুষের নিকট আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। তাদের চিন্তা-চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন আমাদের দাওয়াত তাদের সকলকে বুঝতে হবে এবং সকল ধরনের মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান দাওয়াত পেশ করতে হবে। সুন্দর ভাষায় এবং যুক্তিপূর্ণভাবে মানুষের সামনে আমরা ইসলামের দাওয়াতকে তুলে ধরব। আর হেদায়েত দান করার মালিক আল্লাহ্ তায়ালা। তাবলীগ এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম অনুকরণীয় মানুষ হলেন মুহম্মদ (সা.)।

এটা সকলের কাছে জানা যে, ইসলাম শব্দটি আরবী সিলম শব্দ থেকে এসেছে। সিলম বা সালামের অর্থ হলো শান্তি। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সা.) মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। মুহম্মদ (সা.)-এর জন্য কল্যাণময় একটি বিশ্ব গঠনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মুহম্মদ (সা.)-কে কুরআন পাকে মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এজন্য সকল কাজে তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা কল্যাণময় পথ পাওয়ার জন্য সর্বোত্তম পন্থা। তার রহমত থেকে শুধুমাত্র মুসলমানগণ নয়, সমগ্র মানবতা নয়, সমগ্র বিশ্বজাহান উপকৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

কুরআনে কারীম এবং মুহম্মদ (সা.)-এর সুন্নতকে পাঠানো হয়েছে যাতে করে আমরা ইসলামকে শিখতে পারি, জানতে পারি। কেননা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রহমান এবং রাহিম। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তার আদালত তথা ন্যায়বিচারের জন্য দুনিয়াতে আমাদেরকে পরীক্ষা করছেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হওয়ার জন্য তার রহমান ও রহীম নামের গুণে আমাদের নিকট ইসলামকে প্রেরণ করে আমাদেরকে সরল সঠিক পথের সন্ধান দান করেছেন।

আল্লাহ্ রাব্বলু আলামীন যে সব কাজ করেন অবশ্যই সেটা পরিপূর্ণভাবে করেন। এই জন্য একদিকে তিনি আমাদেরকে কুরআনে কারীম দিয়েছেন অপরদিক থেকে সর্বোত্তম আদর্শ মুহম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন। যদি মুহম্মদ (সা.) না থাকতেন তাহলে শুধুমাত্র কুরআন কারীম দেখে আমরা সিজদা কিভাবে করতে হয় সেটাও জানতে পারতাম না। কেননা শুধুমাত্র কুরআন থেকে শিখা যথেষ্ট নয়। আজ আমরা হয়তো বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে সিজদা করতাম। অথচ মানুষ যখন কোনো উপমা দেখে তখন সে বলে যে, 'তাহলে এভাবে করতে হবে'। আর এজন্য শেখার সর্বোত্তম পন্থা হলো কুরআন এবং সুন্নত এই উভয়কেই অনুসরণ করা। মহান আল্লাহ্ তাওয়ালাও ইসলামকে আমাদের নিকট এভাবে প্রেরণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন। এ জন্য ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানার জন্য মুহম্মদ (সা.)-কে জানা এবং তার মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়া মৌলিক একটি বিষয়।

জ্ঞান হলো কোনো বনের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে এমন ব্যক্তির নিকট থাকা একটি কম্পাসের মতো। বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে আকাশের দিকে এবং তারকার দিকে তাকিয়ে আপনার দিককে শনাক্ত করতে পারেন। ঠিক আছে কিন্তু এই বিপদজনক বনের মধ্যে সঠিক রাস্তা খুঁজে পাওয়ার জন্য আমি কোন দিকে যাব? উত্তর দিকের গাছগুলোর পেছনে হিংস্র প্রাণী। দক্ষিণ দিকে রয়েছে অন্য বিপদ। এটা সুস্পষ্ট যে, আমি উত্তর-দক্ষিণ দিকে যেতে পারব না। বাঁচার জন্য বুদ্ধি প্রয়োজন। তেমনিভাবে কোথায়, কোন কোন বিপদ রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। হয়তো বা বিবেকবুদ্ধির মাধ্যমে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রাস্তা খুঁজে পেতে পারি কিন্তু যে রাস্তা দিয়ে পাড়ি জমাব সে রাস্তার বিপদাপদকে বিবেক বুদ্ধির মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়। এজন্য দ্বীন আমাদেরকে এই বিপদাপদ সম্পর্কে অবহিত করে। কুরআনে কারীম এবং

www.pathagar.com

মুহম্মদ (সা.) আমাদেরকে সকল কিছু সম্পর্কে অবগত করেছে। এজন্য সামনের দিকে পথ চলতে হলে কুরআন সুন্নাহ্ প্রদর্শিত পথেই আমদেরকে অগ্রসর হতে হবে। কেননা কুরআন এবং সুন্নাহ্ই পথের সকল বিপদাপদ সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে। মানুষের বুদ্ধি-বিবেক এবং মানচিত্র দু'টোই অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য যারা বলে থাকে যে, বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমেই আমরা সফলতা পাব, শুরুতেই তারা ভুল করে থাকে।

দ্বীন মানুষের ফিতরাতের সাথে সম্পৃক্ত অতীব প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। সফলতা পাওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো দ্বীন। আর দ্বীনের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো জ্ঞান। আমাদেরকে সকল ভ্রম বা বিভ্রান্ত থেকে মুক্ত থাকাটা জরুরি। মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই যে, মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বড় বিপ্লবসমূহ নবীদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল। হযরত ইব্রাহীম (আ.) ছোট ছোট মূর্তিগুলোকে ভাঙার পর কুঠারকে বড় মূর্তির ঘাড়ে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। মূর্তি পূজারীরা যখন সেখানে তাকে ডেকে এনেছিল তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, 'এই বড় মূর্তিটিই এই ছোট মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেলেছে'। এই কথা বলার পর স্বাভাবিকভাবেই কেউ তার কথায় বিশ্বাস করেনি। কারণ একটা মূর্তি গিয়ে অন্য মূর্তিকে আঘাত করে ভাঙতে পারে না। এই ঘটনা থেকে আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারি যে, 'দ্বীনের মধ্যে অযৌক্তিক এবং বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী কোনো বিষয়কে বিশ্বাস করা যাবে না। এই বিষয়টি মানব ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা হিসেবে কাজ করেছে এবং জ্ঞান অর্জনের দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

অপরদিকে হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট প্রেরিত '১০টি আদেশ' আইন-কানুন তৈরি করার পথ উন্মুক্ত করেছে। অর্থাৎ তার কাছে প্রেরিত নিয়মাবলীসমূহ, সমগ্র মানবতাকে মেনে চলতে হবে এমন একটি নীতিমালা। হযরত দাউদ (আ.)-এর সময় মানবজাতি পরিপূর্ণভাবে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা শুরু করে। সামাজিক জীবনে প্রবেশের পর তারা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতির সূচনা করে। হযরত ঈসা (আ.) আসার পর তিনি 'চরিত্রের' (আখলাক) মূল ভিত্তি স্থাপন করেন।

অর্থাৎ মানবতাকে দেয়া চারটি মৌলিক বিষয়, মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আচ্ছা এই নবীরা এসব কাজ করেছেন, তো আমাদের নবী হযরত মুহম্মদ (সা.) কি কাজ করেছেন? এটা

www.pathagar.com

দেখার জন্য আমাদের হাতের কাছে থাকা 'ইঞ্জিলকে' পড়ে দেখতে হবে। ইঞ্জিল পড়ে এ সম্পর্কে আমরা জানতে পারব। সেখানে এই কথাগুলো রয়েছে : হাওয়ারীগণ যখন বুঝতে পারল যে, ঈসা (আ.) তাদের মাঝ থেকে চলে যাবেন, তখন থেকে তারা দুঃখ পাওয়া শুরু করল। তখন ঈসা (আ.) তাদেরকে বলেছিলেন, আমি আপনাদের মাঝ থেকে চলে যাব বলে দুঃখ করবেন না। আমি এজন্যই চলে যাব যে, আমার পরে যিনি আসবেন তার জন্য ময়দান প্রস্তুত হোক। তিনি এসে সকল কিছুর পূর্ণতা দান করবেন।'

আচ্ছা তাহলে কে তিনি? তিনি অবশ্যই আমাদের নবী মুহম্মদ (সা.)।

অর্থাৎ অন্যান্য নবীগণ ভিন্ন ভিন্নভাবে মানব ইতিহাসে বিভিন্ন অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী মুহম্মদ (সা.) সকল বিষয়ের পূর্ণতা দান করেছেন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং আইন-কানুনের মৌলিক ভিত্তি ন্যায় ও আদালত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এ জন্যই মুহাম্মাদর্ রাসূলুল্লাহ (সা.) সমগ্র মানবতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

ইসলাম মানে হলো, জ্ঞান, আধুনিকতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ন্যায়ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা। 'চীন দেশে হলেও সেখানে গিয়ে জ্ঞান অর্জন কর' এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, ইসলামে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব কত বেশি। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'একইভাবে দুই দিন অতিবাহিতকারী আমার দলভুক্ত নয়।' কি হবে তাহলে? প্রতিদিন আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ অগ্রগতি উন্নতি আধুনিক ইসলামের অপর একটি বৈশিষ্ট্যের নাম। ইসলাম ছাড়া সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ এটা মানুষের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানোর সবচেয়ে শক্তিশালী মেশিন।

অপরদিকে রাসূল (সা.) অপর হাদিসে বলেছেন, 'সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে উদর পূর্তি করে ঘুমায় আর তার প্রতিবেশী উপবাস থাকে।'

'তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্য যা পছন্দ কর, অপর ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুমিন হতে পারবে না।'

এই হাদিসসমূহের দ্বারা ন্যায়ভিত্তিক একটি সমাজ গঠনের অনুপম একটি নীতিমালা তিনি আমাদের সামনে পেশ করেছেন। এ জন্য উন্নতি, অগ্রগতি এবং সফলতার জন্য যা কিছু প্রয়োজন এর সবকিছুই ইসলামে রয়েছে। মুহম্মদ (সা.) হলেন এর অগ্রপথিক।

www.pathagar.com

উদাহরণস্বরূপ, বায়তুল মুকাদ্দাস কয়েকবার পাশ্চাত্য সভ্যতার হস্তগত হয়েছিল। তারা যতবার বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করেছিল ততবার তারা মুসলমানদের উপর গণহত্যা পরিচালনা করেছিল। কিন্তু মুসলমানগণ যতবার বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করেছিল ততবার তারা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিল। কেননা ইসলাম মানে হলো, ক্ষমা, দয়া, উদারতা এবং সুন্দর মোয়ামালা দেখুন। এজন্য কেউ মুসলমান হোক বা না হোক, মুহম্মদ (সা.)- কে সকলেই একজন উত্তম আদর্শ মনে করে। পাশ্চাত্যের গবেষকরা খোলাখুলিভাবে এটা আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন বই-পুস্তক এটা প্রকাশ করেছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকগণ মুহম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা এবং গুণাবলী সম্পর্কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এজন্য মুহম্মদ (সা.) শুধুমাত্র মুসলমানগণ নয়, সমগ্র মানবতার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার পাত্র।

জন ড্যাভেনপোর্ট (John Davenport) তার মুসলমান হওয়ার কাহিনী এভাবে ব্যক্ত করেছেন। 'আমি একজন ঐতিহাসিক ছিলাম। সকল কিছুকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার মতো ইসলাম এবং মুহম্মদ (সা.)-কে নিয়েও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। এটা আমি করেছিলাম জ্ঞানগত দিক থেকে এবং তার থেকেই আমি এটা শুরু করেছিলাম। সত্যিকার অর্থেই তার শৈশব ছিল নির্মল এবং পরিচ্ছন্ন। যৌবনকালে তাকে সবাই শ্রদ্ধা এবং সম্মান করত এবং তার বিশ্বস্ততার কারণে তাকে তারা আল-আমিন উপাধি দিয়েছিল। তার নবুয়তের সময়কাল এবং অন্যান্য ঘটনাবলী পর্যালোচনা করেছি এবং তাকে একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবেই পেয়েছি। কিন্তু এটাই যে, সর্বশেষ নবী এটা বলতে পারতাম না। যখন আমি তার মক্কা বিজয়কে পর্যালোচনা করা শুরু করলাম তখন আমার অবস্থার পরিবর্তন হওয়া শুরু হলো।

মক্কা বিজয় সম্পর্কে তার লিখিত বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বই হলো 'ইজজুস সাজিদে' অর্থাৎ 'সেজদার মহত্ব'। মক্কা বিজয় ছিল মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় বিজয় এবং জুলুম-নির্যাতনকারীরা যখন কাঁপতে কাঁপতে তার সামনে আত্মসমর্পণ করছিল, তখন নবী করীম (সা.) তাদের সাথে প্রতিশোধমূলক কোনো আচরণ করেননি। এমনকি উহুদ যুদ্ধের শহীদ উনার আপন চাচা হযরত হামযা (রা.)-এর কলিজা চিবিয়ে ভক্ষণকারীকে পর্যন্ত তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

জন ড্যাভেন পোর্ট বলেন যে, 'যখন এ রকম একটি দৃশ্য আমি অবলোকন করতে থাকলাম তখন আমি কাঁপতে থাকলাম। আচ্ছা এরপর তিনি কি করবেন? এরপর যখন দেখলাম যে, তিনি মদিনায় ফিরে গেলেন এবং গমের রুটি খেয়ে চটার উপর বসবাস শুরু করলেন।' এসব কিছু সাধারণ একজন মানুষও করতে পারেন। কিন্তু বিশাল একটি বিজয়ের পর পুনরায় সাধারণভাবে জীবনযাপন কেবলমাত্র নবী চরিত্রের মাধ্যমেই সম্ভব। এ কথা বলে দৌড়ে গিয়ে সিজদায় পড়ে মুসলমান হলাম।

এজন্য আমাদের মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, সর্বোত্তম পরিমাপ হলো মুহম্মদ (সা.)-এর সংগ্রামী জীবন এবং তার সংগ্রাম। ধরে নিই যে, হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর বদর যুদ্ধের দিন আমি একজন উষ্ট্রারোহী মেষ পালক। হযরত মুহম্মদ (সা.) এবং আবু জেহেলের বাহিনীর মধ্যে সম্মুখ যুদ্ধ চলছে। আমি যদি উঁচু একটি পাহাড়ে উঠে এই যুদ্ধ নীরবে দেখতে থাকি তাহলে আমি কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হব। আবার যদি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে এই দোয়া করতে থাকি যে, 'হে রব, এদের মধ্যে যে হকপন্থী তাকে সাহায্য কর' তাহলেও আমি কাফিরদের দলের অন্তর্ভুক্ত হব। কেননা কোনটি হক এবং কোনটি বাতিল এটা জানার জন্যই মানুষ এই দুনিয়াতে এসেছে। আবার যদি এই দোয়া করি যে, 'হে রব হযরত মুহম্মদ (সা.)-কে সাহায্য কর এবং তাকে রক্ষা কর।' তাহলেও এবার আমি গুনাহগার ফাসিক হিসেবে পরিগণিত হব। কেননা সে সময় দোয়া করার সময় নয়, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যুদ্ধ করার সময়।

সত্যিকারের একজন মুসলমানের কাজ হলো: ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সাথে সাথে বীর বিক্রমে কাজের সাথে জড়িয়ে পড়বে। হাতে যা আছে সেটা নিয়েই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। হক ও বাতিলের এই সংগ্রামে সবসময় হকের পক্ষাবলম্বন করবে এবং সকল মুসলমান সর্বদা মানবতার দু'জাহানের সফলতার জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করবে। সকল শক্তি এবং সম্পদ দিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের বিজয়ের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। আমরা কতোই না ভাগ্যবান মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে এমন একটি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এমন একজন নবীর উম্মত বানিয়েছেন। এর জন্য আমরা আল্লাহ্ তায়ালার যতোই শুকরিয়া আদায় করি না কেন তার দয়ার তুলনায় তা অনেক কম।

www.pathagar.com

মুসলমান হিসাবে আমরা দুনিয়ার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে সবচেয়ে উন্নত চিন্তা চেতনার অধিকারী। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সোনালী অতীতের চিন্তা চেতনাকে লালন করতে না পারার কারণে আমাদেরকে সর্বদাই ভিত্তিহীন কিছু চিন্তাধারার ও চিন্তা চেতনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে এটা সত্য যে, ভিত্তিহীন চিন্তার সাথে আমাদের চিন্তার এই সংগ্রাম আমাদের মুসলমানদের সম্মান ও মান মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে।

অপরদিকে পাশ্চাত্য এই ভিত্তিহীন চিন্তাধারা আমাদের দেশে আমাদের ধর্ম আমাদের সংস্কৃতিকে জানার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মধ্যে যখন পাশ্চাত্যের শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে উঠা অর্ধ-শিক্ষিত লোকদের সাথে দেখা করি তখন তাদেরকে আত্মঅহংকারে নিমজ্জিত হিসাবে দেখতে পাই। অর্ধেক জ্ঞান অর্জন করার কারণে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে না জানার কারণে তারা মুসলমানদেরকে নিচু এবং ছোট মনে করে থাকে। অনেক জানার ভান করে তারা বলে থাকে যে, পৃথিবীতে অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন রয়েছে। তারা আরও বলে থাকে যে, আমেরিকা ও ইউরোপের বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন আবিষ্কার নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হচ্ছে। মঙ্গল গ্রহ ও চাঁদে যাচ্ছে।

দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করি, যখন বাহির থেকে দেখি তখন আমরা বলে থাকি উঁচু-ওয়াও কত বড় বিল্ডিং! কত বিশাল সেতু! এগুলো কিভাবে বানালো? তারা কিভাবে তাদের তৈরি এই সকল বিমানে করে চাঁদে যায়? মঙ্গলে যায়? এই সকল বড় বড় বিজ্ঞানাগারে তারা কিভাবে কাজ করে থাকে? এই সকল কথা বলতে বলতে আমরা এই সকল জিনিসকে পর্যবেক্ষণ করে থাকি।

আমেরিকা থেকে চাঁদে গমনকারী যে কোনো রকেট এর নিয়ন্ত্রণকারী কোনো অফিসে যদি গিয়ে সেখানে কর্মরত একজনের সাথে কথা বলি এবং সে ব্যক্তির জ্ঞানের গভীরতা কতটুকু তা যদি পরীক্ষা করতে শুরু করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই?

বিশেষ করে আমরা এমন ভাবে গড়ে উঠেছি যে, এই সকল বিজ্ঞানাগারে যারা কাজ করে থাকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় হোক তাদেরকে অনেক বড় মনে করে থাকি এবং তাদেরকে অনেক সম্মানের পাত্র হিসাবে দেখে থাকি। যদি তাই হয়

www.pathagar.com

তাহলে, যে সকল বিজ্ঞানীরা সেখানে কাজ করেন ও সেই সকল বিজ্ঞানাগারকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন তার কাছে বসে যদি তাকে প্রশ্ন করি আপনি এখানে কি করেন? সে নিশ্চয় বলবে, আমি অমুক রকেট এর অমুক গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করি, কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন?

সে উত্তর দিবে যে আমি শুধুমাত্র এই যন্ত্র বা যন্ত্রাংশটুকুকে নিয়ন্ত্রণ করি। আমরা যদি তাকে প্রশ্ন করি যে এই যন্ত্র বা যন্ত্রাংশটি কিভাবে তৈরি হলো? সে হয়ত কিছু সূত্রের কথা বলবে বা কিছু সূত্র লিখে দিবে। সে হয়তো এই সূত্রগুলোর আগে কিছু সংখ্যা অথবা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করবে।

তখন আমরা আমাদের নিজেদের অজান্তেই বলে উঠব যে, আমরা যা কোনো দিন বুঝি না বা জানি নাই সে রকম একটি বিষয় সম্পর্কে উনি আমাদের অবহিত করছেন। তথাপি, একজন মুসলিম হিসাবে আমরা যখন এরকম একটি ব্যাপারকে মোকাবেলা করব, তখন আমাদের উচিত হবে না যে, এর প্রতি খুব বেশি গুরুত্বারোপ করা। বিজ্ঞানাগারে কর্মরত ব্যক্তিকে যখন আমরা প্রশ্ন করব তিনিও তখন আমাদের সাথে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সূত্রাবলী নিয়ে আলোচনা করবেন। চলুন এখন আমরা তার প্রদর্শিত সেই সূত্রাবলী নিয়ে আলোচনা করি।

দেখুন, সেই বিজ্ঞানী আমাদের যে সূত্র থেকে কথা বলেন বা দেখান না কেন সে সূত্রের গঠন ও সেই সূত্রটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সত্যিকার অর্থে তাদের তৈরি বা উদ্ভাবিত সে সকল সূত্র ও সূত্রাবলী শুধুমাত্র তাদের চিন্তার একটি ব্যাখ্যামাত্র। উদাহরণ স্বরূপ সেই বিজ্ঞানীর চাঁদে রকেট প্রেরণের হিসাব সাধারণ একটি পাথরের একই উচ্চতা থেকে মাটিতে পড়ার হিসাব থেকে ভিন্ন নয়।

আমরা যদি সেই প্রফেসরকে প্রশ্ন করি যে, এই হিসাব আপনি কিভাবে করলেন? তিনি বলবেন যে, কিছু সুত্র রয়েছে। আমরা এই সকল সূত্রকে বিশ্বাস করি। এই সকল সূত্রের মাধ্যমেই আমরা হিসাব করে থাকি। আমরা যদি তাকে প্রশ্ন করি যে আচ্ছা তাহলে সেই সূত্রগুলি কি? এক্ষেত্রে তিনি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং শক্তি ও ভরের নিত্যতার সূত্রের কথা বলবেন।

আর এটা গোটা দুনিয়াতেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্র নামে পরিচিত, যে প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। আমরা যখন এমন

www.pathagar.com

কোনো সমস্যায় পড়ি যেটা পদার্থ বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত তখন আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রাবলীকে ব্যবহার করে থাকি। অন্যান্য হিসাবের ক্ষেত্রেও আমরা অন্যান্য সূত্রাবলীকে ব্যবহার করে থাকি। এগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হলো পদার্থকে সৃষ্টি করা যায় না বা ধ্বংস করা যায় না, এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা যায় মাত্র। এটা হলো ভরের নিত্যতা সূত্র। আর অপরটা হলো শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই শুধুমাত্র এক রূপ হতে অন্য রূপে রূপান্তর করা যায় মাত্র। এটাকে বলে শক্তির নিত্যতা সূত্র।

আচ্ছা আপনার মতে যে পদার্থের কথা বলছেন এই পদার্থ বলতে কি বুঝায়? শক্তি (energy) ও বল (force) বলতে কি বুঝায়? সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞান শুরু হয় মূলত এখান থেকে। যেখানে এসে তারা থেমে যায় সেখান থেকেই আসল জ্ঞান ও বিজ্ঞান শুরু হয়। আমরা এই সকল প্রশ্ন তাদের সামনে পেশ করি তারা এর সঠিক কোনো জবাব সংক্ষিপ্ত ও সঠিকভাবে পেশ করতে পারে না। কেন পারে না তারা? কারণ হলো সত্যিকারের জ্ঞান বলতে কি বুঝায় তারা তা জানে না। তারা এই ছোট ব্যাপার গুলোকেই সবচেয়ে বড় জ্ঞান বলে ধারণা করে তারা কিভাবে আমাদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবে যেখানে তারা পদার্থ/বস্তু সম্পর্কেই অবগত নয়? তেমনিভাবে সে জানে না যে, শক্তি কি (energy), বল (force existence) কি ও ভর (mass) কি? পদার্থ বা বস্তু (Subtance material) নামে কোনো কিছু আছে না কি নাই? তাহলে তোমরা আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পার না। দেখুন আপনাদের কেউ বলে এভাবে, কেউ বলে সেভাবে আবার কেউ বলে হ্যাঁ পদার্থ (Subtance matarial) আছে। আবার কেউ বলে না পদার্থের (Subtance) এর কোনো অস্তিত্ব নেই। আবার কেউ বলে এটা হলো তরঙ্গ। এটা ওটা নানান কিছু।

আপনারা জেনে থাকবেন যে, এদের মধ্যে অন্যতম হলো আইনস্টাইন (Einstein) যে হলো একজন ইয়াহুদি বিজ্ঞানী যে তার সারা জীবন এই সকল গবেষণায় কাটিয়েছে। সে তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বলেছিল আমি প্রায় সারা জীবন বিজ্ঞান গবেষণায় কাটিয়েছি। আমি শক্তি (energy), বল, (force) এবং পরমাণু (Atom) সম্পর্কে অধ্যায়ন করেছি এগুলো নিয়ে হিসাব নিকাশ করেছি।

www.pathagar.com

কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও এগুলো সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অবগত হতে পারলাম না। তথাপি আমি আপনাদেরকে একটা বিষয়ে অবগত করতে চাই। যদি আমরা শক্তি (energy), বল (force), পদার্থ (Substance), এর জায়গায় অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণাকে গ্রহণ করতাম তাহলে কি আমরা একই ফলাফল পেতাম? নাকি সহজ কোনো হিসাব বের করতে পারতাম? এটা আমরা জানি না। কিন্তু আমি ধারণা করি যে, পদার্থ (Substance) শক্তি (energy), বল (force) এগুলো একে অপরের থেকে ভিন্ন নয়।

আমি এগুলোকে একই ব্যাপার মনে করে থাকি। আমি মনে করি যে, এগুলো একই জিনিস আর সেটা হলো শক্তি (energy) আর এটি কখনো পরিণত হয় পদার্থে (Substance) আবার কখনো বা বলে (force)। আমি এটা ধারণা করতে পারি যে, এটা কি? কিন্তু আমি এটাকে বিশ্লেষণ করতে পারি না।

পদার্থ কি এটা জানার জন্য আমরা একটি টেবিলকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা শুরু করি। যখন আমরা এর কাঠিন্যতাকে ভেদ করে এর ভেতরে প্রবেশ করি তখন কাষ্ঠ বা কাষ্ঠ খণ্ডের তৈরি এই টেবিলের কাঠগুলোতে আমরা বিভিন্ন কোষ দেখতে পাই। এই কোষগুলোর অভ্যন্তরে যখন আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করি এই কোষগুলোর মধ্যে বিভিন্ন জৈব পদার্থকে দেখতে পাই এবং জৈব পদার্থগুলোর ভেতরেও রয়েছে বিভিন্ন অণু পরমাণু।

যদি আমরা এই সকল অণুগুলোকে মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে নিরিক্ষণ শুরু করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, পদার্থের অভ্যন্তরে যে অণুগুলো রয়েছে সেগুলো আবার পরমাণু থেকে তৈরি।

পরমাণু কি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্য যখন আমরা পরমাণুর ভেতরে প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পাই যে, পরমাণুর গঠন প্রণালী ও এর কার্যবিধি সূর্য এবং তার চতুষ্পার্শ্বে আবর্তিত ঘূর্ণায়মান বিভিন্ন নক্ষত্র সমূহের মতই। সূর্য যেমনিভাবে কেন্দ্র তেমনিভাবে এরও একটি কেন্দ্র রয়েছে। আর একে বলা হয় প্রোটন। এই প্রোটনকে কেন্দ্র করে এর চতুর্পার্শ্বে আবর্তিত হয় নিউট্রন। যেমনিভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে অন্যান্য গ্রহ উপ-গ্রহ আবর্তিত হয়। সূর্যের চারপাশে যেমনিভাবে পৃথিবী নামক গ্রহ ও অন্যান্য গ্রহ উপ-গ্রহ আবর্তিত হয় তেমনিভাবে টেবিলের অভ্যন্তরে প্রতিটি পরমাণুর কার্যপ্রণালী একই নিয়মে চলে।

www.pathagar.com

আচ্ছা এই পরমাণু আসলে কি? যখন আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এটাকে পর্যবেক্ষণ করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, ইলেকট্রন এবং প্রোটনের মধ্যে রয়েছে একটি বিশাল দূরত্ব এই একই কার্যপ্রণালী আমরা সৌরজগত এর ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। সূর্য এবং তারকা সমূহের মধ্যেও রয়েছে বিশাল এক দূরত্ব। যখন আমরা টেবিলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি তখন আমরা এখানে ফাকা জায়গা দেখতে পাই। আমরা খোলা চোখে দেখি যে এটি কোনো বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এটি বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ নয়। এর ভেতরে রয়েছে ফাঁকা। এখানে রয়েছে শুধুমাত্র ইলেকট্রন প্রোটন।

নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন এর মধ্যকার দূরত্ব সূর্য এবং তারকাদের মধ্যে অবস্থিত দূরত্বের দশগুণ।

আমরা এটাকে পরিপূর্ণ ভাবতাম। হ্যাঁ যখন আমরা বাহির থেকে দেখি তখন এটাকে পরিপূর্ণই (full) দেখতে পাই। কেননা আমরা এর ভেতরে দেখতে সক্ষম নই। আমাদের চর্ম চক্ষু এটাকে দেখতে সক্ষম নয় যে, এর ভেতরে পুরোটাই ফাঁকা (Empty) এখন যখন আমরা আমেরিকার সেই বিজ্ঞানাগারে গবেষণারত বিজ্ঞানীটিকে নিয়ে এসেও একটি মাইক্রোস্কোপ হাতে দিয়ে এই ফাঁকা জায়গা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, জনাব আমাদেরকে হিসাব দেখানোর সময় পদার্থ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, এখন সেই (Empty) গুলো কোথায়? সে এর কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হবে না। কেননা এই ইলেকট্রন ও প্রোটনগুলো হলো পরমাণুর সাধারণ উপাদান, এদের কোনো ওজন ও উল্লেখযোগ্য কোনো আয়তন নেই (do not have important weights and Volume)। উদাহরণ স্বরূপ যদি আমরা দুনিয়ার সকল স্বর্ণের কথাই ধরি, যদি আমরা স্বর্ণের পরমাণু গুলোর অভ্যন্তরে ফাঁকা জায়গাগুলোকে পরিপূর্ণ করার জন্য পরমাণুগুলোকে সংকোচিত করতে পারি তাহলে সকল স্বর্ণ শুধুমাত্র একটি আঙ্গুল (thumb)-এর মাথাকে ঢোকাতে যে ফাঁকা জায়গা প্রয়োজন সেটাকে পরিপূর্ণ করতে পারে কিন্তু এটা আমাদের সকলেরই জানা যে, দুনিয়াতে যে পরিমাণ স্বর্ণ রয়েছে এটা লিবসন ও সাইবেরিয়ার মধ্যবর্তী জায়গাকে পরিপূর্ণ করতে পারবে। চিন্তা করুন এটা গোটা ইউরোপকে পূর্ণ করে দিতে পারবে। যখন আমরা নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন এর মধ্যকার এই দূরত্বকে কমিয়ে নিয়ে আসি তখন গোটা দুনিয়ার স্বর্ণ নামক এই বস্তুকে একটি আঙ্গুলিত্রাণ (thimble) এ জমা করতে পারি। এটা আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, শুধুমাত্র হালকা বা

www.pathagar.com

সহজ পদার্থ সমূহ নয় বরং স্বর্ণের মতো ভারি বস্তুকেও শূন্যতা থেকে গঠন করা হয়েছে। আমরা যখন এর ভেতরে প্রবেশ করি তখন পদার্থ বলে আর কিছু খুঁজে পাই না।'

নতুন নতুন বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, মূলত এখানে ইলেকট্রন বলতেও কিছু নেই। আপনারা বলে থাকেন যে ইলেকট্রন ঘুরে কিন্তু ঘূর্ণায়মান জিনিসটি ইলেকট্রন নয়। মূলত তরঙ্গ ঘূর্ণায়মান। পরমাণুকে টুকরো করার সময় মূলত পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যখন শক্তিকে একত্রিত করা সম্ভব হয় তখন পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই অবস্থায় যখন আমরা প্রশ্ন করি যে তাহলে শক্তি কোথায়? পদার্থ কি? এখানে আসল জিনিসটা কি? তখন তারা কেউ এর উত্তর দিতে পারে না। জবাব দেয়ার পরিবর্তে তারা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে থাকে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে জানার মধ্য দিয়েই মূলত জ্ঞান শুরু হয়। পৃথিবীর সকল মানুষের জ্ঞানকে যদি একত্রিত করা হয়, তাহলেও মহান আল্লাহ্ তায়ালার যে জ্ঞান তার সাথে তুলনা করলে সাগরের এক বিন্দু পানির সমানও হবে না। এই জন্য সামান্য জ্ঞানের অধিকারী মানুষের অহমিকা করা কখনো শোভা পায় না। যদি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীগণ মহান রবের প্রতি কৃতজ্ঞ হত এবং তার জ্ঞানের বিশালতা সম্পর্কে জানত তবে তারা এতো অহমিকায় মত্ত হতোনা। সে তার নাফরমানীর বদলে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আরও জ্ঞানের প্রার্থনা করত। আমরা যদি সকল জ্ঞান বিজ্ঞানকে একত্রিত করে হিসাব করা শুরু করি যে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যতো জ্ঞান এসেছে এগুলো কোথা থেকে এসেছে এগুলোর মালিক কে? এ জ্ঞান কিভাবে কোথা থেকে আসল? এটাকে অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন।

আমরা একথা জানি যে, আজকের পৃথিবীতে যতো জ্ঞান রয়েছে এগুলো মানুষ ক্রমে ক্রমে উন্নত করেছে। আজকে আমরা শুধুমাত্র ৫০০০ বছরের জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে জানি। কিন্তু ৫০০০ হাজার বছর পূর্বেও মানুষের অস্তিত্ব ছিলো। ৫০০০ বছর পূর্বে লেখা আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে ৫০০০ বছরের জ্ঞান বিজ্ঞানের ডকুমেন্ট আমাদের কাছে রয়েছে। কিন্তু লেখা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে মানুষ কি জানত তাদের জ্ঞান কতটুকু ছিলো তা আমাদের হাতে নেই। এজন্যে আমরা ৫০০০ বছর আগে ফিরে যাব এবং দেখব যে, এই ৫০০০ বছরে জ্ঞান বিজ্ঞান কিভাবে উন্নতি লাভ করেছে।

www.pathagar.com

প্রথম মানুষকে যদি আমরা শুরু হিসাবে ধরি। এখন পর্যন্ত মানুষ কিভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে দিন দিন উন্নতির দিকে ধাবিত করেছে? ৫ হাজার বছর আগের একজন মানুষ যে-কিনা প্রস্তর যুগে বসবাস করত তার আবাস ছিলো পাহাড়ের গুহা। সে জানত না আগুন কি? আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আস্তে আস্তে মানুষকে মেধা ও যোগ্যতা দান করেছেন এবং তার নিয়ামত দান করেছেন। মানুষ সকল সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সৃষ্টি। অন্যান্য প্রাণী যেমন, বাঘ, সিংহ ও বানর এদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা কিছু সামর্থ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষের মতো তাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি দান করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ একজন মানুষ যখন একটি পশুকে ঘায়েল করতে চায় পশুটিকে কিভাবে ঘায়েল করতে হবে এটা সে জানে।

কিন্তু পশু এই পদ্ধতিটি জানে না বা রপ্ত করতে পারে না। মহান আল্লাহ্ মানুষকে বুদ্ধি দান করেছেন, বিভিন্ন নিয়ামতে তার চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন। তার নিয়ামতের কারণেই মানুষ বিভিন্ন পথের সন্ধান পেয়েছে। নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহার করে নতুন বস্তু আবিষ্কার করছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগুন আবিষ্কারকে সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হিসাবে ধরা হয়। যে সকল মানুষ আগুন আবিষ্কার করেছে তারা হয়ত আগ্নেয়গিরির লাভার উদগীরণ দেখে বিভিন্ন পাতা ও কাষ্ঠখণ্ডকে একত্রিত করে আগুন জ্বালাতে শিখেছে। কিন্তু প্রাচীনকালে মানুষ কিভাবে এটার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে সেটা আমরা জানি না।

কিন্তু আমরা এটা ধারণা করতে পারি যে এই পদ্ধতিটি আস্তে আস্তে উন্নতি লাভ করেছে। এর পর অন্যান্য জ্ঞানগুলোও মানুষ আস্তে আস্তে রপ্ত করেছে। শিখে শিখেই মানুষ তার আজকের অবস্থানে পদার্পণ করেছে। সর্বপ্রথম মানুষ এবং প্রথম যুগের মানুষের জ্ঞান সম্পর্কে বর্ণনা আমি করতে পারব কেননা, হযরত আদম (আ.)-এর জ্ঞান কতটুকু ছিলো সেটা আমরা জানি না। শুধুমাত্র প্রস্তর যুগের মানুষের জ্ঞান কতটুকু ছিলো সেটাই আমরা জানি।

সবচেয়ে আশ্চার্যজনক ব্যাপার হলো ৫০০০ বছরের মানব সভ্যতার ইতিহাসে আমাদের সময় পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান কিভাবে মানুষ রপ্ত করতে পেরেছে? এর সবচেয়ে সহজ-সরল ব্যাখ্যা হলো মানুষের আজকের এই জ্ঞান বিভিন্ন তারিখ ও সালের সাথে রপ্ত করেছে। এইভাবে তারা আজকের জ্ঞান

www.pathagar.com

বিজ্ঞান পর্যন্ত আসতে পেরেছে। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদেরকে বলে ভিন্ন কথা, ইতিহাস থেকে আমরা শিখতে পারি যে, মানুষের জ্ঞান এইভাবে কোনো নিয়মিত প্রক্রিয়ায় (regular process) আসেনি। তাহলে কিভাবে উন্নতি লাভ করেছে? আমরা যখন অনুসন্ধান করি তখন দেখতে পাই যে প্রাথমিক দিকে মানুষ আস্তে আস্তে/ক্রমধারায় (gradually) জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে এই পদ্ধতিটি ছিলো একটি সময় পর্যন্ত। কিন্তু এর পর এটা পর্যায়ক্রমে উন্নীত হয়েছে। তার পর এটা আবার মন্থর হয়ে পড়েছিল, কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছিল কোন সময়ে? জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতি ঘটেছিল মূলত ইসলামের সোনালী যুগ সপ্তম শতাব্দীতে আর এই ধারা অব্যাহত ছিলো ১৪ থেকে ১৫ শতাব্দী পর্যন্ত।

ইতিহাস সাক্ষী জ্ঞান বিজ্ঞান এইভাবে তার উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। সপ্তম শতাব্দী থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই বিপ্লব মূলত হয়েছিল মুসলিমদের হাতে। কিন্তু পরবর্তীতে ইউরোপিয়ানরা মুসলিমদের কাছ থেকে ১৫শ' শতাব্দী থেকে দখল করা শুরু করে। এটা শুরু হয় ইউরোপের রেনেসাঁর মাধ্যমে এবং ক্রুসেডের পর এটা পুরোপুরি তাদের হাতে চলে যায় এবং তারা এর উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সোনালী যুগ থেকে রেনেসাঁ (৭-১৪ শতাব্দী) পর্যন্ত ৭শ' বছর জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় একচ্ছত্রভাবে মুসলিমদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিলো।

তারাই মূলত এই সাতশ' বছর জ্ঞান-বিজ্ঞানের লালন করত। গবেষণায় এটা প্রমাণিত যে, আজকে মানুষের কাছে যে জ্ঞান রয়েছে এর ৬০-৭০%ই এসেছে মুসলিমদের কাছ থেকে। মুসলিম মনিষীরাই জ্ঞানের উন্নতি অগ্রগতিতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন। এটা দ্বারা কি বুঝায়? যারা আমাদের সাথে অহমিকা প্রদর্শন করে আমাদের মুসলিম জাতিকে হীন ও নীচু দৃষ্টিতে দেখে তারা জানে না যে তাদের জ্ঞানের ৭০ ভাগেরও বেশি এসেছে মুসলিমদের কাছ থেকে। এমন অহমিকার মূল কারণ হলো জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা। সত্যিকার অর্থেই কি এমন?

অর্থাৎ মুসলিম শাসনামলে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কি এতটাই উন্নতি হয়েছিল? আমি এই কথার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাওয়ার পূর্বে যে দু'টি সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করেছিল সে সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ তিনটি বিষয় বলতে চাই।

www.pathagar.com

দেখুন ইসলামের সোনালী যুগে মুসলিমদের দ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞানে যে উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল সে জ্ঞান মানব কল্যাণে কতটুকু ভূমিকা রেখেছিল। অপরপক্ষে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময়ে মুসলিমদের কাছ থেকে যে জ্ঞান তারা আহরণ করেছিল সেটা কিভাবে হয়েছিল। যারা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা বলে থাকে যে, শুধুমাত্র পাশ্চাত্যেই জ্ঞান -বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছে।

তোমরা এই সকল ব্যাপারে অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়েছ। এই কথা বলেই তারা থেমে থাকেনি। পাশ্চাত্যে যারা ইসলাম বিদ্বেষী, ইসলামকে খাট করে প্রকাশ করা যাদের কাজ তারা মানুষের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং তারা কি বলে জানেন? পাশ্চাত্যবাদীরা তাদের কথাগুলোকে বারবার পুনরাবৃত্তি করে থাকে এই বলে "আপনারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যতটুকু উৎকর্ষতা সাধন করেছেন মুসলিমরা তা করতে পারেনি। তারা প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশরের জ্ঞানকে নেয়ার পর সেখান থেকে কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং মৌলিক মানবীয় যোগ্যতার বলে সেখানে কিছু উন্নতি করার চেষ্টা করে। কিন্তু পরবর্তীতে জ্ঞানের আসল ধারক বাহক ইউরোপিয়ানদের কাছে এটা সমর্পণ করে দেয়।" তাদের এই প্রচার সম্পূর্ণ ভাবেই মিথ্যা।

সত্যিকার অর্থে মুসলিমগণ প্রাচীন গ্রীক, ভারতীয় ও মিশরীয়দের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়েছিল অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর। কিন্তু এই জ্ঞান নেয়ার ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো। (১) এই তথ্য উপাত্ত কার কোন বই থেকে নেয়া হয়েছে সেটা উল্লেখ করত এবং বলত যে,

"(Batlamyus) বাতলামুইসের এই বইটি পড়েছি সেখান থেকে এই তথ্য পেয়েছি। আমরা অকলিড (Oklid) এর এই এই বই কয়টি থেকে এ কথা জানতে পেরেছি, আমরা পিথাগোরাসের এই বই থেকে এ পেয়েছি" এইভাবে সর্বদাই তথ্যসূত্র দেওয়া থাকত।

(১) ইসলামী পণ্ডিতগণ প্রাচীন সভ্যতার সাথে সম্পৃক্ত বইগুলোকে পড়ে সেখান থেকে তথ্য উপাত্ত নেওয়ার সময় মুখস্থ করার মাধ্যমে গ্রহণ করেন নাই তারা এটাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার আগ পর্যন্ত গ্রহণ করেননি।

(৩) ইসলামী পণ্ডিতগণ যখন প্রাচীন গ্রীক, মিশরীয় ও ভারতীয়দের কাছ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছিল তখন তারা নিজেরাই জ্ঞান-বিজ্ঞানে অন্যদের

www.pathagar.com

তুলনায় উচ্চে অবস্থান করছিল এবং গ্রীক, মিশর ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিলো অনেক নিম্নে। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণ করার মানসে উন্নত-অনুন্নত ভেদাভেদ না করে সকলের কাছ থেকেই জ্ঞান অর্জনে ব্রত ছিলো। এটার দ্বারা কি বুঝায়?

এখন আমি আপনাদেরকে এই সম্পর্কে বলতে চাই। তৃতীয় স্তরে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিমগণ অন্যদের কাছ থেকে জ্ঞান আনয়নের ক্ষেত্রে সকলের জ্ঞানকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অপরপক্ষে ক্রুসেড ছড়িয়ে যাওয়ার পর ইউরোপীয়গণ যখন মুসলমানদের সাথে উঠাবসা শুরু করে তখনই মূলত তারা মুসলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করতে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য।

ক. ইউরোপীয়গণ এই তথ্য-উপাত্ত জ্ঞান কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে এর উৎস সম্পর্কে কখনো বলেননি। মুসলিমদের লেখা বইগুলো পড়েছেন কিন্তু কার কোন পুস্তক থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে এটা উল্লেখ করেন নাই। অন্যান্য ইউরোপীয়গণ যখন এই সকল বই-পুস্তক পড়েছেন তখন তারা ভেবেছেন এগুলো ইউরোপিয়ান লেখকদের লেখা পুস্তক। এইভাবে তথ্য বিভ্রাট ছড়িয়ে পড়েছে পুরো ইউরোপ জুড়ে। আমাদের বই পুস্তকগুলোতেও আজ ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের তথ্য-উপাত্তকেই পড়ানো হয়।

আমরাও মনে করি যে, বিজ্ঞানে ব্যবহৃত সূত্রগুলো তারাই আবিষ্কার করেছে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সত্য কথা হলো তারা এগুলো মুসলিমদের লেখা বই থেকেই পড়ে নিজেদের নামে চালিয়ে দিতো। সত্যিই কি তাই? আমি এগুলোকে প্রমাণ করার জন্য আপনাদের সামনে উদাহরণ পেশ করব।

খ. ইউরোপিয়রা মুসলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান নেওয়ার সময় তারা এটাকে না বুঝেই গ্রহণ করেছিলো। আজকের এতো উন্নত চোখ ধাঁধানো ইউরোপ কিভাবে এগুলো না বুঝে গ্রহণ করেছে? এটা হয় কিভাবে? হয়তো এই প্রশ্ন আপনারা আমাকে করবেন। আমি এখন আপনাদেরকে উদাহরণ দিব।

আমরা দেখতে পাব তাদের না বুঝা বিষয়গুলো।

গ. ইউরোপীয়গণ যখন এই জ্ঞান বিজ্ঞানগুলো মুসলিমদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল তখন তাদের যোগ্যতা এই জ্ঞানগুলো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ছিলো না। অর্থাৎ ইউরোপীয়ানরা মুসলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান

www.pathagar.com

আহরণের ক্ষেত্রে উপর থেকে নীচে এই নীতিতে জ্ঞান আহরণ করেছে। মুসলিমরা ছিলো উপরে আর ইউরোপিয়রা ছিলো নীচে। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিমরা উন্নত ছিলো?

ইউরোপিয়রা যখন এই জ্ঞানগুলো নিচ্ছিলো তাদের ভাষা এই জ্ঞান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ছিলো না। মুসলিমদের কিতাবগুলো ও কিতাবের পূর্ণ অর্থ গ্রহণে সক্ষম ছিলো না। ১৪শ' শতাব্দীতে তারা যে সকল সূত্র ও তথ্য উপাত্ত অনুবাদ করেছিল সেগুলো তারা। ১৮শ' শতাব্দীতে এসে বুঝতে শুরু করেছিল। অর্থাৎ চার শত বছর অতিক্রম করার পর।

আজকে আমরা যেভাবে পদার্থ, রাসায়ন, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোলকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বলে অভিহিত করে থাকি, মূলত আজকের জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল কিছুই মুসলিমদের উদ্ভাবিত। মুসলিমরাই এগুলোর সূচনা করেছে। এটি অবশ্যই অনেক বড় একটি দাবি কিন্তু আমি এই দাবিকে প্রমাণ করার জন্যে প্রস্তুত।

দেখুন উদাহরণস্বরূপ আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চাঁদে এবং মহাকাশে যাওয়া। মহাকাশ ও চাঁদে যাওয়ার যে বিষয় সেটি জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত একটি জ্ঞান এবং আমরা জানি যে, জ্যোর্তিবিদ্যার জ্ঞান মূলত উদ্ভাবিত হয়েছিল মুসলিমদের মাধ্যমে। যে মুসলিম এই জ্ঞানের জনক, কে তিনি? আমি আপনাদেরকে এগুলো থেকে শুধুমাত্র কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করব। ইসলামের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম হলেন আল বাত্তানী ইসমাইলি। তিনি হলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন জ্যোতিবিজ্ঞানী। আল-বাত্তানী কে? আপনারা কি জানেন কে তিনি? হয়তো আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জেনে থাকবেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা আমাদের বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে জানি না, আমাদেরকে আমাদের প্রেরণার উৎস মুসলিম বিজ্ঞান সম্পর্কে শেখানো হয় না। আমাদের মধ্যে হয়তো অনেকেই বাতলামাউস (Batlamyus) এর নাম জানেন। তাকে অনেকেই পতলেমে (Ptoleme) নামে চিনে। কেন? কেননা আমাদের বই পুস্তকে তাদের সম্পর্কে লেখা হয়, তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু আল-বাত্তানীর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা হয় না। কেন? এর পেছনে মূল কারণ হলো- আমাদের বই পুস্ত কগুলোর অধিকাংশই পাশ্চাত্যের বই পুস্তকগুলো থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তথাপি বাতলামাউস (Batlamyus) এর অবস্থান কোথায় আর আল-বাত্তানী কোথায়? বিজ্ঞানে এই দুই জনের মধ্যে কার অবস্থান কত উপরে সেটা আপনাদের সামনে প্রকাশ করব। আল বাত্তানীর পূর্বে মিশরীয় বিজ্ঞানী বাতলামাউস (Batlamyus) মহাকাশে সূর্যের প্রদক্ষিণ সম্পর্কে একটি ধারণা পেশ করেছিলেন সেটা হলো মহাকাশে সূর্য তার নিজস্ব জায়গায় ফিরে আসতে ২৬০ দিন লাগে অর্থ বছরে ২৬০ দিন।

কিন্তু আল বাত্তানী তার এই কথাকে ভুল প্রমাণ করে বলেন যে, সূর্য তার একই অবস্থানে ফিরে আসতে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড লাগে। অর্থাৎ এক বছর মানে হলো ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড। এখন পাশ্চাত্য কি আমাদেরকে এটা বলতে পারবে যে, আল বাত্তানী এবং বাতলামাউস এর গবেষণার মাঝে খুব সামান্য পার্থক্য রয়েছে। আল-বাত্তানী যে হিসাব আমাদের সামনে পেশ করেছেন আজকের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে হিসাব বের করা হয়েছে তার সাথে মাত্র ২ মিনিট ২৪ সেকেন্ড এর পার্থক্য রয়েছে। আল বাত্তানী এতো বছর পূর্বে আমাদের সামনে এতো নিখুত একটি হিসাব করে দেখিয়েছেন। আচ্ছা যে ব্যক্তি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে ২৬০ দিনে এক বছর আর যিনি বলেছেন যে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড দুই জনের অবস্থান কি একই? আমরা এ রকম পার্থক্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। কেন? কারণ হলো মুসলিমগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধন করার পর (Batlamyus) বাতলামাউস এর মতো বিজ্ঞানিও ইতিহাসের পেছনে পড়ে থাকবেন। এমন অনেক উদাহরণ আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখতে পাই।

প্রাচীন মিশরীয়রা ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ মেরসিন থেকে ইসকেনদেরীয়ার দূরত্ব মেপেছিল। এই দুরত্বকে তারা আজকের দূরত্ব থেকে ২০ ভাগের ১ ভাগ মনে করত। কিন্তু মুসলিম বিজ্ঞানীরা ভূমধ্যসাগরের সঠিক দৈর্ঘ্য বের করতে সক্ষম হয়। কিভাবে তারা পরিমাপ করেছিল? আব্বাসীয় খলিফা মামুন নির্দেশ প্রদান করেন যে, "ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত মুসলিম জনগণের ভূমির তফসিলভুক্ত জরিপ ও সেখানে অবস্থিত মুসলিম জনগণের অধিকার নিরূপণ করতে চাই। ভূমধ্য সাগরের তীরে অবস্থানরত মুসলিম জনগণও তীরের দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে নির্ণয় করে আমার কাছে নিয়ে আসবে"। এই কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনি একদল ভূগোল বিজ্ঞানীকে

www.pathagar.com

দায়িত্ব প্রদান করেন। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ সেই সময়ের সকল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ভূমধ্যসাগরের প্রস্থ মাপার জন্য একটি পথ অনুসরণ করেন : তারা ভূমধ্যসাগরের তীরে গড়ে উঠা একটি শহর থেকে পরিমাপ করার কাজ শুরু করে। তারা উচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেই চূড়া থেকে যতটুকু দেখতে পারে ততটুকু পর্যন্ত তারা দেখে। এরপর তারা সাগরের উচ্চতায় পাহাড়ের চূড়ার উচ্চতাকে পরিমাপ করে। সূর্য ডোবার সময় পাহাড়ের চূড়া থেকে সেই সময়ের যন্ত্রপাতি দিয়ে এর মধ্যকার কোণকে পরিমাপ করে। যদি আরও সহজভাবে একটি উদাহরণ পেশ করি তাহলে যেমন ধরুন আঙ্কারা এবং কনিয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য কনিয়াতে একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম, দেখি কি কুলের (একটি স্থানের নাম) ওখানে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সূর্য সেখানে কত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ডুবছে সেটার একটা পরিমাপ করি। যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি তার উচ্চতা মেপে নেই।

পাহাড়ের উচ্চতা মাপার পরও সূর্য কত ডিগ্রী কোণে ডুবলো সেটা জানার পর পাহাড় থেকে কূলের (একটি জায়গার নাম) দূরত্ব জেনে নেই। অর্থাৎ কূলে থেকে কনিয়ার দূরত্ব হিসাব করছি। কিভাবে হিসাব করি? শুধুমাত্র এটাকে হিসাব করার জন্য আজকে যে আমরা (sine) সাইন, (cosine) কোসাইন, (tangent) টেনজেন্ট ব্যবহার করি এই ত্রিকোণমিতির ধারণা আবিষ্কার করে হিসাব করা হলো। ত্রিকোণমিতির এই ধারণা সর্বপ্রথম খলিফা মামুনের সময়ে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করেন। তারা এই দূরত্ব হিসাব করার সময় বিপরীত কোনের সাইন (sine) ও কোসাইন (cosine) হিসাব করে এবং এই হিসাবের দ্বারা তারা দূরত্ব পরিমাপ করতে সক্ষম হয়। আমরা সাইন (sine) সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করব।

এখন আসি সাইন (sine) এর কথায়। যে সকল ভাইয়েরা বয়সে বড়, তুলনামূলকভাবে আগে ত্রিকোণমিতি পড়েছেন তারা জানেন যে, আগে ত্রিকোনমিতি পড়ার সময় sine, cosine এ সকল শব্দের জায়গায় Zeyp, শব্দ ব্যবহৃত হত। Zeyp শব্দটি একটি আরবি শব্দ। খলিফা মামুনের সময় সর্বপ্রথম মুসলিম বিজ্ঞানীগণ দূরত্ব পরিমাপ করার ক্ষেত্রে এই শব্দগুলোর ব্যবহার করেছিলেন। সে সময়ের মানুষগণ দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার জন্য দৈর্ঘ্যকে জেপ (Zeyp) এর সাথে তুলনা করেছিলেন। এই জেপ (Zeyp) আমাদের তারকিশ ভাষায় ব্যবহৃত জেপ (Zeyp) জেপ (Zeyp) নয়। হিসাব করার সময় বই

www.pathagar.com

পুস্তকে 'Zeyp down, Zeyp above' এরকম অনেক হিসাব করা হতো। ক্রুসেড এরপর ইউরোপিয়ানরা এই সকল বই পুস্তক পেতে শুরু করে এবং দেখে এরা ভূমধ্যসাগরের প্রস্থ অসাধারণ সঠিকভাবে পরিমাপ করেছে। গাণিতিক হিসাবগুলোতে Zeyp-এর মতো শব্দ থাকায় এ হিসাব তারা ধরতে ও বুঝতে পারেনি।

এ হিসাবগুলোকে বুঝার জন্য অভিধানের সাহায্য নিয়েছে, আরবিতে জেপ (Zeyp) শব্দের ল্যাটিন হলো সাইন (sine) তারা এই ল্যাটিন শব্দকে ব্যবহার করেছে। ইউরোপিয়ানরা এটাকে sine (সাইন) বলার কারণে আমরাও যেহেতু ইউরোপ থেকে সবকিছু আমদানি করছি, সেহেতু আমাদের উদ্ভাবিত শব্দকে তারা না বুঝার কারণে তারা তাদের বুঝার স্বার্থে যে শব্দ ব্যবহার করেছে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে তাদের অভিহিত করা নামে আমরাও পড়ছি ও পড়াচ্ছি। এই জন্যই sine, cosine এই শব্দগুলি ব্যবহার করছি। শুধু কি তাই এগুলো যারা পড়ছেন পড়াচ্ছেন তারা সবাই মুসলিম। সম্পদের আসল মালিক হলো মুসলিম, ইউরোপিয়ানরা আমাদের কাছ থেকে না বুঝে নিয়েছিল আমরাও না বুঝে ইউরোপিয়ানদের নিকট থেকে আনছি।

মুসলিমদের ইতিহাস এ রকম আবিষ্কারে পরিপূর্ণ। শুধু এগুলোই নয়, মুসলিমরা আজকের ভূগোলের যে পরিমাপ এটারও আবিষ্কারক। খলিফা মামুনের সময়ে হাররান এলাকা আমাদের তুরস্ক থেকে ইরাক এর বিভিন্ন শহর পর্যন্ত দূরত্বের পরিমাপ করেছিলেন। আজকে আমরা জানি যে, ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব ১১১,০০০ কিলোমিটার। সেটা খলিফা মামুনের সময়েই মুসলিমরা পরিমাপ করেছিল। আর তারা যে পরিমাপ করেছিল সেটাও ছিলো ১১১,০০০ কিলোমিটার।

এখানেই শেষ নয়, মুসলিমরা সাইনাস টেবিল (sinus table)ও আবিষ্কার করেছিল। এই sinus table (সাইনাস টেবিল) আজকে আমরা ব্যবহার করে থাকি। এমনকি এগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। আর এগুলো ছাপা হয়েছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। আর আমরা খুবই হীনমন্যভাবে ধারণা করি যে, এ সকল পুস্তকের সকল হিসাব-নিকাশ ও সূত্রাবলী ইউরোপিয়ানদের আবিষ্কার। অথচ সর্বপ্রথম ত্রিকোণমিতি টেবিল আবিষ্কার করেছিল মুসলিমগণ। গিয়াসউদ্দিন জামশেদ তিনি খোরাসানের

www.pathagar.com

বাসিন্দা ছিলেন। তিনিও হলেন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি তার গ্রন্থ রিসালাতুল-মুহিতিয়েতে সর্বপ্রথম (sinus) সাইনাস এর হিসাব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। এখন চলুন পুনরায় আমরা পাশ্চাত্যের ইউরোপীয় মদতপুষ্টদের জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যে বলো মুসলিমরা গ্রীক ও মিশরীয়দের থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়েছে। মিশরীয়দের মাঝে সাইনাস (sinus) এর ধারণা কোথায়? কোথায় তাদের মাঝে ত্রিকোণমিতির ধারণা? মিশরীয়দের মাঝে এ সকল কিছুর বিন্দুমাত্রও ধারণা পাওয়া যায় না। কিন্তু দেখুন গিয়াসউদ্দিন জামশেদ কিভাবে (sinus) এর ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন। 0.017452 404 437 238 371. তিনি সাইন এক ডিগ্রির ধারণাকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, কমার পরে ১১টি সংখ্যাকে তিনি সাইন (sin) এক ডিগ্রিতে গণনা করতে পেরেছেন। এই হিসাব যখন আজকে আমরা ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটরে করি তখন একই ফলাফল আমরা পেয়ে থাকি। গিয়াসউদ্দিন জামশেদ ত্রিকোণমিতির এই টেবিলকে/পরিমাপকে এ পদ্ধতিতে উদ্ভাবন করেছেন।

কিভাবে তিনি এটা করেছেন? তারা কিভাবে এ কাজ, এ হিসাব নিকাশগুলো করেছেন এই চিন্তা যখন করি তখন আমরা অবাক হয়ে যাই। আমরা যখন তাদের জ্ঞান গরিমার এই উপমা দেখতে পাই তখন তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়ন্তর দেখি না। একইভাবে যদি আমরা ইউরোপিয়ানদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে, পাই (১) এর সংখ্যার ধারণার আবিষ্কারক কে? তারা নিশ্চিত করেই এটা বলবে যে এটা প্রাচীন গ্রীকদের আবিষ্কার। না, পাই (২) এর সংখ্যার আবিষ্কারক ও এর সর্বপ্রথম ধারণা দান করেন মুসলিমগণ। আর গিয়াসউদ্দিন জামশেদ এর রচিত বই রিসালাতুল মুহিতিয়া থেকে এর সম্পর্কে আপনাদের জানাতে চাই। গিয়াসউদ্দিন জামশেদ পাই (৩) এর মান হিসাবে এই সংখ্যাগুলো উদ্ভাবন করেন: ৩.১৪১৫৯২৬৩৫৫৮৯৭৪৩। অর্থাৎ পাই (৪) এর মান কমার পরে ১৫টি সংখ্যার মাধ্যমে সঠিকভাবে আবিষ্কার করেছেন। আজকে আমরা যখন ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করি আমরা এই সংখ্যার কোনো ব্যতিক্রম পাই না। কেননা ইসলামের সোনালী যুগে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলিমদের হাতে উন্নতি লাভ করে এবং জ্ঞানের সত্যিকারের প্রসারণ শুরু হয়।

www.pathagar.com

মুসলিমরা শুধুমাত্র জ্যোতির্বিদ্যা ও ত্রিকোণমিতিই আবিষ্কার করেনি। আজকের বীজগণিতের আবিষ্কারক হলেন মুসলিমগণ। আজকে আমাদের সামনে যে গণিত শাস্ত্র রয়েছে এর মূলনীতির উদ্ভাবক হলেন মুসলিম গণিত বিশারদগণ। দেখুন যারা আমাদের পাশে এসে গর্ব অহংকার করে বলে যে, আমরা চাঁদে যাই, আমরা মহাকাশ পরিভ্রমণ করি। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করি আপনারা হিসাব কিভাবে করেন? এই প্রশ্ন করার পর সে কিছু সংখ্যা লিখবে। আমরা যেরূপ জানি ১,২,৩,৯ এরকম সংখ্যাগুলোই সে লিখবে। কিন্তু এ সংখ্যাগুলোরও আবিষ্কারক মুসলিমগণ। সংখ্যাগুলোর আকৃতি মুসলিমদের দেওয়া। ইউরোপিয়ানরা এই সংখ্যাগুলোর যে আকৃতি ব্যবহার করে সে আকৃতি ইউরোপ-আমেরিকাতে অবস্থানরত মুসলিমদের ব্যবহৃত সংখ্যাগুলোর ন্যায়। আরও যদি সামনের দিকে যাই তাহলেও দেখতে পাই যে, যে মানুষগুলো আমাদেরকে তাদের চোখে নীচু ও হীন দেখতে অভ্যস্ত তাদের হিসাবের পদ্ধতিরও আবিষ্কারক মুসলিমগণ। এটা কিভাবে হয়েছিল? লক্ষ্য করুন পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ বলে থাকে যে মুসলিমগণ প্রাচীন গ্রীক ভারতীয় ও মিশরীয়দের কাছ থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান গ্রহণ করেন। এটা কেমন জ্ঞান আহরণ গ্রীকদের সংখ্যার ধারণায় ৬০ এর অধিক কোনো সংখ্যা ছিলো না।

তাদের ভাষার যতগুলো হরফ ছিলো ততগুলোই ছিলো তাদের সংখ্যা অর্থাৎ হরফ শেষ হলে সংখ্যাও শেষ হতো। এরপর যখন মুসলিমদের হাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ শুরু হয় তখন মুসলিমরা বলেন যে, আমাদের বিশাল বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আপনাদের সংখ্যার সীমাবদ্ধতা যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ আমরা নতুন সংখ্যা আবিষ্কার করব। কি আবিষ্কার করবেন? উত্তর হিসাবে বলেছিলেন যে, এমন একটি সংখ্যা আবিষ্কার করব যে সংখ্যা দিয়ে যতো বড় ইচ্ছা ততো বড় গাণিতিক সংখ্যার সমাধান করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ এক সংখ্যাটি লিখলাম। এটাকে যদি (১) এই গঠনে গঠন করি এবং এরপর যদি দু'টি শূন্য (০০) বসাই তাহলে এটি হবে শতক, তিনটি শূন্য বসালে হবে (১০০০) হাজার। এভাবে যতো ইচ্ছা শূন্য বসানো সম্ভব। এ সকল সংখ্যার মাধ্যমে যতো ইচ্ছা গাণিতিক সংখ্যা লেখা সম্ভব। শুধু এখানেই শেষ নয়।

এই সংখ্যা আবিষ্কার করার পর আজকের গুণ, ভাগ, যোগ, বিয়োগ এর পদ্ধতিও আবিষ্কার করেন মুসলিমরা। প্রাচীন গ্রীক ও মিশরীয়রা কিন্তু গুণ, ভাগ, যোগ, বিয়োগ এই পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত ছিলো না। কেননা তাদের

www.pathagar.com

সংখ্যার পদ্ধতি এই পদ্ধতির জন্য উপযোগী ছিলো না। তারা যোগ বিয়োগ করার জন্য বিভিন্ন কাঠিকে ব্যবহার করত। মুসলিমগণ এগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে এগুলো গণিতের জন্য উপযোগী নয়। তখন তা তারা নতুন সংখ্যার উদ্ভাবন করে এই পদ্ধতিকে চালু করে। দশক সংখ্যার এই পদ্ধতির আবিষ্কার নিঃসন্দেহে মানবজাতির জন্য একটি অনেক বড় খেদমত।

মুসলিমরা যদি শুধুমাত্র বলে যে, 'তোমরা আমাদের উদ্ভাবিত সকল কিছুই ব্যবহার করতে পার শুধু আমাদের উদ্ভাবিত সংখ্যা ব্যবহার করবে না' তাহলে ইউরোপিয়ানরা তাদের উদ্ভাবন আর ধরে রাখতে পারবে না। এমনকি তারা নতুন আবিষ্কারের দিকেও এগোতে পারবে না। অথচ তারা আমাদের কাছে এসে গর্বে বুক ফুলিয়ে বলে যে ইসলাম হলো মধ্যযুগীয় একটি ধারণা। বর্তমানে এটি মানব সভ্যতাও মানব কল্যাণের উপযোগী নয়। হ্যা আমরা আমাদের মধ্যযুগীয় ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট, আপনারা আমাদের সকল সম্পদ ফেরত দিন, আমাদের মধ্যযুগের উদ্ভাবন আপনারা কেন ব্যবহার করছেন? আপনারা আমাদের উদ্ভাবন ব্যবহার করবেন না। আমরাও আপনাদের তথা কথিত নতুন উদ্ভাবনগুলোও ব্যবহার করব না। আমরা আমাদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন দিয়ে আপনাদের চেয়েও উন্নত ও সোনালী সমাজ গড়ে তুলতে পারি যেমনিভাবে অতীতে পেরেছিলাম। গাণিতিক বিপ্লব ও বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কার মুসলিমগণ গোটা মানব সভ্যতাকে উপহার হিসাবে পেশ করেছেন। কিন্তু আমরা নিজের অতীত ইতিহাস ভুলে অন্যকে অনুসরণ করছি।

মুসলিমদের আবিষ্কার এখানেই শেষ নয়। আল জেবরা বা বীজগণিতের আবিষ্কারকও মুসলিমগণ। "জেবির" অর্থাৎ বীজ গণিত বলতে কি বুঝায়? জেবির শব্দটি ও মুসলিম গণিতবীদ আল-জাবির এর নাম থেকে নেয়া হয়েছে। ইউরোপিয়ানরা এই নামটিকেও তাদের মুখে উচ্চারণ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারেনি। তারা এই মহান ব্যক্তির নামকে লুকানোর লক্ষ্যে তার নামকে বিকৃত করে তাদের সকল পুস্তকে তার প্রণীত গণিতকে আল-জেব্রা নামে অভিহিত করে। আজ ইউরোপের ইংল্যান্ড ও জার্মানির সকল স্কুলে গণিতের বইগুলোকে আল-জেব্রা নামে অভিহিত করা হয়। আর আমরাও বীজ গণিতকে আল-জেব্রা নামে অভিহিত করে থাকি।

www.pathagar.com

কে এই বীজ গণিতের আবিষ্কারক? অবশ্যই মুসলিমগণ। কি করেছিল আল-জাবির? জাবির যা করেছিলেন সেটা হলো প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয়দের গণিতকে তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তিনি পাশ্চাত্যের মতো তাদের থেকে নেয়া জ্ঞানগুলোকে নিজের বলে দাবি করেননি। তা হলে তিনি কি করেছেন? তিনি যখন তাদের গণিতগুলোকে পর্যালোচনা করলেন তখন দেখতে পেলেন যে তারা ত্রিভূজ ও কিছু নকশার মাধ্যমে তাদের গাণিতিক সমস্যাকে সমাধান করে থাকেন। কারণ প্রাচীন গ্রীক ও মিশরীয়দের নিকট বীজগণিতের কোনো ধারণা ছিলো না। গাণিতিক সূত্রগুলোকে বর্ণমালার মাধ্যমে প্রকাশ করে আজকের এই বীজগণিতের ধারণার প্রবর্তন করেন।

যারা আজকে আমাদের সাথে দম্ভ করে কথা বলে তারা জানে না যে, বীজগণিতের উদ্ভাবকও মুসলিমগণ অর্থাৎ আল-জাবির। একটি সমীকরণের উভয়পক্ষে যদি যোগ করা হয়, গুণ করা হয় অথবা ভাগ করা হয় এই সমীকরণ এর কোনো পরিবর্তন হবে না। এটারও আবিষ্কারক হলেন আল জাবির। জাবির কি করেছেন? তিনি একই সাথে সমীকরণ দ্বিঘাত সমীকরণ ও ত্রিঘাত সমীকরণ এরও সমাধান দিয়েছেন তার রচিত বইয়ে। অপরপক্ষে বর্গ এর সাথে সম্পৃক্ত অনেক সমীকরণ ত্রিঘাত সমীকরণ দিয়ে সমাধান করা যায় না। কিন্তু ইসলামের সোনালী যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন মুসলিম উৎকর্ষের শীর্ষে তখন তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম গণিতবিদ আল-জাবির ত্রিঘাত সমীকরণ এর মাধ্যমে কিভাবে সমাধান করা যায় সেটা তিনি দেখিয়েছেন এবং সে সাথে ঘনমূল (cube root) কে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সেটাও তিনি সর্বপ্রথম দেখিয়েছেন। এগুলো এতটাই উন্নতমানের ছিলো যে, তারা পুরাতন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ঢেলে নতুন করে সাজিয়েছিলেন। আর এটা করেছিলেন দূরদর্শী মুসলিমগণ।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন–

اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله

"তোমরা মুমিনের দূরদৃষ্টিকে ভয় কর, কেননা সে আল্লাহ্তায়ালার নূরের মাধ্যমে দেখে থাকে। তাদের এই দৃষ্টি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক যে ছিলো সেটাও না। বরং এটা বাস্তবিক ও প্রকাশ্যেই ছিলো। ইসলামের এই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের জ্ঞান গবেষণার দিকে যখন আমরা তাকাই তখন আমাদের বিবেকের বুদ্ধি থমকে দাঁড়ায়। তারা এতো বড় বড় অসাধ্য কিভাবে সম্ভব করেছিল তার দিকে

www.pathagar.com

তাকিয়ে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। সেই সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনো আল-জাবির জ্ঞানের ক্ষেত্রে আর আসেনি। যারা নিজেদেরকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক বলে মনে করেন তারা এরকম আল-জাবির আমাদের সামনে পেশ করুন দেখি। আমরা যে শূন্য (০) ব্যবহার করে থাকি এ ধারণাও মুসলিমরা উদ্ভাবন করেছেন। আজকের যে বীজগণিতের উচ্চ পর্যায়ে লিমিট (limit) পড়ানো হয় এটাও মুসলিমদের উদ্ভাবন। আমরা লগারিদম (logarithm) বলে যেটা জানি এটাও মুসলিমদের আবিষ্কার। লগারিদম এর সকল সূত্রাবলী সর্বপ্রথম আল-হারজেম (Al-Haryem) নামক মুসলিম বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন।

মুসলিমরা এই সকল গণিতকে উদ্ভাবন করেছেন। অপরদিকে ইতিহাস, পদার্থ, রসায়নেরও জনক মুসলিমগণ। আচ্ছা মুসলিমরা পদার্থ বিজ্ঞানে কি অবদান রেখেছিলেন? পাশ্চাত্যরা যেভাবে বলে থাকে তোমরা সব প্রাচীন গ্রীক থেকে নিয়েছে। আমি একটা উপমার মাধ্যমে বুঝাতে চাই, আজকে পদার্থ বিজ্ঞানের জনক হলেন ইবনে হেইশাম (Ibni Heysam) আমি যদি জিজ্ঞাসা করি তিনি কে ছিলেন, তাহলে কেউ তার সম্পর্কে বলতে পারবে না। অথচ তার রচিত বই আমরা অনেকেই স্কুল কলেজে পড়েছি। কিন্তু ইবনে হাইশেম এর নামসহ আমাদেরকে পড়ানো হয়নি। কিন্তু তিনি হলেন পদার্থ বিজ্ঞানের জনক। অপরদিকে ইবনে হেইশাম (Ibni Heysam) আজকের পরমাণু (Atom) ও অণুর সর্বপ্রথম ধারণা প্রদান করেছিলেন। তিনি আলোর প্রতিসরণ এর সূত্র আবিষ্কার করেন। প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানী অকলিত এর মতে "যখন কোনো আলোকরশ্মি একটি ত্রিপার্শ্ব কাঁচ (prism) ভেদ করে তখন আলোক রশ্মির গতি কমে যায় এবং এর কমার হার প্রতিসরণের সমানুপাতিক, প্রতি শব্দ কোনের সমানুপাতিক। কিন্তু ইবনে হেইসেম (Heysem) বলেন এর কমার হার প্রতিসরণ কোণের সমানুপাতিক নয়। বরং এটি প্রতিসরণ কোণের সাইনের সমানুপাতিক। গতির হ্রাস পাওয়া বস্তুর সমানুপাতিক এবং বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয়টি তিনি পরমাণু সূত্রের আলোকে সম্পন্ন করেন।

রসায়ন বিজ্ঞানের জনক হলেন মুসলিম বিজ্ঞানীগণ। এর জনক হলেন জাবের ইবনে হাইয়্যান। তিনি সর্বপ্রথম (Fission of Atom) পরমাণু কে বিভক্ত করা যেতে পারে এ ধারণা প্রদান করেছিলেন। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে তিনি শ্রেষ্ঠ একজন বিজ্ঞানী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রসায়ন

www.pathagar.com

(Chemestry) বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। পরমাণু তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আজকে আমাদের পুস্তকে (Lavoisi) লাভোইসি ও নিউটনের যে সূত্রগুলো পড়ানো হয় এগুলো তিনি বহু শতাব্দী আগে উদ্ভাবন করেছিলেন। ইউরোপীয়দের আবিষ্কারের ১০০০ বছর পূর্বে তিনি এগুলো উদ্ভাবন করেছিলেন। জাবির ইবনে হাইয়্যান হলেন ৮ম শতাব্দীর বিজ্ঞানী। অন্যদিকে নিউটন ১৯ শতাব্দীতে ইউরোপে সূত্রগুলোর ধারণা প্রদান করেন। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ধারণা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন জাবির ইবনে হাইয়্যান এটা কিভাবে আমরা জানি? অতি সম্প্রতি জার্মানিতে ৪ খন্ডে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, এই বইতে জাবির ইবনে হাইয়্যান এর বইয়ের ফটোকপি সংযুক্ত করা হয়েছে। ঐ বইয়ের মাধ্যমে সকলেই এই ব্যাপারে জানতে ও দেখতে পারবে। ইউরোপীয়রা ১৪শ' শতাব্দীতে জাবির ইবনে হাইয়্যান এর বইকে অনুধাবন করেছিল।

কিন্তু তারা এটা বুঝতে পেরেছে ১৬ শতাব্দীতে এবং তা লাভোইসির (lavoisi) সূত্রনামে প্রকাশ করেছে। অন্যটা ১৭শ' শতাব্দীতে বুঝতে পেরেছে এবং সেটাকে গেই লুসাক (Gay lussac) এর সূত্র নামে প্রকাশ করেছে। ১৯শ' শতাব্দীতে যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাখ্যা বুঝতে পেরেছে তখন এটাকে নিউটনের সূত্র ও আবিষ্কার বলে প্রকাশ করেছে। জাবির ইবনে হাইয়্যান সর্বপ্রথম বিজ্ঞানাগারের ধারণার প্রবর্তক। তিনি সর্বপ্রথম পরিমাপ (measurement) এবং পরীক্ষা (experiment)-এর উদ্ভাবন করেন। তিনি সর্বপ্রথম একটি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপীয়রা এখনো সেই মানের কোনো বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অবশ্যই আমরা যখন এখানে আসি তখন আমাদের বুদ্ধি বিবেক থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু জাবির বিন হাইয়্যান হিজরী ২য় শতাব্দীর জ্ঞানকে এতো উৎকর্ষতায় উন্নীত করেছিলেন। আজকে জার্মানিতে জাবির ইবনে হাইয়্যানকে নিয়ে ডক্টরেট করা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, পশ্চিমারা আমাদের বিজ্ঞানীদের লেখা বইগুলোকে নিয়ে তাদের নামকে গোপন করে, তাদের নিজস্ব অমুসলিম বিজ্ঞানীদের নামে চালিয়ে দিচ্ছে। আর আমরাও তাদের রচিত বইগুলোকে অনুবাদ করে তাদের বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে জানাচ্ছি এবং সকল আবিষ্কার তাদের বলে ধারণা করছি আর আমাদের মহান বিজ্ঞানীগণ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছি। মুসলিমগণ সঠিক ইতিহাসের সন্ধান বিশ্ববাসীকে দিয়েছে। ভূগোল এর আবিষ্কারও করেছে

www.pathagar.com

মুসলিমগণ। অতীতে ইতিহাস ছিলো উপন্যাস নির্ভর। ইবনে খালদুন হলেন সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক যিনি ইতিহাসকে উপন্যাস ধারা থেকে বের করে নিয়ে আসেন: ইতিহাস কোনো উপন্যাস হতে পারে না। ইতিহাস হলো সকল মানুষ ও সকল জাতির পতন ও বসবাস করার কাহিনীকে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে এটি যে একটি জ্ঞানের অন্যতম শাখা এবং এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম ইতিহাসের পুস্তক রচনাকারী হলেন ইবনে খালদুন এবং তিনি সর্বপ্রথম ভৌগলিক মানচিত্র আবিষ্কার করেন। এমনকি আমেরিকার আবিষ্কার ও সর্বপ্রথম মুসলিমরাই করেছিলেন।

মুসলিমদের প্রস্তুতকৃত মানচিত্রে আমেরিকার অস্তিত্ব দেখানো হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি যে আমেরিকাকে আবিষ্কার করেছেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস। কেনই আমরা সব কিছুই এ রকম জানি? কারণ হলো আমরা সকল তথ্য ও উপাত্ত ইউরোপিয়ানদের থেকে আমদানী করি বলেই এই অবস্থা। দেখুন ক্রিস্টোফার কলম্বাস সম্পর্কে নতুন করে অনুসন্ধান কি বলে? ক্রিস্টোফার কলম্বাস ছিলেন একজন ভেনেডিস্ট (venedians) অর্থাৎ তিনি বণিকদের জাহাজের মাধ্যমে মুসলিম দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক তৈরি করেন। অনেক মুসলিম তাদের বই পুস্তক ভেনেডিয়ান (venedian) ও জেনোভিজ (Genovese) ভাষায় অনুবাদ করে সেখানে ইন্তেকাল করেন। ক্রিস্টোফার কলম্বাস মুসলিমদের সেই সকল বই থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন যে, যদি পশ্চিমের দিকে সোজা যাওয়া যেতে পারে তাহলে সে নতুন মহাদেশের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই জন্য তিনি, এই ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে প্রথমবারের মতো আটলান্টিক এর বুকে পাড়ি জমান। ক্রিস্টোফার কলম্বাস মাসের পর মাস পশ্চিম দিকে যেতে থাকেন কিন্তু কোনো স্থলভূমি খুঁজে পান না। অবশেষে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, জাহাজের অভ্যন্তরের তার সাথীগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে।

তারা বলতে থাকে যে, আমরা ফিরে যাব। তুমি নিজেও জান না আমাদেরকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে যাচ্ছ। এই যাত্রার কোনো ফলাফল পাওয়া যাবে না। তাদের এই ক্ষোভকে দমন করার জন্য ক্রিস্টোফার কলম্বাস এই কথা বলে তাদেরকে নিবৃত্ত করেন যে "দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না, এইভাবে বলোনা। আমি যদি সঠিকভাবে পশ্চিম দিকে যাই তাহলে যে, নতুন ভূমির সন্ধান পাব এই চিন্তা ও তথ্য মুসলিমদের রচিত বই থেকে জানতে পেরেছি। সে ভূমিতে আমরা অবশ্যই পৌঁছতে পারব। কারণ মুসলিমরা কখনো মিথ্যা

www.pathagar.com

বলতে পারে না।" এরপর তারা সকলেই ধৈর্য ধারণ করে সেই পথে যেতে থাকে। অবশেষে তারা আমেরিকা মহাদেশের সন্ধান লাভ করে।

সমগ্র দুনিয়াতে জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত হচ্ছিল, তখন কেন এক অজানা কারণে ইসলামের সোনালী যুগে সত্যিকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত সম্প্রসারণ ঘটলো? এর উৎস এবং মানবতাকে গতিদানকারী তেলেসমাতি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কি কুরআনে কারীম ছাড়া অন্য কিছুর নাম বলা যেতে পারে? মানবতাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে এই গগনচুম্বী উচ্চতা দানকারী হলো দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতা দানকারী কুরআন ছাড়া অন্য কিছু নয়। আজকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেখানে এসে আটকে যাচ্ছে তারা কুরআনের কাছে এসে কুরআনের আলোয় নতুন পথের সন্ধান পেতে পারে। এই জন্য যে ব্যক্তি কুরআনকে নিয়ে গবেষণা করে না, সে কক্ষনো সত্যিকারের বিজ্ঞানী হতে পারবে না।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে তুলনা করে আমরা এই দৃশ্য দেখতে পাই: পাশ্চাত্যের মানুষদের চোখ হল বন্ধ তারা কোথায় যাবে তা তারা জানে না। বন্ধ চোখে তারা সত্যিকারের কিছু খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করে, ধরে, কিন্তু তারা বলে যে না এটা না। অন্যটা ধরে, বলে যে না এটাও না। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের অবস্থা হলো এমন। কিন্তু প্রাচ্যের বিজ্ঞানীদের অবস্থা তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা সে জ্ঞানের রাজ্যে ঈমান নামক চাবিকাঠি নিয়ে প্রবেশ করে। কুরআন থেকে প্রাপ্ত আলো এবং ইলহামের মাধ্যমে সে এর সমগ্র স্থানে বিচরণ করে এবং শিক্ষা গ্রহণ করে ও শিক্ষা দেয়।

মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে এভাবেই বিপ্লব সাধন করেছিলেন। কেউ যেন আমাদের পাশে এসে একথা না বলে যে, পাশ্চাত্যে এটা আছে সেটা আছে। আমাদের এবং পাশ্চাত্যবাদীদের বের হওয়ার রাস্তা একই, আর সেটা হলো ইসলাম। এটা শুধু আমাদের ঈমানের দাবি হিসেবেই বলি না। জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে অনেকদিন গবেষণাকারী একজন মানুষ এ কথা হিসেবে বলছি যে, দুনিয়াবী সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায়। আর সামনে এগুতে পারে না। এই জন্য এটা আমি বিশ্বাস করি যে, থমকে দাঁড়ানো স্থান থেকে কেবলমাত্র কুরআনের আলোতেই আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারি।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে আজ অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা দুনিয়াবী দিক থেকে পরিপূর্ণ একটি ইসলামী সমাজ অনুপস্থিত। কিন্তু বাস্তবে এটা না থাকার দ্বারা এটা বুঝায় না যে, ইসলাম পরিপূর্ণ সুন্দর একটি সমাজব্যবস্থা উপহার দিতে সক্ষম নয়। এজন্য আমরা যে কোনো একটি দেশের প্রয়োগকৃত কোনো পদ্ধতিকে নয়, ইসলাম যে নীতি-পদ্ধতি নিয়ে এসেছে তার শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিকব্যবস্থা সামাজিক ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করা জরুরি। কেননা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো কিছু হক এবং হাকিকতের উৎস হতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত, কিছুদিন পূর্বেও পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ব্লক দেখতে পেতাম। এর একটি ছিল প্রাচ্যের ব্লক অর্থাৎ কম্যুনিস্ট ব্লক আর অপরটি ছিল পাশ্চাত্যের ব্লক অর্থাৎ ক্যাপিটালিস্ট ব্লক (পুঁজিবাদী ব্লক)।

কম্যুনিস্ট ব্লকের অধিভুক্ত দেশগুলো সত্যিকার অর্থেই অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং দুনিয়াবী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন একটি জগৎ ছিল। এই ব্লকের সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় ২শ' বছর পূর্বে কার্ল মার্কস নামক এক ইয়াহুদির অর্থনৈতিক থিওরিসমূহের ভিত্তিতে। এই লোকটি এই থিওরিগুলোকে ময়দানে ছেড়ে দিয়ে শুধু কি অর্থনৈতিক একটি দৃষ্টিভঙ্গি দিতে চেয়েছেন, নাকি তিনি অন্য একটি ফলাফলে পৌঁছতে চেয়েছিলেন? এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। তার লালন-পালন এবং তার আদর্শিক বিষয়গুলোকে যদি সামনে এনে পর্যালোচনা করি তাহলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে খুবই সরলভাবে বিবেচনা করা হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে তার এই চিন্তা-চেতনাকে ময়দানে ছেড়ে দেয়া হয় এবং রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়াতে এই আদর্শ জায়গা করে নেয়। এই চিন্তাগুলো রাশিয়ায় একটি কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। এভাবে এই আদর্শটিকে বাস্তবায়নের জন্য একটি ভূমি পেয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করে দখল করে নেয় এবং এভাবে এই চিন্তা ও আদর্শ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের প্রায়োগিক এই আদর্শ দীর্ঘ একটি সময় অতিবাহিত করেছে। এজন্য কোন আদর্শ মানুষকে কোন ফলের দিকে ধাবিত করতে পারে এটা আজ আমাদের সামনে সুস্পষ্ট। এক সময় থিওরি হিসেবে পরিগণিত মতাদর্শসমূহ মানবজীবনে কোন ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে এটাকে আর ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে

www.pathagar.com

বিচার করতে হয় না, মানুষ আজ এগুলো স্বচক্ষে দেখতে পারছে এবং উপলব্ধি করতে পারছে।

এক সময় প্রাচ্যের দেশগুলোতে ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ ছিল। খুব কম জায়গাতেই যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করা হতো। পরবর্তীতে আরও কিছু স্থানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং সেই সকল দেশের বাস্তব অবস্থা সেখানে গিয়ে পর্যালোচনা করার অনুমতি দেওয়া হয়। যুদ্ধের পূর্বে প্রাচ্যের ব্লকের বিভিন্ন স্থানে আমি ভ্রমণ করেছি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে আমি সে দেশসমূহতে গিয়েছি। এমনকি একবার প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত একটি মেলা উপলক্ষে সফর করার সুযোগ পেয়েছিলাম। অল্প একটি সময়ে লেইপজিগ (Leipzig) এবং মিউনিখের বিভিন্ন মেলায় অংশ নিয়ে সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। এর পূর্বেও প্রাচ্যের বিভিন্ন ব্লকে যাতায়াত করার সুযোগ হয়েছিল। এজন্য কারোর বরাতে নয়, নিজের চোখে যা দেখেছি সেটাই বুঝানোর চেষ্টা করছি।

প্রাচ্যের ব্লকের চিন্তার মুল উৎস ছিল কম্যুনিস্ট আদর্শ। এই ব্যবস্থায় কোনো বস্তুকে ব্যক্তিগত মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত করে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করার কোনো অধিকার নেই। এই ব্যবস্থায় অর্থ উৎপাদনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ সমাজের সম্মিলিত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। এটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সবাইকে তার ব্যক্তিগত অধিকারকে উৎসর্গ করতে হবে। এই দেশগুলোতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পনা মাফিক ছিল এবং এই পরিকল্পনা ছিল আবশ্যকীয় পরিকল্পনা। জোরপূর্বকভাবে এই পরিকল্পনা সবার উপর চাপিয়ে দেওয়া হতো। উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটা নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু এতে একটি সত্য লুকায়িত ছিল। এই দেশ সমূহে শাসক শ্রেণী এবং শাসিত শ্রেণী নামে দু'টি শ্রেণী ছিল। শাসক শ্রেণী এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সব রকমের পন্থা অবলম্বন করতো। প্রাচ্যের ব্লকে 'লাভ' নামক কোনো পরিভাষা ছিল না। মালিকানা ছিল না। অর্থ এবং সম্পদ সবকিছুই ছিল সম্মিলিত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। জনগণ শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনের মিনিমাম একটি পরিমাণ এখান থেকে নিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারত। বসবাসের জন্য সর্বনিম্ন পরিমাণ নেয়ার পর অবশিষ্টটুকু থাকত সম্মিলিত মালিকানার। সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। এজন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করে অনেক বেশি উপার্জন করব

www.pathagar.com

এমন কিছু ছিল না। কারণ সবাইকে তার প্রয়োজনের সর্বনিম্নটুকুই দেওয়া হতো। কেউ সম্পদকে জমা করা কিংবা বেশি মাত্রায় ভোগ করার কোনো প্রকার অধিকার রাখত না। 'বেশি উৎপাদিত সম্পদ জনগণের সম্পদ'

এ কথা বলে সবকিছুকেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পুঁজিভূত করা হতো। কারো কোনো সম্পদ ছিল না। টেক্সি ড্রাইভার শুধুমাত্র একজন চালক ছিল এতে তার কোনো ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি ছিল না। সবাই ভাড়া বাসায় থাকত এবং কোনো কিছুর মালিক হওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সেটা হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

এ কারণে এই পদ্ধতি সমাজে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। এ রকম একটি পদ্ধতি মানব প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় এবং সৃষ্টির সাথে খাপ না খাওয়ায় মানুষ তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল।

সে সময় পশ্চিম বার্লিন থেকে পূর্ব বার্লিনে যাওয়ার সময় যে দৃশ্য চোখে পড়ত তা ছিল এমনঃ পূর্ব বার্লিনে যেন এক বিপদ সংকেত বেজে উঠেছে সকলেই দুঃখ ভারাক্রান্ত। রাস্তাঘাট জনমানবশূন্য। চার-পাঁচ জন মানুষ ছাড়া রাস্তায় মানুষই খুঁজে পাওয়া যেত না। সকলেই দুঃখ ভারাক্রান্ত মুখে কোনো হাসি নেই। শোকেসসমূহের জানালাগুলো অস্পষ্ট, মালামাল অগোছালো। এ দৃশ্যকে শাসকগোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতেই বাধ্য হতো। কারণ সেগুলো সুন্দর করার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি যত সুন্দর করেই করুক এতে তার কোনো লাভ নেই। এর মাধ্যমে কিছু উপার্জন করতে পারবে না। তাই সে তার দায়িত্ব যেনতেনভাবে পালন করেই ক্ষান্ত থাকত এবং সে বুঝত যে, সে তার উপর অর্পিত দায়িত্বকে পালন করেছে। মানুষকে আরও বেশি সুন্দর আরও বেশি উন্নত আরও বেশি উপরে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো পদ্ধতি শাসক গোষ্ঠীর জানা ছিল না। কেননা সে যে কাজটি করছে সেটা অনেক বেশি সুন্দর করার মধ্য দিয়ে সে ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে কোনো কিছু উপার্জন করতে পারত না। তাদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক কোনও পুরস্কার ছিল না।

এই দেশসমুহে অনেক নির্মাণাধীন এবং নির্মাণকৃত ভবন দেখেছি। আমাদেরকে বিভিন্ন ভবন দেখানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তা ঘুরে ঘুরে আমাদেরকে দেখিয়েছে। পরিদর্শনের পর যা মনে হয়েছে সেটা হলো, এর সবগুলো বাড়িই দায়সারাভাবে করা হয়েছে। মনে হয়েছে চাপিয়ে দেওয়া কোনো কাজকে শুধুমাত্র বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মানবিক মূল্যবোধ, কোনো

www.pathagar.com

কিছুকে সৃজনশীলভাবে করা, সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করে একজন মানুষ এ কথা বলতে পারবে যে, আমি এটা করেছি, এই ফলাফলটা আমার কারণেই এসেছে এমন কোনো কিছুর লক্ষণ সেখানে ছিল না। তাদের প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থার সাথে মানব প্রকৃতির কোনো সঙ্গতি না থাকায় এবং সকল প্রকার আবেগ-অনুভূতি থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে সেখানে রূহ বা প্রাণের কোনো উপস্থিতি ছিল না।

ঘরবাড়ি করেছে কিন্তু ৬ জন সন্তান বিশিষ্ট একটি পরিবারের জন্য ৪৮ বর্গমিটারের একটি ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মাত্র। কলকারখানা গড়ে তোলা হয়েছে, কিন্তু উন্নয়ন-উৎপাদন বাড়ুক, দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন হোক মানুষের অবস্থার উন্নতি এ জন্য নয়, বরং শুধুমাত্র লোক দেখানোর লক্ষ্যে বা কিছু সুযোগ-সুবিধা তৈরি করার জন্যই এসব করা হয়েছে। মানবজাতির উন্নতি, অগ্রগতি এবং উন্নয়নের বাধাদানকারী এমন মানুষের অস্তিত্ব সবসময় সকল পরিবেশেই ছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি অগ্রগতির জন্যই মূলত এই ধরনের শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে শ্রমিকের অধিকার এবং প্রয়োজনকে পূর্ণ করার পরিবর্তে তাদের অধিকারকে গ্রাস করা হয়েছে এবং তাদেরকে অমানবিক চাপের মধ্যে রেখে রাষ্ট্রযন্ত্র তার স্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত ছিল। এসব দেশে নিয়োগকর্তা এবং রাষ্ট্র এক এবং অভিন্ন। শ্রমিককে প্রদত্ত বেতনের ব্যাপারে তারা কারও কাছে গিয়ে অভিযোগ করবে এমন কোনো কর্তৃপক্ষ ছিল না। রাষ্ট্র এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য থাকার কথা ছিল না। শ্রেণীবিহীন একটি সমাজ হওয়ার পরও এই শাসন ব্যবস্থায়ও শাসক এবং শাসিত গোষ্ঠীর জন্ম স্বাভাবিকভাবে হয়েছিল। শুধুমাত্র এটাই পার্থক্য ছিল যে, শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য কোনো প্রকার কর্তৃপক্ষ বা ব্যবস্থা ছিল না। শাসকশ্রেণী খুব স্বস্তির সাথে সকল প্রকার জুলুম-নির্যাতন করার অধিকার পেয়েছিল।

এই শাসনব্যবস্থা মানবসমাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় এটা আর চলতে পারেনি। এই দীর্ঘ একটি অভিজ্ঞতার পর এই শাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ধারক বাহকগণসহ সকলেই পিছুটান দিয়েছে এবং আস্তে আস্তে নিজেদের আদর্শ বাদ দিয়ে নতুন কোনো সমাধান বের করার জন্য বাধ্য হয়েছে।

www.pathagar.com

এমনকি ক্রুশচেভের সভাপতিত্বের সময় তার প্রদত্ত একটি বক্তব্য অনেক আশ্চর্যজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি টার্নিং পয়েন্টের সূচনা করেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'রাশিয়াতে কৃষি উৎপাদন আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে না। এমনকি পারবে বলেও মনে হচ্ছে না। কম্যুনিস্ট শাসনব্যবস্থা সুন্দর একটি শাসনব্যবস্থা। কিন্তু নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য আমরা খুবই সীমিত এক টুকরো জমি দিয়ে থাকি। আমাদের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তাদেরকে বেশি পরিমাণ জমি প্রদান করে থাকি। গ্রামবাসীর মালিকানাধীন জমিতে তারা সুন্দরভাবে চাষাবাদ করে এবং বেশি ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু আমাদের সাথে অংশীদারমূলক জমিতে তারা ভালোভাবে চাষাবাদ করে না। এ জন্য আমরা আমাদের প্রত্যাশিত ফসল উৎপাদন করতে পারি না। আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারি না। আমরা যদি রাশিয়াতে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে চাই তাহলে আসুন বন্ধুরা আমরা গ্রামবাসীকে যে জমি চাষ করার জন্য দিয়েছি তা বৃদ্ধি করি।'

এর অর্থ হলো 'গ্রামবাসীর মালিকানার স্বীকৃতি আমাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে এবং তার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য তারা অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল না হওয়ায় এই ব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়। অপরদিকে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয় যাতে এক ফ্যাক্টরি উৎপাদন না করলেও অপর কারখানাগুলো (Factory) উৎপাদন করতে বাধ্য হয়। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, তারা আস্তে আস্তে লাভ-ক্ষতি পদ্ধতিতে ফিরে আসতে শুরু করে। আজকের এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে এ কথা খুব সহজেই বলা যায় যে, কিছু আকস্মিক ঘটনার কারণে কম্যুনিজম মানব ইতিহাসে একটি বিপ্লব করতে পারলেও, মানব প্রকৃতির সাথে এটি সামঞ্জস্যশীল না হওয়ায় কিছুদিন বেঁচে থাকলেও একটি নির্দিষ্ট সময় পর এটি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

প্রাচ্যের বুকে মানুষের সামাজিক জীবনে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করার কারণে মানুষদের খুশি করতে পারেনি। প্রাচ্যে আমরা সমাজ-জীবনকে যে অর্থে বুঝে থাকি, প্রাচ্যের সামাজিক জীবনে এ রকম কোনো পারিবারিক ব্যবস্থা অবশিষ্ট ছিল না। পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য না করে তাদেরকে হালকা এবং ভারি সকল প্রকার কাজ করতে বাধ্য করা হতো। বাচ্চাদেরকে কোনো পরিবারের বলে বিবেচনা করা হতো না।

www.pathagar.com

তারা সমাজের সন্তান বলে বিবেচিত হতো এবং খুব সহজেই খুব কম বয়সেই পরিবার থেকে আলাদা করে ফেলা হতো। 'যদি এভাবে লালনপালন করি সমাজের জন্য বেশি উপকারী হবে, যদি সেভাবে লালন-পালন করি তাহলে সমাজের জন্য বেশি উপকারী হবে' এই চিন্তার আলোকে গড়ে উঠা বিশেষ ক্যাম্পে তাদেরকে লালন-পালন করানোর জন্য পাঠানো হতো। স্বাভাবিক কোনো পারিবারিক জীবন সেখানে ছিল না।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে চিহ্নিত করা জরুরি। আল্লাহ্ প্রদত্ত বিভিন্ন দায়িত্বসহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র বিষয়কে অস্বীকার করার কারণে সেখানে কোনো প্রকার শান্তি এবং আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া ছিল না। অপরদিকে সকল কিছুকেই বস্তুগতভাবে (meterialistic) বিবেচনা করার কারণে মানুষের আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর এক ধরনের আবরণ পড়ে গিয়েছিল। প্রাচ্যের ব্লকে ভ্রমণ করার সময় মনে হতো যে, এ সব এলাকায় কোনো মানুষ নেই এটা যেন একটা রোবটের রাষ্ট্র। মানুষের সমাজকে একটি কল্যাণময় সমাজে পরিণতকারী শান্তি, ভালোবাসা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো উঠে গেলে মানব সমাজের অবস্থা যে কেমন হয়, এটা কম্যুনিস্ট ব্যবস্থায় দেখা সম্ভব। নিজেদের চিন্তা-চেতনায় আখিরাতের স্থান না দেয়ায়, সবকিছুকেই দুনিয়ারই লাভ-ক্ষতি অনুযায়ী বিবেচনা করত। একজন বুদ্ধিমান এবং উচ্চ চিন্তার অধিকারী মানুষ শুধুমাত্র এ রকম দুনিয়াবী ক্ষণস্থায়ী বিষয় নিয়ে মগ্ন থাকতে পারে না। এজন্য তারা মানুষের কল্যাণমূলক কোনো কাজ করতে পারে না।

এই সমাজে পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য না করে এবং সকল ব্যাপারে কাজের সফলতাকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে যে কম কাজ করত তাকে কম বেতন আর যে বেশি কাজ করতো তাকে বেশি বেতন দেওয়া হতো। মহিলারাও অনেক কঠিন কাজ করতে বাধ্য হতো। এখানে বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শনের সময় অনেক ভারি ভারি কাজে মহিলাদেরকে দেখেছি। গরম লোহাকে হাত দিয়ে টেনে বের করে বহনকারী নারীদের দেখেছি। বের হওয়া গরম লোহাকে চিমটি দিয়ে ধরে দ্বিতীয় পর্যায়ে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল। রক্ত পানি করে তারা এসব ভারি ভারি কাজ করত। রাতে দেরিতে বাড়ি ফিরতে হতো এবং ভোরে এসে তাদেরকে কাজে যোগদান করতে হতো।

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিক কোনো কিছু করা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এমনকি পুরুষদের চেয়ে তাদেরকে কম পারিশ্রমিক দেওয়া হতো।

সে সময়েই লেইপজিগে (Leipzig) একটি জাদুঘর পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। এই জাদুঘরে আগত দর্শনার্থীদেরকে বিভিন্ন সময় মূল্যায়ন করার দায়িত্ব ছিল একজন মহিলার। এই নারী প্রতি ঘণ্টায় আগত অতিথিদেরকে একঘণ্টা পূর্বে যে কথা বলত সেটা পুনরাবৃত্তি করে শোনাত। দেড়শ' বছর পূর্বের গণবিক্ষোভের একজন নেতার প্রতিমূর্তিকে বুঝানোর জন্য ৪৫ মিনিটের এক বক্তব্যে কোনো প্রকার সম্পৃক্ততা না থাকার পরও ত্রিশ মিনিটের বেশি তাকে রাশিয়ার প্রশংসা করতে হয়েছে।

'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য রাশিয়ানরা সেই সময় থেকে কত বেশি প্রচেষ্টা চালিয়েছে। জার্মানির এই মহিলাকে তারা এ কথা বলাতে বাধ্য করতো। তার কথা বলার সময় তার মুখ থেকে বুঝা যাচ্ছিল যে, আমি যদি মুক্তভাবে এই জায়গায় কাজ করতাম তাহলে এই মূর্তির ইতিহাস এবং আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক সুন্দরভাবে বুঝতে পারতাম। কিন্তু কি করব এখানে আমাকে যা বলতে বলে আমিও সেটা তোতা পাখির মতো বার বার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য।'

এর বিপরীতে যদি আমাদের প্রজেক্টকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুরাই তাহলে আমরা কি দেখতে পারব? পশ্চিমকে যদি আমরা একই মানদণ্ডে বিবেচনা করি তাহলে পূর্বের সম্পূর্ণ বিপরীত আমরা পশ্চিমে দেখতে পাই। পশ্চিমে মালিকানা তত্ত্ব রয়েছে। লাভ-লোকসানের পদ্ধতি রয়েছে। মানুষ নিজেদের জন্য উপার্জন করে নিজের হাতে সম্পদকে জমা করতে পারে এবং এর একটি অংশের মালিক হতে পারে। পাশ্চাত্যে/পশ্চিমে পুঁজি রয়েছে এবং টাকা, টাকা উৎপাদন করে। বেশি পুঁজির মানে হলো বেশি উপার্জন। মানুষ তার ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পদের মালিক হতে পারে। এই অবস্থার একটি চমৎকার উপকারী প্রভাব রয়েছে। সেটা হলো এটা মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত সামঞ্জস্যশীল হওয়ায় পশ্চিমে উৎপাদন অনেক বেশি। এই বেশি উৎপাদন আরও বেশি উপার্জন এবং আরও উন্নত জীবন মান আনয়ন করেছে। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জীবনমান উন্নত হলে রাষ্ট্রযন্ত্র সে সমাজের কাজ করতে অক্ষম, দরিদ্রদেরকে এ জন্য আলাদা সমাজের ব্যবস্থা করে, রাষ্ট্রের মাধ্যমে

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু এই অর্থনৈতিক জীবন ও আদর্শ একটি জীবন নয়। কেননা পাশ্চাত্যের পদ্ধতিও প্রাচ্যের কম্যুনিস্ট অর্থ ব্যবস্থার মতো বস্তুবাদকে (materialism) ভিত্তি হিসেবে ধরে গঠন করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্যের ধনীক শ্রেণী, গরীবদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার প্রয়োজনবোধ করে না। 'তারা বলে থাকে যে' তারাও কাজ করে উপার্জন করুক।' পাশ্চাত্যে সকল কিছুকেই লাভ-ক্ষতি এবং সার্থক বিবেচনার কারণে তাদের মধ্য থেকে 'ইসলাম' নামক বিষয়টি বলতে গেলে একপ্রকার উধাও হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যে এক টাকার জন্য অন্য মানুষকে তারা অনেক বড় জুলুম করতে প্রস্তুত কিন্তু সেই এক টাকাকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়।

সত্যিকার অর্থেই পাশ্চাত্যের সকল জায়গায় বস্তুবাদের (materialism) উপর ভিত্তি করে এমন এক সমাজের উৎপত্তি ঘটেছে যেখানে, ইনসাফের ব্যাপারে সকলেই অন্ধের মতো। যারা পাশ্চাত্যের দেশসমূহে ভ্রমণ করেন তারা এই অবস্থার অনেক উদাহরণ হয়তো স্বচক্ষে দেখেছেন। পাশ্চাত্যের সমাজে পারিবারিক প্রথা রয়েছে। সকলেরই সন্তান-সন্ততি রয়েছে এবং এগুলো নিয়ে তাদের একটি পরিবার প্রথা গড়ে উঠেছে। কিন্তু এটা কল্যাণমুখী একটি সমাজ গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা পাশ্চাত্য পুরুষদের মতো মহিলাদেরকেও একই শর্তের মধ্যে কাজ করা জরুরি বলে মনে করে। পরিবারের দুই দিকের সকলেই একই শর্তের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হয়। মহিলারাও কাজ করতে পারে এমন একটি ধারণা তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হওয়ার কারণে তাদের কথা হলো নারীরা কাজ করে তাদের নিজেদের খরচ নিজেরা বহন করবে এবং কর্মজীবনে পুরুষ-মহিলা দু'জনই সমান। তাদেরকে একই শর্তের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। নারীকে অবশ্যই উপার্জন করতে হবে। যদি সে উপার্জন করতে না পারে তাহলে সে নিজেকে খুবই ছোট মনে করে। এখানে পুরুষ পরিবারে অর্থ উপার্জনের কারণে পরিবারে তার কর্তৃত্ব এবং অবদান বেশি এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় তারা ভোগে। এই চিন্তাধারা সত্যিকারের একটি কল্যাণময় সমাজ গঠন করতে পারে না। পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনা, নারীর স্বভাব প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন অনেক কিছু তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। এ জন্য পাশ্চাত্যের একজন নারীকে আমরা সুখী একজন নারী হিসেবে বিবেচনা করতে

www.pathagar.com

পারি না। যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের নারীদের সাথে তুলনা করি তাহলে তাদের মধ্যে শুধুমাত্র পার্থক্য হলো সচ্ছলতা। অর্থাৎ সোভিয়েত ব্লকের নারীদের চেয়ে পাশ্চাত্যের নারীরা বেশি সচ্ছল।

এই দুই পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করার পর আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, নারীদের জন্য আসল জায়গা হলো ইসলাম। ইসলাম তাদেরকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান করেছে।

মুসলমানদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি অর্থব্যবস্থা রয়েছে। এই অর্থনৈতিক পদ্ধতি না প্রাচ্যের অর্থনীতি না পাশ্চাত্যের অর্থনীতি। কেননা ইসলাম সর্বদা বস্তুবাদ এবং আধ্যাত্মিকতাকে একসাথে পরিচালনা করেছে। এজন্য ইসলামে একই সাথে বস্তুবাদ রয়েছে এবং পৃথিবীর কোথাও যাতে শোষণ-বঞ্চনা না থাকে এটাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আধ্যাত্মিকতাও রয়েছে। ইসলামের অর্থব্যবস্থা বস্তুবাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। সকলের ধন-সম্পদ থাকবে এবং সকল সম্পদের মালিকানা তার নিজের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে এর প্রতি কেউ লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না। সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব সম্পদের মালিকের রয়েছে এবং এই অধিকার এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূল (সা.) এ ব্যাপারে অনেক সতর্ক বাণী ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা যখন আখিরাতে আসবে তখন অন্যান্য অনুযোগ এবং গুনাহ নিয়ে আসবে। কিন্তু খবরদার অপর ব্যক্তির অধিকার হরণ করে আমার কাছে আসবে না।' এর অর্থ হলো অপরের সকল প্রকার মাল, অর্থের মতো অন্যান্য অধিকারের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

একই সাথে ইসলাম অর্থ উপার্জন এবং লাভের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। কেননা হযরত মুহম্মদ (সা.) বলেছেন, 'উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।' এর অর্থ হলো প্রতিটি মুসলমানের উচিত অর্থ উপার্জন করা এবং অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। হাদিসে আরও বলা হয়েছে, 'নিজ হাতে অর্থ উপার্জনকারী আল্লাহর বন্ধু।' এজন্য প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হলো পরিশ্রম করা, উৎপাদন করা এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বিতা অর্জন করে অপরের সাহায্যকারী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। এদিক থেকে ইসলাম পাশ্চাত্যের (পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা) সাথে মিলে যাওয়ার মতো মনে হয়। মালিকানার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে ইসলাম ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থব্যবস্থা পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মতো নয়। এর মধ্যে এক বিশাল পার্থক্য রয়েছে, আর সে পার্থক্য হলো, মুসলমান উপার্জন করবে কিন্তু অপচয় করবে না। কেননা 'অপচয় করা হারাম'। এজন্য মুসলমান সৎপথে অর্থ উপার্জন করবে। কিন্তু অবশ্যই এটা ভালো এবং মঙ্গলজনক কাজে ব্যয় করবে। কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষের মধ্যে এমন কোনো মূলনীতি নেই। সে তার উপার্জিত অর্থকে তার ইচ্ছা ও মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য যেখানে ইচ্ছা সেখানে খরচ করতে পারবে। কিন্তু ইসলাম এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থ উপার্জন করে ধনী হওয়ার পর সে অহংকারী নয় বিনয়ী হবে। অপচয় করতে পারবে না। সর্বদা অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। দরিদ্রকে দান করবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম, পাশ্চাত্যের শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত আপত্তিকর বিষয়সমূহকে দূরীভূত করে এবং পবিত্র একটি লক্ষ্য, উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে কাজ করা একটি ব্যবস্থার নাম। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আধ্যাত্মিকতা এবং বস্তুবাদকে (materialism) কখনো ভিন্নভাবে দেখে না। এই ব্যবস্থায় এই দু'টি চেতনা সমান্তরালভাবে চলে। এর অনেক উদাহরণ আমরা দেখি এবং জানি।

এক সন্ধ্যায় ইস্তানবুলে একটি মিটিংয়ে দাওয়াত পেয়েছিলাম। গ্রিস থেকে আসা বয়স্ক একজন মহিলা মুসলমান হয়েছিল। তিনি দীর্ঘদিন গ্রিসে বসবাস করেছেন এবং সবশেষে মুসলমান হয়ে ইস্তানবুলের মুফতির কাছে তার সকল কাগজপত্র পেশ করেন। সেই দিন রাতে তিনি তার এক আত্মীয়ের বাসায় যান। আমরাও সেদিন একই জায়গায় মিলিত হয়েছিলাম। সেই মহিলা আজকের এই অবস্থায় পৌঁছতে পারায় খুবই খুশি। আমরা কথা বলার পূর্বেই তিনি বললেন যে, 'আপনারা এখানে এসেছেন এবং সমবেত হয়েছেন। আমি কেন মুসলমান হলাম এ ব্যাপারে জানতে আপনারা উৎসাহী। আপনারা প্রশ্ন করার পূর্বেই আমি আপনাদেরকে সংক্ষিপ্তভাবে বলতে চাই। আমরা কেনিয়ায় ধনী এক মুসলিম পরিবারের পাশে ছিলাম। পিতা-মাতা, ভাই-বোন আমরা সকলেই সেই বাড়িতে কাজ করতাম। এই পরিবারটি ছিল খুবই সম্ভ্রান্ত। এই মানুষটি এ দেশের সবচেয়ে বড় ধনীদের একজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন খুবই নম্র এবং বিনয়ী। আমি বা আমরা বাল্যকালে এমন কোনো ঈদ দেখিনি যে, ঈদে তিনি আমাদেরকে নতুন জামা-কাপড় কিনে দেননি। আমরা তার কাজের লোক হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে এবং আমাদের বাচ্চাদের তার

www.pathagar.com

নিজের পরিবারের সদস্যদের পূর্বে ঈদ উপহার দিতেন। প্রতি ঈদে আগে তিনি আমাদের জন্য আনতেন। পরবর্তীতে তার নিজের সন্তানদের জন্য আনতেন এবং তিনি সকলকে একই মানের সবকিছু দিতেন। আমরা কাজের লোক বলে তিনি আমাদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করতেন না। যে ধর্ম এমন একজন ধনী মানুষকে এমন নৈতিকতাসম্পন্ন এবং বিনয়ী বানিয়েছেন সেই ধর্ম সম্পর্কে ৪০ বছর যাবত আমি উৎসুক থাকব না তো কে থাকবে? আজ আমি এমন একটি ধর্মের একজন সদস্য হতে পেরে আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দরতম দিন হিসেবে উদযাপন করছি।'

ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা যেটা অনেক বড় একজন ধনীকে অহঙ্কার মুক্ত এবং বিনয়ী হিসেবে গড়ে তোলে। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। সৎ ব্যবসায়ীদের হাসর, নবীগণ এবং শহীদদের সাথে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও বেশি মর্যাদার কথা বলা হয়েছে উদারদের ব্যাপারে। উদার মানসিকতাসম্পন্ন লোকজন সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।' আর উদারতা হলো নিজের পছন্দনীয়, নিজের জন্য বাছাইকৃত জিনিসকে অপর ভাইকে দেওয়া, অপরকে উপহার হিসেবে দিতে পারা। ইসলাম সর্বদাই আধ্যাত্মিকতাকে বস্তুবাদের উপর স্থান দিয়েছে। সত্যিকারের ন্যায়-নীতি এবং সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা মানুষের সামনে পেশ করেছে। ইসলাম পরিবার এবং সমাজকে ভিত্তি হিসেবে ধরে সামাজিক জীবনের রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সকলের অধিকার নিশ্চিত করে একে-অপরের প্রতি সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি এবং ভালোবাসার সম্পর্ক নিশ্চিত করবে এমন একটি পারিবারিক রূপরেখা প্রণয়ন করেছে ইসলাম। প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। চল্লিশ ঘর পর্যন্ত বসবাসকারীকে প্রতিবেশী বলা হয়েছে। পরস্পরের সাথে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি এবং সুন্দর আচরণের আদেশ দেওয়া হয়েছে। পরস্পরের সাথে এই পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ এই সমাজ, সামাজিক দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর এবং শান্তিময় একটি সমাজ। মানুষ যদি সর্বদা অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসে এবং মনের মধ্যে এই অনুভূতিকে পোষণ করে তাহলে নিঃসন্দেহে এই সমাজ কল্যাণময় একটি সমাজে পরিণত হবে। দু'জন মুসলমান একসাথে হলে যদি এই চিন্তা করে যে, আমার এই সম্পর্কের মাধ্যমে আমার এই বন্ধুর কাছ থেকে কি ফায়দা হাসিল করতে পারব, তাহলে

www.pathagar.com

এই ধরনের সম্পর্ক থেকে কখনোই কল্যাণময় কিছু আশা করা যায় না। সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে আমি আমার এই ভাই এর কিভাবে উপকার করতে পারি এই চিন্তা করে যদি দু'জন মিলিত হই তাহলে সেই সম্পর্ক থেকে অনেক কল্যাণ এবং বরকত আশা করা যায়। যদি দুনিয়াবী দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে নিয়ে আসি, ইসলাম সবসময় এবং সর্বাবস্থায় আখিরাতকে চোখের সামনে রাখার ব্যাপারে আদেশ দিয়েছে। মানুষ শুধুমাত্র এই দুনিয়াবী জীবনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে সত্যিকারের সুখ-শান্তি কখনোই খুঁজে পাবে না। এজন্য তাকে অবশ্যই আখিরাতের ব্যাপারে ঈমান আনতে হবে এবং আখিরাতের লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। কেননা এই দুনিয়ার সকল কিছুই যদি মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় তাহলে এই সমগ্র সৃষ্টি এবং এই ব্যবস্থা তুচ্ছ ছাড়া আর কিছু নয় এবং এই সৃষ্টি সাময়িক কোনো সৃষ্টি নয়, মানুষ অবশ্যই অনন্তকাল পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে এমন এক সৃষ্টি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এগুলোকে অবশ্য অবশ্যই বাস্তবে রূপদান করবেন। এ জন্য মুসলমান শুধুমাত্র দুনিয়াকে চিন্তা করতে পারে না, একই সাথে সর্বদা তাকে আখিরাত সম্পর্কেও চিন্তা করতে হয়। চিন্তাই মূলত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি স্থাপন করেছে।

হযরত মুহম্মদ (সা.) একদিন ফজরের নামাজের পর বাজারে ঘোরাঘুরি করছিলেন। তিনি দেখলেন এক দোকানদার বাজারদরের চেয়ে কম দামে জিনিসপত্র বিক্রি করছে। এটা দেখে নবী করীম (সা.) তাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এগুলোকে কম দামে বিক্রি করছেন এবং কম লাভ করছেন কেন? শুধুমাত্র মুসলমানদের বাজারে পণ্যসামগ্রি সস্তা হোক এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে আখিরাতে অনেক বেশি প্রতিদান দিন এটা ভেবেই কি আপনি এমন করছেন?'

সে দোকানদার জবাব দিলেন 'জি ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এটার জন্যই এমন করছি। না হলে আমিও উচ্চ দামে বিক্রয় করতে পারতাম। কিন্তু কম লাভ করছি যাতে আমাদের বাজারে সস্তায় বেচাকেনা হয়। এটা মুসলমানদের বাজার আমার এই আচরণের প্রতিদান অবশ্যই আল্লাহ আমাকে দেবেন।'

এটা শুনে রাসলুল্লাহ (সা.) হাত তুলে এই ব্যবসায়ীর জন্য অনেক দোয়া করলেন। এজন্য সত্যিকারের একজন মুসলমান ব্যবসায়ীর উচিত এমন আচরণ করা যাতে সে সত্যিকারের একজন মুসলিম ব্যবসায়ী হতে পারবে। এমন ব্যবসায়ীদের অর্থনীতিতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনও অঢেল বরকত ঢেলে দেবেন।

www.pathagar.com

দুনিয়াবী বিষয়ে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি দানকারী এবং এমন একটি সুন্দর সমাজব্যবস্থা দানকারী ইসলামে নারীর অবস্থান কি? সে ব্যাপারে আলোকপাত করতে চাই। একজন মুসলমান নারী চাকরি-বাকরি করতে পারবে। ইসলাম এতে কোনো প্রকার বাধা-নিষেধ প্রদান করেনি। কিছু কিছু কাজ নারীদের দ্বারা করানোর ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দান করেছে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের কাজ করা আবশ্যক বলেছে। উদাহরণস্বরূপ নার্সিং পেশায়, ইসলামী পরিবেশে নার্সিং পেশায় নারীদেরকে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। নারী রোগীদের সেবা শুশ্রূষায় নারী ডাক্তারদের অংশগ্রহণ করা আবশ্যক। এমনকি এ ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে। সুমের ব্যাংকের চেয়ারম্যানের অফিসে আমাদের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব যিয়ারত করার জন্য গিয়েছিলেন। তার অফিসে টেক্সটাইল ফ্যাক্টরির একটি ছবি ছিল। ১৫০ বছর পূর্বের একটি পোশাক কারখানা। অনেক মুসলিম মহিলা এই পোশাক শিল্পে সুন্দর একটি পরিবেশে কাজ করছিল।

ইসলামে নারীদের কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং অর্থনৈতিক জীবনে নারীগণ একজন গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যকারী হতে পারে। ইসলামে নারীদের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদতের ব্যাপারে পুরুষদের সমান গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে, পুরুষ, নারী, সাদা, কালো বলে কোনো প্রকার পার্থক্য করেন না। মানুষের মধ্যে যে অধিক তাকওয়াবান সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালার কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে নারীর উপর পুরুষের এবং পুরুষের উপর নারীর আলাদা কোনো মর্যাদা নেই। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মতো কোনো ক্ষেত্রেই নারীদেরকে কাজ করার ব্যাপারে বাধ্য করা হয়নি। হয়তো কিছু কিছু পুরুষের কাছে এটা পছন্দনীয় নাও হতে পারে। একটি মুসলিম পরিবারে একজন নারী কোনো কাজ করার ব্যাপারেই বাধ্য নয়। ঘরের সকল দায়-দায়িত্ব এবং প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব হলো পুরুষের। ইসলামে নারীদেরকে তাদের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কাজ করার ব্যাপারে উপদেশ দেয়া হয়েছে। যদি সে এর চেয়ে বেশি কিছু করে তাহলে সে আখিরাতে এর প্রতিদান পাবে এবং এটা তার পক্ষ থেকে পুরুষের জন্য একটি অনুগ্রহ। ইসলামে নারীদেরকে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে আসীন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এই বিষয়টিকে কিছু আয়াত এবং হাদিস দিয়ে বর্ণনা করতে চেষ্টা করব। পবিত্র কুরআনে সূরা নিসা নামে একটি সূরা রয়েছে। যার অর্থ হলো 'নারী' সূরা। এই সূরার ১৯ নং আয়াতে নারীদের প্রতি সুন্দর আচরণের ব্যাপারে আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

এখানে বলা হয়েছেঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা মোটেই হালাল নয়। আর তোমরা যে মোহরানা তাকে দিয়েছ তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করারও তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে যদি তারা সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয় সেটা ভিন্ন। তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করা। যদি তারা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে হতে পারে একটা জিনিস তোমরা পছন্দ করো না কিন্তু আল্লাহ্ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলো এ রকম। তাদের সাথে এ রকম নম্র আচরণ করতে হবে। সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।

এখানে পোশাককে নিরাপত্তা এবং পর্দা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর আসল অর্থ হলো পারিপার্শ্বিক সকল প্রকার হুমকি এবং বিপদ থেকে তাদেরকে রক্ষা করা। হাদিস শরীফেও নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

'সমগ্র দুনিয়াটাই হলো সম্পদ, আর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হলো সালেহা নারী।'

অপর একটি হাদিসে বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নারীদের (স্ত্রীর) কাছে উত্তম।

অপর একটি হাদিসে বলা হয়েছে, 'তোমার উপর তোমার রবের অধিকার রয়েছে। তোমার উপর তোমার নফসের অধিকার রয়েছে। তোমার উপর তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে, প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার দিয়ে দাও।'

অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে, সকল নারী এবং পুরুষের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। পুরুষের মতো নারীদেরও দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সুন্দর আচরণ করাও তাদের অন্যতম দায়িত্ব। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে নারী-পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে জবাবদিহী করতে হবে।

www.pathagar.com

এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন– ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও প্রশ্ন করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।

একটি মুসলিম পরিবারে যদি সন্তানের উপর মায়ের তিনটি হক থাকে তাহলে পিতার হক রয়েছে একটি। একজন মুসলমানের দুনিয়ার জীবনে মা হলো একজন পবিত্র সম্মানিত অনেক বড় নিয়ামত। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মেয়েদের গুরুত্ব অপরিসীম। হযরত মুহম্মদ (সা.) তার বিখ্যাত বিদায় হজ্জের ভাষণে মেয়েদের জন্য তাদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ একটি আলাদা বক্তব্য দিয়েছেন। মুহম্মদ (সা.) মানবজাতির উদ্দেশ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন। মেয়েদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, "হে জনতা, তোমাদের নারীদেরকে তোমাদের উপর কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে। তোমাদেরও তাদের কাছে প্রাপ্য কিছু অধিকার রয়েছে। তোমাদের স্বামীদের শয়নকক্ষে, তোমরা ছাড়া আর কাউকে না আসতে দেয়া কর্তব্য। তোমরা পছন্দ করো না এমন কোনো ব্যক্তিকে তোমাদের অনুমতি ছাড়া বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া তোমাদের স্ত্রীদের পক্ষে অনুচিত। কোনো অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ করা স্ত্রীদের উচিত নয়। যদি তারা তা করে তবে তোমাদেরকে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন যে, তাদের সংশোধনের জন্য তাদের কাছ থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারো। এরপর তারা অনুগত হয়ে চললে তাদেরকে নিয়ম অনুযায়ী খোরপোশ দেয়া তোমাদের দায়িত্ব। নিশ্চয় মহিলারা তোমাদের অধীন। তারা নিজেদের কল্যাণের জন্য কিছু করতে পারে না। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আমানত হিসেবে সাথী বানিয়েছ এবং তাদের দেহকে আল্লাহ্‌রই আইন অনুযায়ী ভোগ করে থাক। কাজেই নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় তাদেরকে শিক্ষা দান করো।"

www.pathagar.com

ইসলামে এভাবে নারীদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। না প্রাচ্য না পাশ্চাত্য নারীদের ব্যাপারে ইসলামের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম।

প্রাচ্যের ব্লকের একজন নারীকে যখন চিন্তা করি, কঠিন একটি মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করছে, পরিশ্রান্ত ক্লান্ত এমন এক নারীর স্মৃতি চিহ্ন মানসপটে ভেসে ওঠে। পাশ্চাত্যের নারীর কথা যখন চিন্তা করি সমঅধিকারের নামে পুরুষের মতো পরিশ্রমী, নিজের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যহীন একটি কাজের সাথে সম্পৃক্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত এক নারীর স্মৃতিচিহ্ন মানসপটে ভেসে ওঠে। ইসলামে যখন নারীর কথা চিন্তা করি, জান্নাতকেও পায়ের নিচে রাখা অতি সম্মানিত এক সৃষ্টিকে তখন দেখতে পাই।

www.pathagar.com

দুনিয়াকে শাসনকারী শক্তিবর্গ

মিল্লি গরুশ, মওজুত কোনো চিন্তাধারা কিংবা কোনো আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া (Reaction) নয়। জ্ঞান এবং চিন্তাকে ভিত্তি করে এই সংগঠনটি আবির্ভূত হয়েছে। মিল্লি গরুশ (National Vision) আন্দোলনের আবির্ভাব এবং এর সংগ্রামকে বুঝতে হলে, আমরা বর্তমানে কেমন একটি দুনিয়ায় বসবাস করছি, বর্তমানে মজুত দুনিয়ার সিস্টেম (World Order) কিভাবে আবির্ভূত হলো এবং কিভাবে কাজ করছে এটা বুঝা জরুরি। বর্তমানের দুনিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ১৯৪৫ সালে রুজভেল্ট, চার্চিল এবং স্ট্যালিন রাশিয়ার কিসিয়ায় ইয়াল্টা নামক বন্দরে বসে একটি নতুন দুনিয়ার (A New world order) পরিকল্পনা করে। মানবতার স্লোগান দিয়ে এই কথা ঘোষণা করে যে, মানুষ শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সফলতায় পৌছাতে সক্ষম হবে। এই সময় শুরু হওয়া স্নায়ুযুদ্ধ (cold war), ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত কম্যুনিজমের পতন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের মধ্য দিয়ে অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত বলবৎ ছিল। দরিদ্র দেশগুলো আরও দরিদ্র এবং ধনী দেশগুলো আরও ধনী হয়। সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে আদালত আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ে। ক্ষুধা-দারিদ্র্য এবং বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়। কোটি কোটি মানুষ এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, কোরিয়া, ভিয়েতনামসহ অনেক দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সশস্ত্র সংগ্রাম এক ভয়াবহ দানবীয় রূপ ধারণ করে। মানবতার উপর যখন এই জুলুম-নির্যাতন চলছিল পাশ্চাত্য সবসময় এই কথাটি বলত, 'আমরা মানুষের সফলতার জন্য কাজ করছি কিন্তু আমাদের এই সফলতা আনয়নের পেছনে সবচেয়ে বড় বাধা হলো কম্যুনিজম, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং স্নায়ুযুদ্ধ।' অবশেষে ১৯৮৯ সালে কম্যুনিজমের পতন হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে চুরমার হয়েছে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত অনেক সময় পেরিয়ে গেছে।

গত কয়েক বছরে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলো বৈদেশিক ঋণ ও তার সুদ পরিশোধ করতে করতে আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। অপরদিকে উপসাগরীয় অঞ্চলের কিছু দেশ যুদ্ধের কবলে পড়ে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ধ্বংসের কিনারায়।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে শান্তি আসা তো দূরের কথা সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে যুদ্ধবিগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সারা দুনিয়াতে এটি প্রসারিত হয়েছে। ইরাক ও ইরানকে যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। উপসাগরীয় যুদ্ধ প্রসারিত করা হয়েছিল, সোমালিয়ার জনগণকে শোষণ করার লক্ষ্যে সোমালিয়ায় হামলা করা হয়েছিল।

চেচনিয়া, বসনিয়া এবং আজারবাইজানে ইতিহাসের ঘৃণ্যতম হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করা হয়েছে। অনেক মুসলিম দেশে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে অবরোধ আরোপ করা হয়েছিল।

দাবাশক্তিগুলো একে একে সারা দুনিয়াকে শোষণ করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোলামি করার জন্য সারা দুনিয়াকে বাধ্য করেছে। 'নতুন দুনিয়ার' (A New world order) নামে একক আধিপত্য কায়েম এবং সারা দুনিয়াকে শোষণ করার লক্ষ্যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। তাদের কৃতকর্ম আজ বিশ্ববাসীর সামনে জাজ্বল্যমান হয়ে ধরা পড়েছে এবং মানবতার জন্য কোনো শান্তি, শৃঙ্খলা, সফলতা আসছে না।

বর্তমান দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিষ্ঠিত, জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, IMF, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটোর মতো সংগঠনগুলো মানবতাবিধ্বংসী কাজে লিপ্ত। এই সকল প্রতিষ্ঠানের বিকল্প প্রতিষ্ঠান যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হবে যেগুলো হক এবং আদালতকে সর্বাগ্রে স্থান দেবে, ধ্বংস নয় সৃষ্টিকে উৎসাহিত করবে মানবতার জন্য কাজ করবে ততোদিন পৃথিবীতে শান্তি আসবে না। বাতিলের আধিপত্যবাদ থেকে মুক্ত করে হক ও আদালতের ভিত্তিতে একটি দুনিয়া নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত মানবতা মুক্তি পাবে না।

ইতিহাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর কারণসমূহ উপলব্ধি করার জন্য এই ঘটনাবলীর পেছনে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কেও ভালোভাবে জানা জরুরি। পৃথিবীর কর্তৃত্ব নিজের হস্তগত করার জন্য সকল মানুষকে গোলাম বানানোর জন্য, সকল মানুষকে নিজের পরিপূর্ণ আনুগত্য করানোর জন্য এবং তাদেরকে শোষণ করার জন্য যে একটি শক্তি আছে, এটা আমাদেরকে দেখতে হবে। এই শক্তির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, (method) কিভাবে কাজ করে, সারা বিশ্বকে কিভাবে তারা তাদের থাবায় আনতে চায় এবং এর জন্য শত শত বছর ধরে শক্তি অর্জন করে আজকে কিভাবে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছে এটা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি। এই শক্তিটি কিভাবে শত শত বছর ধরে

www.pathagar.com

তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তার পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করে চলেছে এর সম্পর্কে অবগত থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এগুলো দেখার জন্যও বর্তমান দুনিয়ার অ্যানাটমিকেও (Anatomy) ভালোভাবে চেনা জরুরি। আর এর অভিপ্রায় হলো–নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করার জন্য মানুষের রোগকে নির্ণয় করা এবং এর ওষুধ দেয়ার জন্য ডাক্তার হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আর ডাক্তার হওয়ার জন্য অ্যানাটমি অর্থাৎ মানুষের শরীরের গঠন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। যখন বাইরে থেকে দেখা হয় তখন দেখা যায় যে, মানুষের শরীরকে একটি চামড়া দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই চমড়া উত্তোলন করে তাকালে হাড়, পেশী, শিরা, স্নায়ুতন্ত্রসহ শরীরের ভেতরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন ধরনের কাজ দেখতে পাই। ভেতরের এই গঠন প্রণালী না জেনে, না রোগ নির্ণয় করা সম্ভব, না এর চিকিৎসা করা সম্ভব। এমনিভাবে আজকের দুনিয়ার ঘটনাবলীর একটি সঠিক বিশ্লেষণ করে এবং এটা পর্যালোচনা করে একটি সঠিক সমাধান বের করার জন্য (anatomy) সম্পর্কেও জানা একান্ত প্রয়োজন। আজকের পৃথিবীতে যে কোনো মানুষের এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় যাওয়ার জন্য বিমানের টিকিট করতে হয়। আর বিমানের এই টিকিট IATA (International Air Transport Association) নামক একটি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে। পৃথিবীর যে কোনো দেশের, যে কোনো বিমান কোম্পানিকে তার টিকিটের মূল্যের শতকরা ৯% IATA-কে দিতে হয়। এমনকি তাদের অনুমতি ছাড়া কোনো বিমান তার ইচ্ছামতো বিমানবন্দরে অবতরণ করতে পারবে না। IATA প্রকাশ্যভাবে যতই আন্তর্জাতিক একটি প্রতিষ্ঠান হোক না কেন, সাধারণ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মতোই তারা দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে এবং এই শতকরা ৯ শতাংশ কমিশন অদৃশ্য পন্থায় তাদের কাছেই যায়।

তেমনিভাবে যে কেউ দুনিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো জায়গায় টাকা পাঠাতে চাইলে তার সেই টাকার গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য সর্বাগ্রে আমেরিকাতে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক, চেস ম্যানহাটন ব্যাংক (Chase Manhattan Bank) অথবা এর মতো যে কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে পৌঁছতে হবে। আর ব্যাংকগুলো হলো সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাংক। আর পাঠানো টাকার শতকরা ১%-৫% পর্যন্ত কমিশন নিয়ে থাকে এরা। এমনিভাবে দুনিয়াকে শাসনকারী এই গোপন রাষ্ট্রে, এভাবে কোনো কমিশন দেয়া ব্যতীত

www.pathagar.com

দুনিয়ার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কোনোভাবেই টাকা পাঠানো সম্ভব নয়। না আমি তাদের এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করে নয় অন্যভাবে পাঠাতে চাই। এজন্য আমি জাহাজে যাব, কিন্তু এতেও আপনি মুক্তি পাবেন না। একটি জাহাজকে সমুদ্রে যাত্রা করার জন্য Lioyd নামক একটি প্রতিষ্ঠান থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। এই লাইসেন্স না নিলে কোনো সমুদ্রেই নামতেই পারবে না। Lioyd ও গোপন দুনিয়ায় নিয়ন্ত্রণকারীদের নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠান।

দুনিয়ার অর্থনীতিকে পথ প্রদর্শনকারী বিশ্ব ব্যাংক এবং IMF, নামক এই দু'টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের ঋণ নেওয়ার যোগ্যতা মূল্যায়ন এবং তাদের ব্যাংকিং লেনদেনের ব্যবস্থা করে থাকে। সারা দুনিয়ার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এগুলো হচ্ছে একই শক্তিবর্গের অধীনস্থ দু'টি প্রতিষ্ঠান।

এই উদাহরণগুলো বুঝাতে হলে অনেকগুলো খণ্ডে বই রচনার প্রয়োজন। অবশেষে খেলাধুলা থেকে থিয়েটার পর্যন্ত, শিল্পকলা থেকে শিল্প পর্যন্ত, আইন থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য পর্যন্ত অনেক কিছুই এই গোপন দুনিয়ার সরকারের (Secret world government) নিয়ন্ত্রণে। এজন্য দুনিয়ার ঘটনাবলীকে উপলব্ধি করার জন্য সবকিছুর আগে বর্তমান দুনিয়ার অ্যানাটমি (Anatomy) সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

আচ্ছা, বর্তমান দুনিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কি কি পরিবর্তন, পরিবর্ধনের মাধ্যমে কিভাবে আসল? এজন্য এই বিষয়টিকে শুরু থেকে পর্যালোচনা করে দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাওরাত অথবা অন্য কথায় ওল্ড টেস্টামেন্ট, সারা দুনিয়ার ইয়াহুদিদের একটি ধর্মগ্রন্থ। তাওরাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইয়াহুদিদের জীবনধারা, দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যান্য মানুষ সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা সন্নিবেশিত হয়েছে।

আমাদের হাতের কাছে থাকা তাওরাত ও আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত তাওরাত কি একই? নাকি এটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়ে আসা একটি কিতাব? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য আমরা যদি তাওরাত পড়ে দেখি তাহলে খুব সহজেই পেয়ে যাব। তাওরাতে ৩৯টি অধ্যায় রয়েছে। এর শুধুমাত্র ৫টি অধ্যায় হলো হযরত মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণাংশ। এর পঞ্চম অধ্যায়ে হযরত মূসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য

www.pathagar.com

অধ্যায়ে হযরত মূসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর ইয়াহুদিদের জীবনী, তাদের নির্দেশাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ জন্য শত শত বছর ধরে তাওরাত অনেক মানুষের দ্বারা লিখিত হয়েছে এবং ইলাহী আদেশ-নিষেধকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

৯০০ পৃষ্ঠার এই তাওরাত যদি আমরা শুরু থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কিতাবটিকে পরিবর্তন করা হয়েছে। যায়নবাদ (Zionsim) এবং বর্ণবাদকে (Racism) প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নবীদের সম্পর্কে এমন অসম্মানজনক কথা বলা হয়েছে যেগুলো তাদের মান-সম্মানকে নষ্ট করেছে। নবীদের সম্পর্কে এমন কথা বলা হয়েছে যেগুলো নবীদের চরিত্রকে হরণ করেছে। এর থেকে এটা সহজেই বুঝা যায় এটা কতোটুকু পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে।

ইয়াহুদিদের সকল ইবাদত, সিম্বলসমূহ (Symbols) ইয়াহুদি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং শুধুমাত্র ইয়াহুদি জাতিকে রক্ষার সাথে সম্পর্কিত। আর ইবাদতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নন, ইয়াহুদিগণ তারা কাদের ইবাদত করবে এটা তারাই নির্দিষ্ট করেছে। এজন্য ইয়াহুদি ধর্মমত ইয়াহুদি আইন কর্তৃক লেখা একটি আদর্শ। বর্ণবাদী চিন্তা-চেতনার একটি আদর্শ কখনো আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত আদর্শ হতে পারে না।

এজন্য আজও ইসরাইলের সকল কাজ সেই ইয়াহুদি রিব্বিদের নির্দেশ মতো হয়ে থাকে। এজন্য আজকের ইয়াহুদি ধর্মমত ইয়াহুদি রিব্বিদের রক্ষাকারী এবং বর্ণবাদী/গোত্রবাদী (Racist) আদর্শ হিসেবে মানবতার সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। ধর্মান্ধ এই ইয়াহুদি আইনজ্ঞরা, পূর্বের ধর্মগুলোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারাকে তাওরাতে সুনিপুণভাবে প্রবেশ করিয়ে এই আদর্শকে ধর্মের মর্যাদা দিয়েছে।

কাব্বালা, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার বহু পূর্বের রুহবান শ্রেণী কর্তৃক লিখিত একটি গ্রন্থ। কাব্বালা জাদুবিদ্যা এবং গোপনবিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত শক্তিশালী একটি গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত একটি গ্রন্থ। ম্যাসনরা সম্পূর্ণভাবে কাব্বালা শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে ওঠা একটি সম্প্রদায়। 'ঐতিহ্য' অথবা 'মুখ থেকে কান পর্যন্ত' এই অর্থে কাব্বালা শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিছু রহস্যের

www.pathagar.com

উপর ভিত্তি করে এই গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে। আর এই রহস্যগুলো কুদসে অবস্থিত কাবালি সম্প্রদায়ের ৩ জন মুখস্থ করে সংরক্ষণ করে রাখে। এই তিনজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হলে, ইসরাইলের মহাসভার ৭০ জন সদস্যদের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করে এবং সে ঐ একই জ্ঞান আহরণ করে সংরক্ষণ করে এবং তার দায়িত্ব পালন করে।

কারবালা ম্যাসনিকন মতবাদের মৌলিক ভিত্তি নির্মাণ করেছে। এজন্য কারবালার থিওরি এবং বাস্তবিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর তথ্য-উপাত্তগুলোকে ৩৩ ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যারা কারবালার শিক্ষায় নিজেকে তৈরি করতে চান। ম্যাসনদের উস্তাদ-এ-আযম এর পক্ষ থেকে তাদেরকে খুব সতর্কতার সাথে বাছাই করা হয় এবং শিক্ষার্থী একটি পর্যায়ের শিক্ষাকে পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করার পর অপর পর্যায়ে (cadre) উন্নীত হতে পারে। ম্যাসনিক ভাষায় এই পদ্ধতিকে বলা হয়, 'ঘুমন্ত চোখ আলোর জন্য আস্তে আস্তে উন্মোচিত করা হয়।'

ইয়াহুদি রিব্বিগণ (Rabbinates) শুধু তাওরাতকে বিকৃত করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তাওরাতের সকল হুকুম-আহকামকে তাদের নিজস্ব ভাষায় এক স্থানে একত্রিত করেছে। এগুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে বিভিন্ন টিকা এবং পাদটিকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে। তালমদু হলো তাওরাতের তাফসীর। তাওরাতের উপর করা এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত করেছে।

এই মন্তব্য এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসমূহ ইয়াহুদি আইনজ্ঞ ইয়াহুদা বা নাসী দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে তালমুদ নামে প্রকাশ করে। এই তালমুদ দুইভাবে গঠিত হয়েছে। এর প্রথমভাগ হলো মূল আর এটা করেছেন মিশনাহ। আর এর মন্তব্য অংশ লিখেছেন গেসারা। ইয়াহুদি ধর্মমতে তালমুদের গুরুত্ব অপরিসীম। স্কুলগুলোতে তাওরাতের সাথে তালমুদকেও শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে।

'তারা তাদের বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করুক কিন্তু আইন-কানুনকে বাস্তবায়ন করুক।' এই কথাটি দ্বারা এটার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইয়াহুদি রিব্বি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস কতটুকু? ইয়াহুদি রিচি দের কাছে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি বিশ্বাসের চেয়ে তাদের রীতি এবং প্রথাগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্য অধিকাংশ

www.pathagar.com

ইয়াহুদি বাস্তবতা জানার পরও তারা তাদের বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় না। ইয়াহুদি ধর্মমত আল্লাহ্ তায়ালাকে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত কোনো ধর্ম নয়। সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে এটা ইয়াহুদিদেরকেই ইলাহ বানিয়েছে। ইলাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

বর্ণবাদী ইয়াহুদিদের শিক্ষা হলো, আল্লাহ্ তায়ালাও যদি তাদের বিপক্ষে যায় তবুও তারা পেরে উঠবে। এমন শক্তি-সামর্থ্য তাদের রয়েছে। তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়া'কূবের (আ.) সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সারারাত ধরে কুস্তি হয়েছে এবং ভোর পর্যন্ত লড়াই করেও আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পরাস্ত করতে পারেনি। অত:পর ভোর হয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন: এখন আমাকে যেতে দাও। এতে ইয়া'কূব (আ:) বললেন: যতক্ষণ না তুমি আমাকে বরকত দেবে ততক্ষণ আমি তোমাকে যেতে দেব না। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার নাম কি? তিনি বললেনঃ ইয়া'কূব। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন: ভবিষ্যতে তোমার নাম ইয়াকূব হবে না বরং ইসরাঈল' হবে। কেননা তুমি খোদা ও মানুষের সাথে শক্তি পরীক্ষা করে বিজয়ী হয়েছো।" দেখুন ইয়াহুদিদের পবিত্র গ্রন্থের (The Holy Scriptures) আধুনিকতম অনুবাদ, প্রকাশক, জুয়িশ পাবলিকেশন সোসাইটি অব আমেরিকা, ১৯৫৪, আদি পুস্তক অধ্যায় ৩২, শ্লোক ২৫ থেকে ২৯। এটা হলো এর দলিল।

যে মানুষের কাছে পরাজিত হয়, নিঃসন্দেহে সে কখনো আল্লাহ্ হতে পারে না। এটা ইয়াহুদি রিব্বি নাস্তিকতা ধর্মী, নাস্তিক্যবাদী চিন্তা-চেতনাকে তাওরাতের উপর প্রতিস্থাপিত করার একটি গল্প। তাওরাতের এই সত্যতা এ কথায় সাক্ষ্য দেয় বর্ণবাদী (Racist) ইয়াহুদিগণ তারা নিজেদেরকে তাদের অন্য গোত্রগুলোর চেয়ে এবং আল্লাহ্ তায়ালার চেয়েও উচ্চ মর্যাদাশীল মনে করে। ইয়াহুদিদেরকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠাকারী ইয়াহুদি আইনজ্ঞগণ, আল্লাহ্ তায়ালাকে মানুষের কাছে অসহায় হিসেবে তুলে ধরেছে। ফলে ইয়াহুদিগণ, 'ইসরাইল' শব্দটিকে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে যুদ্ধ করে তাকেও পরাজিত করেছে এই অর্থ গ্রহণ করেছে।

ইয়াহুদি আইনজ্ঞগণ তাদের নিজেদের মনগড়া কথা দিয়ে তাদেরকে বিকৃত করার সময় নিজেদের পদমর্যাদাকে সুউচ্চে স্থান দিতে ভুল করেনি।

www.pathagar.com

তাওরাতে এমন অনেক কথা যোগ করা হয়েছে যেখানে ইয়াহুদি রিব্বিদেরকে শর্তহীনভাবে অনুকরণ, অনুসরণ এবং আনুগত্য করার কথা বলা হয়েছে। তাওরাতের অনেক স্থানে ভবিষ্যৎ জান্তা হিসেবে ইয়াহুদি আইনজ্ঞদের কথা বলা হয়েছে। তাদের পরিচয় এভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

'নবীর বংশধররা, ভবিষ্যৎজান্তারা নিকটবর্তী হবে, কেননা তোমাদের রব আল্লাহ্ তার নিজের সাহায্যের জন্য এবং তার নামকে মহিমান্বিত করার জন্য তাদেরকে নির্বাচিত করেছেন এবং দুনিয়ার সকল বনজ ও উত্থান-পতন তাদের কথামতোই হবে।'

আমাদের স্লোগান হলো, ফিলিস্তিন হবে দাউদ ও সুলাইমানের।

ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড বেন গারিয়নও ১৯৪৮ সালে প্রায় একই কথা বলেছিলেন। 'ফিলিস্তিনের বর্তমান মানচিত্র ইংল্যান্ডের শাসকবর্গ কর্তৃক আঁকা হয়েছে। ইয়াহুদি জাতির কাছে আমাদের যুবসমাজ এবং আমাদের প্রাপ্তবয়স্কদেরকে তাদের জায়গায় নিয়ে আসার জন্য অন্য একটি মানচিত্র রয়েছে। আর এই মানচিত্র হলো নীল থেকে ফোরাত পর্যন্ত।

আমরা দেখতে পেলাম যে, তুরস্কেরও একটা অংশ তাদের ঘোষিত পবিত্র ভূমির অন্তর্ভুক্ত। ইয়াহুদিগণ আজ যে বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা হলো তাদের পবিত্র ভূমি সম্পর্কে। ইসরাইল সেনাবাহিনী এ জন্যই যুদ্ধ করছে। ধর্মান্ধ ইয়াহুদি আইনজ্ঞগণ তাওরাতকে পরিবর্তন করার সময় অন্যান্য সকল জাতির বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ এবং প্রতিশোধের আগুন ইয়াহুদি ধর্মমতে প্রতিস্থাপন করেছে। এই বিদ্বেষী আদর্শ মানব ইতিহাসে অসংখ্য হত্যাযজ্ঞ এবং বর্বরতার জন্ম দিয়েছে। বিকৃত তাওরাতের দলিলগুলোই তাদের সকল অপকর্মের সাক্ষ্য বহন করে।' আমার পক্ষ থেকে মিরাজ হিসেবে তোমাকে জাতিসমূহ এবং তোমাকে রাজত্ব হিসেবে পৃথিবীর সকল কিছুই দেবো। তুমি তাদেরকে লোহার আঘাতে ভাঙবে, একটি মাটির পাত্রের মতো তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করবে।'

'এবং তোমার রব আল্লাহ্ তোমার কাছে যে জাতিসমূহকে সমর্পণ করবেন তুমি তাদেরকে নিঃশেষ করে দেবে। এতে তোমার চোখ তাদের জন্য যাতে দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয়।'

আরও বেশি উদাহরণ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। অবশেষে আমাদেরকে এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, এই তথ্য

www.pathagar.com

উপাত্তগুলো পরিষ্কারভাবে আমাদের সম্মুখে রয়েছে। এই আদর্শে বিশ্বাসীরা সারা দুনিয়ার কর্তা হতে চায়। তাদের এই আকাঙ্ক্ষা হাজার বছর ধরে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। অর্থাৎ 'দুনিয়ার কর্তা হওয়া' তাদের একটি ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ইতিহাসের গভীরতা থেকে আসা তাদের এই কাজকর্ম দুই হাজার বছরে উন্নত হয়ে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে।

এমনিভাবে দুই হাজার বছর পূর্বে, নফসের দাস হয়ে শয়তানের অনুসরণ করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রেরিত সত্য নবী মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ তাওরাত এবং পরবর্তীতে হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাব ইঞ্জিলকে নিজের মত পরিবর্তন করে সেইদিন থেকে পিতা হতে পুত্র এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত তারাই শ্রেষ্ঠ জাতি এই আদর্শকে স্থানান্তর করেছে। ইয়াহুদি আইনজ্ঞগণ, তাওরাতে বর্ণিত দুনিয়ার শাসন কর্তৃত্ব সম্পর্কিত হুকুমসমূহকে তালমুদে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে। মাসিহ সম্পর্কিত বিশ্বাসটিকেও তালমুদে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ইয়াহুদি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কেও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। ইয়াহুদিদের এই শ্রেষ্ঠত্ব আখিরাতেও প্রকাশ হবে। তালমুদের ভাষায়, জাহান্নামের আগুন বনী ইসরাইলের গুণাহগারদের এবং ইয়াহুদি আইনজ্ঞদের ছাত্রদেরকে স্পর্শ করবে না। তালমুদ এ কথা বর্ণনা করে যে, এই দুনিয়ার মালিক হলো ইয়াহুদিরা। তালমুদের বর্ণনা মতে একজন ইয়াহুদির মাল, সেই ইয়াহুদির বলে গণ্য হবে যে, এটা সর্বপ্রথম খুঁজে পাবে। এখন তাওরাতের এই অংশ আসুন আমরা সতর্কতার সাথে পড়ি।

'সেই সময় তোমাদের রব তোমাদের সামনে থেকে সকল জাতিকে বিস্তারিত করবেন এবং তোমরা তোমাদের চেয়ে অনেক বড় এবং অনেক শক্তিশালী জাতির সকল সম্পদকে হস্তগত করবে। তোমরা যেখানেই তোমাদের পা'কে স্পর্শ করাবে সেটাই তোমাদের সম্পদ বলে গণ্য হবে।

তোমাদের সীমানা মরুভূমি থেকে লেবানন পর্যন্ত এবং ফোরাত নদী থেকে তার পশ্চিম সাগর পর্যন্ত প্রসারিত হবে। তোমাদের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। তোমাদের রব আল্লাহ্ তোমাদের যেমনভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তেমনিভাবে তোমাদের সকল ভয়ভীতি পদদলিত করে সারা জাহানের কর্তৃত্ব পাবে।

www.pathagar.com

আপনারা দেখতে পেলেন যে, এই ইয়াহুদি রিব্বি তাওরাতে নিজেদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উল্লেখ করার পর, এই জাতি কোথায় বসবাস করবে এর সীমানা নির্ধারণ করতেও ভুলে যায়নি। তাওরাতের বর্ণনা মতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইয়াহুদিদের কাছে ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে কেনানের ভূমির অধিস্বত্ব দেবে। ইয়াহুদিগণ পৃথিবীর কর্তৃত্ব নেয়ার পূর্বে এই ভূমিতে শুধুমাত্র ইয়াহুদিদের বাসস্থান হিসেবে একটি দেশ প্রতিষ্ঠা করবে। আর এই রাষ্ট্রটি দুনিয়ার বাদশাহীর কেন্দ্র এবং প্রশাসনিক স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

ইয়াহুদিরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ বিশ্বাসের উপর বিশ্বাসী যে, মাসিহ্ এসে এই পবিত্র ভূমিকে উদ্ধার করবেন এবং সারা পৃথিবীতে ইয়াহুদিদের কর্তৃত্ব কায়েম করবেন। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তারা বলেছিল, 'মাসীহ্র পদাঙ্ক'। আমরা এই কথার দ্বারা তাদের পরিকল্পনা এবং বিশ্বাসকে বুঝতে পারি। এই বাতিল বিশ্বাসের সাথে ইয়াহুদিরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইয়াহুদি নেতৃবৃন্দ অনেকবার তাদের পবিত্র ভূমি সম্পর্কে বলেছেন।

তারা বলেছেন, তাদের মূল লক্ষ্য হলো এই ভূমিকে তাদের আয়ত্তাধীনে নেয়া। যায়নবাদী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে অন্যতম থিওডর হেরদেল বলেন, আমাদের উত্তর সীমানা কাপাদকিয়া (তুরস্কের একটি শহর) পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণে সুয়েজ খাল পর্যন্ত এবং এর মূল উদ্দেশ্য হলো, 'দুনিয়ার কর্তৃত্বশীল হওয়া'। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য বিগত ২ হাজার বছর বিশাল একটি পরিবর্তন সাধন করে দেখাতে পেরেছে। বিশেষভাবে বিগত ৪শ' বছর ধরে তারা আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকাকে শোষণ করে চলছে। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা এবং ক্যাপিটালিজম এর উন্নতির মাধ্যমে বিশাল অংকের টাকা' তাদের হস্তগত করেছে। একসময় এগুলো বিশাল ব্যাংকে পরিণত হয়েছে এবং সারা দুনিয়ার অর্থনীতিকে তাদের অধীনে নেওয়া শুরু করেছে।

এই মহাবিত্তশালীরা শুধুমাত্র অর্থনীতিকে নয়। এক সময় সারা দুনিয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও তাদের অধীনে নেয়া শুরু করেছে। মিডিয়া এবং দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বড় সংবাদ মাধ্যমগুলো, Strategic Research Institute গুলোকেও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে অবশেষে তারা গোপন বিশ্বরাষ্ট্র (Secret world government) প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। আর এই গোপন বিশ্ব সরকারের মাধ্যমে তারা সারা দুনিয়াকে শাসন করার সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে।

www.pathagar.com

যায়নবাদী আদর্শবাদীরা, সবুজ কাগজের ডলারকে দুনিয়ার মুদ্রা। বানিয়ে যত ইচ্ছা তত ছাপিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিত্ত-বৈভবকে আরও বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। গোপন বিশ্ব সরকার কি? এটাকে বুঝতে চাইলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে পরিচিত ডলারকে বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট।

১৯৩৩ সালে রুজভেল্ট আমেরিকান ডলারের উপর মিশরের পিরামিডের ছবিকে প্রতিস্থাপন করে। পিরামিড যায়নবাদী (Zionsist) শক্তিবর্গ পৃথিবীকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে পরিচালনা করছে, সেটার একটা উদাহরণ। উপরে যেমনভাবে আলোচনা করা হয়েছে, ইয়াহুদিরা (Zionist) নিজেদেরকে 'শ্রেষ্ঠজাতি' মনে করে এবং বিশ্বাস করে সারা দুনিয়াকে শাসন করার একমাত্র অধিকারও তাদের। আর এটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য ইয়াহুদিদের মৌলিক গ্রন্থ কারবালা, দুনিয়ার শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কারবালার শিক্ষাগুলোকে মৌলিক ভিত্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। কারবালায় ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা রয়েছে। এগুলো হলো, গোপনীয়তা, আনুগত্য এবং ইয়াহুদি আইনজ্ঞদের কর্তৃক ঘোষিত আইন-কানুনের পূর্ণ অনুসরণ।

তাদের গোপনীয়তার কারণ হলো–মানুষ যাতে মানুষকে তাদের গোলাম বানানোর পরিকল্পনা এবং মানুষকে শোষণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে না পারে। তাদের অসৎ পরিকল্পনা, তাদের অন্ধকার জগৎ এবং তাদের গোপন কার্যক্রম মানুষ যদি জেনে ফেলে তাহলে মানুষ এর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাবে। যার কারণে তাদের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয়ে যাবে। যার ফলশ্রুতিতে তারা তাদের প্রয়োজনীয় পুস্তকসমূহ, প্রয়োজনীয় বক্তব্য, তাদের মুয়াসালাতের ভাষা, তাদের নির্দেশাবলী, লক্ষ্য এবং পদ্ধতি প্রকাশ্য নয়, প্রতীক (Symbol) এবং যার অর্থ শুধুমাত্র তারাই জানে এমন চিহ্নে ব্যবহার করে থাকে। এই প্রতীক এবং চিহ্নের (Sign) অর্থকে পর্যায়ক্রমিকভাবে এমনভাবে উন্নীত করা হয়েছে যে, যারা শুধুমাত্র সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করছে তারাই এর প্রকৃত অর্থ জানে। তাদের এই প্রতীকী কাজের উপর ভিত্তি করে এর ফলশ্রুতিতে ডলারের পিরামিডের উপরে 'Annuit Coeptis' কথাটি লিখেছে। আর এর অর্থ হলো 'বিজয়ী হয়েছে'। গোপন দুনিয়া সরকার সবুজ কাগজ ডলারকে দুনিয়ার টাকা বানিয়ে এবং পিরামিডকে এর উপর বসিয়ে নিজেকে বিরাট বিজয়ী বলে ধারনা করছে। পিরামিড এর নিচে লেখা হলো 'Novus

www.pathagar.com

Ordo Sedorum' এর অর্থ হলো New world orders অর্থাৎ নতুন দুনিয়া ব্যবস্থা। অর্থাৎ ইয়াহুদিরা (Zionist) দুনিয়ার কর্তৃত্বশীল হয়ে নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছে।

New world order এই স্লোগানটি ইয়াহুদি মুরশিদ Adam Weishaupt ১ মে ১৯৭৬ সালে Illuminati Lodge স্থাপন করার সময় এই Lodge এর প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পিরামিডের নিচের অংশ ল্যাটিন হরফে লেখা ১৭৭৬ সাল, যারা জানে না তারা মনে করে থাকেন যে, এটা আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের সাল। কিন্তু না প্রথম মুরশিদরা তাদের Lodge কে ১ মে ১৭৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেছে বলে এখানেও লিখে দিয়েছে। এই পিরামিডের সর্বনিম্নে অবস্থিত প্রথম ধাপটি দুনিয়ার সকল মানুষকে বুঝিয়ে থাকে। এভাবে এই পিরামিড এই কথা বুঝিয়ে থাকে যে, ইয়াহুদিরা (Zionist) কিভাবে গোটা দুনিয়ার ৭০০ কোটি মানুষকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। এটা হলো সারা দুনিয়ার মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার এই পদ্ধতি, সবার উপরে অবস্থিত কর্তাদের আদেশকে বাস্তবায়ন করবে। তাদের পরিকল্পনা এবং প্রোগ্রামকে বাস্তবায়ন করার জন্য এমন একটি পিরামিডীয় পদ্ধতি তারা তাদের ভিত্তি হিসেবে বেছে নিয়েছে।

সবার নিচে মানবমণ্ডলীকেসহ পিরামিডের ১৩টি ধাপ রয়েছে। ১৩ সংখ্যাটি হলো ইয়াহুদিদের কাছে খ্রিস্টিয়ানদের বিপরীতে একটি সংখ্যা।

এই বিশ্বসংগঠনটি, বিশ্বাসের দিক থেকে ইয়াহুদিদের (Zionism) এ অনুকূলে। ইয়াহুদিদের মৌলিক ভিত্তি হলো, পূর্বেও যেমনভাবে বর্ণনা করেছি, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত তাওরাত, কারবালার উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো, আরও একবার পুনরাবৃত্তি করে বলছি, গোপনীয়তা এবং আনুগত্য। এজন্য প্রত্যেকেই তার উপর অর্পিত দায়িত্বকে পরিপূর্ণভাবে পালন করে। তাদের প্রতিষ্ঠিত এই 'হুজরা পদ্ধতি' (Cell System)র মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি শুধুমাত্র তার উপরের একজনের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে। এই পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে যারা জানে তা হলো সবার উপরের কারবালিষ্ঠ আইনজ্ঞগণ।

পিরামিডের সবার উপর ত্রিকোণের ভিতরের চোখ হলো, ম্যাসন ইলাহর চোখ। এই প্রতীক (Symbol) তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে।

www.pathagar.com

এই চোখ 'আমাদের প্রভুর সকল কিছুই দেখেন' এ কথার সাক্ষ্য বহন করে। এর মূলে হলো 'আমাদের প্রভু সবকিছু দেখেন, এমনকি সবকিছু খুব ভালোভাবে। এই ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করা। বক্র দেখে এবং কটাক্ষভাবে করে। ম্যাসনরা একে-অপরকে চেনার জন্য এই পাসওয়ার্ডকে ব্যবহার করে থাকে। একজন অপরজনের সাথে দেখা হলে মুসাফাহা করার সময় ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি অপরজনের হাতে বিশেষ একটি পদ্ধতিতে রেখে থাকেএবং চোখকে বক্র করে সরাসরি নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে। ইয়াহুদিদের (Zionism) বিশ্বাস শয়তানকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করার পর পৃথিবীতে 'বনী ইসরাইল' এর বংশধরদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবে। ইয়াহুদিদের মূলে 'শয়তানের উপাসনা করা' বিশ্রাম নেয়ার শামিল। সবার উপরে অবস্থানকারী, কারবালার সাথে সম্পৃক্ত সকল কিছু জানেন এমন ইয়াহুদি রিব্বি (Rabbi) সাথে অপর স্তর বা ধাপগুলোর সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত দু'জন সহকারীকে নিয়ে তাদের পরিষদ গঠিত। এই সর্বোচ্চ পরিষদের নিচেই হলো সর্বোচ্চ কার্যকরী মজলিস (মহাসভা)। এগুলোর সকল কিছুই সর্বোচ্চ গোপনীয়তার সাথে করা হয়। তিন কারবালিস্ট এবং মহাসভা, ইসরাইল রাষ্ট্রসহ ইয়াহুদিদের (Zionist) সকল সংগঠনের প্রধানগণদের নিয়ে রিব্বি পরিষদ গঠিত (Rabbiate Society)।

আপনাদেরকে দেয়া এই বিশদ বর্ণনা আপনাদের কাছে জটিল এবং বিভ্রান্তির মনে হতে পারে। কিন্তু 'গোপন বিশ্বরাষ্ট্র (Secret world state) এর কার্যবিধি এবং দুনিয়াকে শাসনকারী শক্তিকে উপলব্ধি করার জন্য তাদের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জানা জরুরি। যারা আমাদের বিরুদ্ধে এবং আমাদেরকে নিঃশেষ করার জন্য কাজ করছে এই কুচক্রীদেরকে আমাদের ভালোভাবে চিনতে হবে। এগুলোকে উপলব্ধি করা ব্যতীত যায়নবাদের আসল চেহারা এবং তাদের পদ্ধতি সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারব না।

যারা কারবালার শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে ইয়াহুদি রিব্বিগণ (Rabbinates) মহাসভার সদস্য নির্বাচিত করেন। এই গোপন সভাসদের সদস্য সংখ্যা হলো ৭০ ইয়াহুদি আইনজ্ঞ। 'General oversight council' এই নামে তারা ইসরাইলে জমায়েত হয়ে থাকেন। এই রুহানী মজলিসের যদি কেউ কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকে

www.pathagar.com

তাহলে তাদের স্থলে নতুন সদস্য নির্বাচিত করা হয়। এই নির্বাচন চার সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিটি পরিচালনা করে থাকে।

মহাসভায় কারবালিস্ট ইয়াহুদি রিব্বিদের অধীনে ৭০ জন শপথের সদস্য রয়েছে। যারা সারা দুনিয়ায় ইয়াহুদিদেরকে Secret world governemet পরিচালিত করে থাকে এবং ইয়াহুদিদের সকল প্রতিষ্ঠান তারাই পরিচালনা করে। ইয়াহুদিবাদ এবং গোপন বিশ্ব সরকারের সকল সদস্যকে এই মহাসভার/মজলিসের পূর্ণ আনুগত্য করতে হয়। আমেরিকার রকফেল পরিবার, ইংল্যান্ডের রটস চাইল্ড (Rotschild) পরিবার, ইতালির এগনেল্লি (Agnlli) পরিবারের মতো সকল পরিবার এই ৭০ জনের মহাসভার সদস্য। এই গ্রুপের/মহাসভার ইউরোপ এবং জাপানে অঙ্গ সংগঠন রয়েছে। এই শপথভুক্ত গ্রুপটির অঙ্গ-সংগঠন সারা পৃথিবীতেই রয়েছে।

এই গোপন বিশ্ব সরকার এই শপথভুক্ত ৭০ সদস্যদের গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত সারা দুনিয়াতে হাজারো প্রতিষ্ঠান করেছে।

এই সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো সারা দুনিয়াতে ইয়াহুদিদের

দ্বারা পরিচালিত সংগঠনসমূহের সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা। এই সংগঠনটিই আজকের জাতিসংঘ নামক সংগঠনের মূল উদ্যোক্তা। এই জাতিসংঘের নাম করে তাদের হাতের পুতুল ভেটো শক্তির দেশগুলোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যা ইচ্ছা তাই করে যাচ্ছে। মূলত জাতিসংঘ এই গোপন এবং গভীর শক্তির পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'Bnai Brith' এই সংগঠনটিও ম্যানন এবং বিল্ডারবার্গ (Bilderberg) এর মতো বিশালকায় ইয়াহুদি সংগঠনগুলোর একটি।

'Bnai Brith' সংগঠনটি ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মুল লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী ইয়াহুদিদের নিরাপত্তা এবং তাদের অগ্রযাত্রাকে রক্ষা করা। 'Bnai Brith' সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত অপর একটি সংগঠন হলো 'Aleph Zadik Aleph'। এই নামের সংগঠনের মাধ্যমে তারা ১৩-২১ বছর বয়সী যুবকদেরকে যায়নবাদী/ইয়াহুদিবাদী চিন্তাধারায় লালন-পালন করে থাকে। বিল্ডারবার্গ গ্রুপ ১৯৫৪ সালে হল্যান্ডের অস্টেরবিক (Osterbeek) শহরের বিল্ডারবার্গ (Bilderberg) হোটেলে ইয়াহুদি সদস্যরা মিলিত হয়ে এই গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে। বইটি ১৯৭৫ সালে প্যারিসে Bernerd Grassed প্রকাশনীর

www.pathagar.com

মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সকল বই ক্রয় করা হয় এবং যাতে পাঠকের হাতে না পৌঁছে তার সকল ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিল্ডারবার্গ (Bilderberg) গোপন বিশ্ব রাষ্ট্র (Secret world state) প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনেক বিপ্লবের আয়োজন করেছে। অনেক রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠা করা এবং ধ্বংস করার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহর থেকে প্রকাশিত New nation নামক ম্যাগাজিনের ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় বিল্ডারবার্গ গ্রুপ সম্পর্কে এই তথ্যগুলো দিয়েছিল যে, 'বিল্ডারবার্গ গ্রুপ বিশ্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য Bani Brith তরিকাত এবং অন্যান্য গোপনীয় ইয়াহুদি সংগঠনগুলোর সাথে আঁটঘাট বেঁধে কাজ করে থাকে।'

দুনিয়াতে সংগঠিত বড় বড় সকল ঘটনার সাথে বিল্ডারবার্গের সম্পৃক্ততা রয়েছে। উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে ইয়াহুদিদের স্বার্থে বা তাদের অনুকূলে কাজে লাগান। অনেক ধনী দেশ, ম্যাসন নেতাদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে এবং মুখে বলে থাকে যে, আমাদের সংগ্রাম শোষণের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু পরবর্তীতে স্বাধীন হওয়ার পর এই সকল নেতারা যখন রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তি হন তখন তাদের মাধ্যমে আরও বেশি শোষণ এবং নির্যাতন চালানো হয়ে থাকে।

যায়নবাদীদের (Zionist) সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো ইয়াহুদিদের নেতৃত্বে একটি বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা। আর এর প্রথম ধাপ হিসেবে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে রোম চুক্তি (Treaty of Rome) আর এই চুক্তির ব্যাপারে সর্বপ্রথম বিল্ডারবার্গের গ্রামে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিল্ডারবার্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো Trilateral Commission' প্রতিষ্ঠা করা। এই কমিশন 'বিল্ডারবার্গ' গ্রুপের নামে অনেকেই জানে। আমেরিকার ধনকুবের বিখ্যাত ইয়াহুদি রকফেলার (Rockflller), দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া প্যাসিফিকের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক গ্রুপ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিল্ডারবার্গের একটি প্রোগ্রামে প্রস্তাবনা পাস করা হয়। এই গ্রুপ সবচেয়ে বিখ্যাত এবং শক্তিশালী ব্যক্তিদেরকে নির্বাচিত করে থাকে।

www.pathagar.com

এই গ্রুপকে নকশা এঁকে আসল রূপ দেন সুইডেনের ইয়াহুদিদের উস্তাদ-ই-আযম খ্যাত ইয়াহুদি আলেম জোসেফ রেটিংগার (Jozef Retinger) আর এই গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ অর্থায়ন করে আমেরিকার রকফেলার ফাউন্ডেশন। অপর অংশ প্রদান করে বিখ্যাত ইয়াহুদি ব্যাংকার রসট চাইল্ড (Rostchild) পরিবার। বিল্ডারবার্গ (Bilderberg) বহুজাতিক সরকারের মতো একটি গ্রুপ।

আর এটার গোপন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হলো ইসরাইল। অন্যান্য অঙ্গসংগঠনগুলোকে যেমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিল্ডারবার্গ (Bilderberg) এর পরিচালক Hakham এবং ৩৩ ডিগ্রি ম্যাসনদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। এই গ্রুপের ২৫ জন পরিচালকের সবাই হলো ইয়াহুদি। দুনিয়াকে শাসন করার জন্য যেসব নির্দেশনা প্রয়োজন সেগুলো তারা রিব্বিদের কাছ থেকে নিয়ে থাকে। তাদের এই নির্দেশনা, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে খুব ভালো ক্যারিয়ার সম্পন্ন লোকদেরকে টার্গেট করে।

এদের উপর একটু সহজ করে এই নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন করা হয়। বিল্ডারবার্গ গ্রুপের (Bilderberg) অনেক জায়গায় বা উৎসগুলোতে দেখা যায় যে, দুনিয়ার একটি মর্যাদাশীল গ্রুপ হিসেবে পরিচিত। সবার কাছেই এই সংগঠনটি খুবই মর্যাদাবান। বিল্ডারবার্গ গ্রুপের অতীত কর্মকাণ্ডের খুব বেশি রেকর্ড আমরা খুঁজে পাই না। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠার স্থান, তারিখ এবং মিটিংয়ে উপস্থিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম ছাড়া অন্য কোনো তথ্য পাওয়া অসম্ভব। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিল্ডারবার্গের সকল প্রোগ্রাম মিডিয়া থেকে সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে। এখানে কে কথা বলেছে, কি কথা বলেছে এ সম্পর্কেও কোনোকিছুই জানানো হয় না। তাদের প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু, বক্তাগণ এবং কি সিদ্ধান্ত হয়েছে এগুলো গোপনীয় রাখার ব্যাপারে তারা শপথ করে থাকে। এতে তারা যত ক্ষতির মুখোমুখি হোক না কেন। তুরস্কের একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা এই সম্পর্কে বলেছিলেন, 'যদি তারা আমাকে ইস্তফা দিতেও বাধ্য করে তবুও আমি এখানকার কথাগুলো কাউকে বলতে পারব না।' তার এই কথার দ্বারাই বুঝা যায় তারা কতটুকু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

www.pathagar.com

অঙ্গ-সংগঠন, রাজনীতি, মিডিয়া, গোপন সংগঠনসমূহ এবং ব্যবসায়িক জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে এক জায়গায় ডাকা হয়ে থাকে। প্রতিবছর তারা তিনদিনের একটি প্রোগ্রাম করে থাকে। প্রোগ্রামের পর তাদের সকল পরিকল্পনা এবং কথাবার্তা গোপন রাখার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়ে থাকে। প্রোগ্রামের পর আলাদা আলাদাভাবে দেখা করা এক একজনকে বিশেষ রিপোর্ট প্রদান করে থাকে। এই সংগঠনের ব্যাপারে সবচেয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে স্পেনের গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান লুইস গনজালেস ম্যাটা (Luis Gonzales Mata) এর বইয়ে। তার The Real matters of the world নামক পুস্তক অনুযায়ী বিল্ডারবার্গের প্রতিবছর আয়োজিত এই প্রোগ্রামে এবং এই প্রোগ্রামে নেয়া সিদ্ধান্তগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য NATO-র ঊর্ধ্বপদস্থ কর্মকর্তাদের কেউ একজন উপস্থিত থাকে। কারণ NATO আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের সশস্ত্র বাহিনী।

ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হলো মানুষকে দেখানো একটি মন্ত্রণালয়। আমেরিকার আসল পররাষ্ট্রমন্ত্রী হলো গোপন বিশ্ব সরকারের (Secret World government) এর পরিচালকদের নিয়ন্ত্রণে (CFR)। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নামক এই কমিশনটি আমেরিকার বিগত ৫০ বছরের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি শিক্ষালয় এবং প্রস্থানের স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই কমিশন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী এবং শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে সমবেত করে থাকে। বিভিন্ন সেমিনার এবং সাপ্তাহিক বিভিন্ন মিটিংয়ের ইয়াহুদি নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সকল খরচ Wall Street-এর ব্যাংকসমূহ দিয়ে থাকে। এখান থেকে নেয়া বিভিন্ন পরামর্শ এবং পরিকল্পনা খুব অল্প সময়ে পররাষ্ট্রনীতিতে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এই কমিশনের ৩৭ জন স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে ১০ জন হলো ইয়াহুদি এবং বাকিরা হলেন সর্বোচ্চ ডিগ্রির ম্যাসনরা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও লাখ লাখ মানুষ হত্যাকারীর রাস্তা প্রশস্তকারী আণবিক বোমা বানানোর এই পরিকল্পনাও আমেরিকার ইয়াহুদি রিব্বিদের পক্ষ থেকে নেয়া হয়েছিল। এই লাখ লাখ মানুষ হত্যাকারী বোমা ব্যবহৃত হবে কিনা এই সিদ্ধান্তও এই কমিশনই দিয়েছিল। ১৯৪৫ সালে আণবিক বোমার বিস্ফোরণের ব্যাপারে CFR কমিটির সদস্যগণ চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে।

www.pathagar.com

আমেরিকার বড় বড় মিডিয়া কর্পোরেশনগুলোও এই কমিশনের আওতাধীন। এজন্য আমেরিকায় ইসরাইলের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো সংবাদ সম্প্রচার বা প্রকাশ করা অসম্ভব। আমেরিকার সংবাদ সংস্থা সম্পূর্ণভাবে CIA এবং ইয়াহুদিদের (Zionist) নিয়ন্ত্রণে। ইসরাইল এবং মোসাদ (Mossad) এর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে CIA'র। আর এই CIA, দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে ইয়াহুদিদের (Zinist) স্বার্থ উদ্ধারে সহায়তা করে থাকে। CIA-এর প্রধানগণ একই সাথে CFR এর সদস্য হয়ে থাকে।

দুনিয়ার বড় বড় কোম্পানিগুলো যেগুলো আমরা স্বাধীন কোম্পানি বলে জানি, তারাও এই সংগঠনের আওতাধীন। দুনিয়ার অর্থনীতির খুব অল্প অংশই অন্যান্য আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

১৯৭০ সালে ইয়াহুদি (Zionist) ম্যাসনদের (Mason) মালিকানাধীন কোম্পানির মালিকগণ Business Round Table নামক একটি সংগঠনের ব্যানারে এক জায়গায় সমবেত হয়। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে দুনিয়ার অর্থনীতিতে একচ্ছত্রভাবে আমেরিকার আধিপত্য কায়েম করা যায়। এই বৈঠকের পর অল্প সময়ের মধ্যে এটি আমেরিকার রাজনৈতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণকারী একটি সংগঠনে পরিণত হয়। এই সংগঠনে তারা আমেরিকার ২০০ বড় বড় কোম্পানিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আমেরিকার সমগ্র ব্যবসায়িক সেক্টরকে নিয়ন্ত্রণকারী এই ম্যাসনিক সংগঠনটি, আমেরিকার রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আমেরিকার নির্বাচনগুলো কোনো প্রার্থী ইয়াহুদি লবিদের ভোট না পাওয়া পর্যন্ত, নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। এই সম্পর্কে অবগত প্রার্থীগণ নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময়গুলোতে ইয়াহুদিদের (Zionist) স্বার্থ উদ্ধারকারীর কাজসমূহ সম্পর্কে ওয়াদা দিয়ে থাকে। হোয়াইট হাউসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত এই ব্যক্তি তাকে নির্বাচিতকারী গ্রুপকে দেয়া সকল ওয়াদা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকে।

Round table এর সদস্যভুক্ত ব্যবসায়ীদের খুব অল্প সময়ে ধনী হওয়ার অন্যতম কারণ হলো দেশের অন্যতম বড় কোম্পানি হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে কম ভ্যাট (Vat) পরিশোধ করে থাকে। একই সাথে দুনিয়ার ইয়াহুদিদের বড় বড় পেট্রোল কোম্পানিগুলোও এই সংগঠনের সদস্য। আমেরিকার কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

ব্যাংকের হিসাবগুলোই আমেরিকার অভ্যন্তরে ইয়াহুদিদের প্রবঞ্চনা বুঝার জন্য যথেষ্ট। একই দস্যুপনা তারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বছরের পর বছর ধরে করে যাচ্ছে।

ব্যক্তিগত (Private) সেক্টরের ঋণ ব্যতীত ১৯৮০ সালে আমেরিকার সর্বমোট ঋণ ছিল ৯৮০ বিলিয়ন ডলার। শুধুমাত্র ৮ বছর পর ১৯৮৮ সালে এই ঋণ দাঁড়ায় ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে। তারা এই ৫ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ কোথা থেকে কার কাছ থেকে নিয়েছে? গোপন বিশ্ব সরকার (Secret world government) এর পরিচালকদের কাছ থেকে এই অর্থ রকফেলার Rockfeller) পরিবার থেকে এই ঋণ হিসেবে নিয়েছে। তাদের এই ঋণবাবদ ১৯৮৯ সালে সুদ পরিশোধ করতে হয়েছে ৫০০ বিলিয়ন ডলার। এই সুদের টাকা গোপন বিশ্ব সরকার (Secret world government) এর ক্যাশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। শুধুমাত্র আমেরিকা নয়, পৃথিবীর সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই এই শক্তির নিয়ন্ত্রণে। শোষণের এই নির্মম পদ্ধতি তারা সুদের মাধ্যমে আমাদের দেশেও প্রয়োগ করে থাকে। ১৯৯৫ সালে তুরস্কের বৈদেশিক ঋণ ছিল ৭৫ বিলিয়ন ডলার আর আজ সেটা ৪৮০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এটা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে শুধু বেড়েই চলছে।

বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী এই শক্তিবর্গ আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইউরোপের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকেও তাদের হস্তগত করেছে। ইংল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং জার্মানির কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমরা যেভাবে মনে করে থাকি যে, এগুলো সরকারের মালিকানাধীন সম্পত্তি, কিন্তু না। বরং রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তিগত মালিকানায় একচেটিয়া আধিপত্য দেয়া হয়েছে। এই পদ্ধতির কর্মকর্তাদের একজন ইংল্যান্ডের Middle Bank এর প্রধান Reginald Mckenna একবার বলেছিলেন, 'অর্থ এবং ঋণ বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ থাকা উচিত, যাতে করে এটা সাধারণ জনগণের হাতে পৌঁছে।'

IMF-এর সারা বিশ্ব থেকে নেয়া সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণসমূহ মূলত গোপন বিশ্ব সরকার (Secret world government) এর ব্যাংক এবং তাদের ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণ এবং সেগুলো বাবদ পরিশোধ করা সুদের অর্থ। এই পদ্ধতির কারণে পৃথিবীর সকল দেশ প্রতিবছর গোপন বিশ্ব রাষ্ট্র (Secret

www.pathagar.com

world state)-কে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সুদ পরিশোধ করে থাকে। আমেরিকা (USA) যেমনিভাবে প্রতি বছর ৫০০ মিলিয়ন সুদ পরিশোধ করে থাকে, তেমনিভাবে আমরা যদি পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর বৈদেশিক ঋণের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই প্রতিবছর তাদের কমপক্ষে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি সুদ এই শক্তিটিকে দিতে হচ্ছে।

এই পদ্ধতি হলো মানবজাতিকে শোষণ করার পদ্ধতি (Order)। এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ দুনিয়ার দেশগুলোকে শুধুমাত্র ঋণ দিয়েই শোষণ করে না। মানুষকে গোলাম বানানোর অন্যান্য সকল পদ্ধতিও এরা আবিষ্কার করে একে পর্যায়ক্রমে উন্নীত করেছে। এর প্রথমেই যেটা আমাদের উল্লেখ করতে হয় সেটা হলো 'সবুজ কাগজের ডলার'। আমেরিকান এই ডলার শোষণের এক হাতিয়ার মাত্র। ১৯৮৮ সালের পর থেকে ডলারের সাথে স্বর্ণের আর কোনো সম্পর্ক নেই। ফেডারেল রিজার্ভ ইচ্ছামতো 'সবুজ কাগজ' অর্থাৎ ডলার ছাপাতে পারে।

আজকে পৃথিবীতে আমেরিকার (USA) বাইরে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলারের মতো সবুজ কাগজ রয়েছে। এই কাগজগুলো দিয়ে বিনিময়ে তারা মাল নিয়েছে। মানুষের মাথা থেকে নির্গত ঘাম ঝরানো সম্পদ তারা নিয়েছে। পেট্রোল নিয়েছে। অর্থাৎ ৬০০ কোটি মানুষ এভাবে শোষিত হচ্ছে। শুধুমাত্র এই ডলার অর্থাৎ সবুজ রঙের কাগজের মাধ্যমে আজ গোটা মানবতা শোষিত হচ্ছে।

আবার সেই একই (Secret world government) গোপন বিশ্ব সরকার আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা এবং ব্যাংকের মাধ্যমে দুনিয়ার সকল জায়গায় হলুদ কাগজের বন্ড বিক্রি করে থাকে। এই হলুদ কাগজের বন্ডের মাধ্যমে সবুজ কাগজের ডলারকে সংগ্রহ করে। অর্থাৎ সবুজ কাগজের বদলে হলুদ কাগজ প্রদান করে। দুনিয়ার বাজারে ১ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের বন্ডের প্রচলন রয়েছে। ডলার আন্তর্জাতিক মুদ্রা হওয়ায় সকল দেশ এবং ব্যাংকগুলো ডলারকে তাদের রিজার্ভে রেখে থাকে। উদাহরণস্বরূপ তুরস্কের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই কথা বলে থাকে যে, আমাদের ৮০-৯০ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ রয়েছে। বাস্তবিক অর্থে ব্যাংকের কাছে এই ডলারের কোনো অস্তিত্ব নেই।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে এই টাকাগুলো/মুদ্রাগুলো গোপন বিশ্ব সরকারের আন্তর্জাতিক ব্যাংকের ক্যাশে সংরক্ষিত। এই অর্থের বিনিময়ে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'আমাদের হিসাবে আপনার এতো ডলার মজুত রয়েছে' এই বাক্যটা বহনকারী একটা সাদা কাগজের মালিক এবং নিজেদের হাতে রাখা সেই সবুজ কাগজের ডলার, বিশ্ববাজারে পুনরায় ছেড়ে দিয়ে মাল এবং পণ্যকে কিনে নেয়। এভাবে গোপন বিশ্ব সরকার (Secret world government) সারা দুনিয়াকে সবুজ কাগজ (ডলার), হলুদ কাগজ (Bond) এবং সাদা কাগজ (রিজার্ভ) এর মাধ্যমে নিষ্ঠুর এবং নির্মমভাবে শোষণ করে যাচ্ছে। মূলত দুনিয়ার এই গোপন কর্তাগণ (Bosses), আমেরিকা (USA) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওসিলায় ইচ্ছামতো ডলার ছাপিয়ে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় দিতে পারবে। এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের রয়েছে।

আর এজন্যই কাব্বালা সাথে সম্পৃক্ত এই ইয়াহুদিগণ (Zionist), শোষণ এবং অর্থনৈতিক আধিপত্যের প্রতীক ডলারের '$' এই চিহ্নটি এই উদ্দেশ্যেই দিয়েছে। এই সিম্বলের উপর (II) এই দু'টি লাইন ইয়াহুদি (Zionist) সিম্বলের মতো 'দুনিয়ার আধিপত্য' বুঝায়। (S) হরফটিও ইয়াহুদি বিশ্বাসের মতে, 'সাপ তার লেজ কামড়াচ্ছে' এই অর্থ বুঝায়। ইয়াহুদিদের মতে সাপ যখন তার লেজ কামড়াবে তখন তারা বিজয়ী হতে পারবে।

শোষক শ্রেণী শোষণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিভিন্ন সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা ব্যবহার করে থাকে। যার মাধ্যমে তারা অর্থনীতিকে অস্থিরতায় পৌঁছে দেয়। এই শক্তিটি আন্তর্জাতিক অথবা স্থানীয়ভাবে অর্থনৈতিক মন্দাকে সৃষ্টি করার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে হাড্ডিসার করে দিচ্ছে। গোপন দুনিয়ার শাসকবৃন্দ যখন ইচ্ছা তখন শেয়ারবাজারে ধস নামিয়ে কম দামে শেয়ার কিনে, যাতে ইচ্ছামতো সময়ে দাম বাড়িয়ে বেশি দামে বিক্রি করতে পারে। এভাবে শেয়ারবাজারে ধস নামিয়ে গোপন বিশ্ব সরকার অর্থনীতিকে তার করায়ত্ত করে মানুষকে পথের ভিখারি করে থাকে। দুনিয়ার শেয়ারবাজারে বিভিন্ন সময় এমন ধস নামিয়ে প্রতি বছর তারা প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলারের মতো লুণ্ঠন করে থাকে। আন্তর্জাতিক শিল্প সমিতি, পেট্রোল এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলোও বিশ্বব্যাপী এই শোষকদের আওতাধীন। দুনিয়ার সকল অস্ত্র-শিল্প এবং অস্ত্র বাজারও এদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীন। আচ্ছা, ইয়াহুদিরা (Zionist) অস্ত্র কারখানাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে

www.pathagar.com

কেন এত মরিয়া হয়ে থাকে? কেননা কাব্বালায়ে বিশ্বাসী ইয়াহুদিদের অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো-দুনিয়ার অন্যান্য জাতির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা। এজন্য তারা যুদ্ধের সকল কারণকে সৃষ্টি করে এক দেশকে অন্য দেশের উপর আক্রমণ করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে থাকে। এভাবে তারা তাদের পরিকল্পনাকেও এগিয়ে নিতে পারে এবং তাদের ক্যাশও টাকায় পরিপূর্ণ হয়।

'গোপন বিশ্ব সরকার' এর পরিচালকরা এই সকল পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিবছর কি পরিমাণ শোষণ করে থাকে এটা হিসাব করা সম্ভব নয়। তাদের শোষণের এই চিত্র আমাদের চোখের সামনে যেটা বিদ্যমান সেটার হিসাব মাত্র। আমাদের চোখের আড়ালে তাদের শোষণের পরিমাণ আরও অনেকগুণ বেশি।

তাদের এই শোষণের শিকার হয়ে সারা পৃথিবীর সকল মানুষকে তার বাৎসরিক আয়ের সমপরিমাণ কিংবা তার চেয়েও বেশি এই আন্তর্জাতিক শোষক চক্রকে নিজের অজান্তেই পরিশোধ করতে হচ্ছে। রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি উভয়কেই যখন এই গোপন বিশ্ব সরকারকে পরিশোধ করতে হচ্ছে, তখন আবার এই উভয়কেই তাদের জীবন পরিচালনার জন্য তাদের কাছ থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে। তাদের নেয়া এই প্রতিটি ঋণের বিনিময়েই তাদেরকে উচ্চ হারে সুদ দিতে হচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা দিন দিন এক কঠিন পেরেশানিতে উপনীত হচ্ছে। এই সত্যের বিপরীতে রকফেলারদের সম্পদ ১০০ বিলিয়ন ডলার থেকে ১ ট্রিলিয়ন ডলার হোক না কেন তাদের কি আসে যায়? তারা সমগ্র মানবতাকে শোষণ করার মতো একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে সারা দুনিয়ার অর্থনীতি এবং রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

ইসলাম, পৃথিবীর সকল মানুষের অধিকারকে সমান দৃষ্টিতে দেখে থাকে। হককে সর্বদায় সবকিছুর উপরে স্থান দেয়। শোষণকে অস্বীকার করে এবং কেউ কারো অনুগত বান্দা এবং দাসত্বকে কখনোই গ্রহণ করে না। এ জন্যই ইয়াহুদিরা (Zionist) সমগ্র ইতিহাস জুড়ে হককে সুউচ্চে স্থানদানকারী

ইসলামকে তাদের টার্গেট হিসেবে নিয়েছে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, কুফর এক জাতি। আমরা দুনিয়ার মানচিত্রে যতই ভিন্ন ভিন্ন দেশ, জাতি ও বর্ণ, গোত্র দেখে থাকি না কেন এর অর্থ হলো, কুফর একটি কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয়ে থাকে। আর এই কেন্দ্রবিন্দুটি হলো বিশ্ব ইয়াহুদিবাদ (World Zionist)।

www.pathagar.com

আপনারা যদি চান তাওরাতে দেখেন, অথবা কাব্বালায়ে দেখেন ইয়াহুদি বিশ্বাসের (Zionist) ভিত্তিমূলে এই বিষয়গুলো আপনারা দেখতে পাবেন। এর মধ্যে একনম্বর হলো বনী ইসরাইলগণ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। দ্বিতীয়ত বনী ইসরাইলগণ হলেন দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। অন্যরা সবাই তাদের দাস হয়ে থাকবে। অন্যান্য জাতির মানুষদেরকে বানর হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে পরে তারা মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। কারণ অন্য মানুষদেরকে বনী ইসরাইলের সেবক হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো সারা দুনিয়ায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সকলের উপর বিজয়ী হওয়া। আর এই উদ্দেশ্য পূরণের প্রথম ধাপ হিসেবে তারা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় নির্বাসিত ইয়াহুদিদের ফিলিস্তিনে সমবেত করবে। দ্বিতীয় ধাপ হলো ফোরাত এবং নীলনদের মধ্যবর্তী প্রতিশ্রুত (Promised land) ভূমিতে বৃহত ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করবে। ইসরাইল নামক রাষ্ট্রটির শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ২৮টি দেশের শাসককে তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখবে এবং তাদেরকে ভাগ করে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। ইসরাইল নামক রাষ্ট্রটির নিরাপত্তার জন্য আনাতোলিয়াতে ১৯টি ক্রুসেড পরাজিতকারী সেলচুক খিলাফত ও উসমানী খিলাফাতের উত্তরাধিকারী কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র থাকবে না। বায়তুল মুকাদ্দাসের স্থলে সুলাইমানের মন্দির (Tample of Suleyman) নতুন করে প্রতিষ্ঠা করবে এবং এগুলো বাস্তবায়ন করার পর মাসীহ পৃথিবীতে আগমন করবে এবং সে দাউদ (আ.)-এর আসনে একজন ইয়াহুদি রাজা হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করবে। এই রাজা দুনিয়ায় তার কর্তৃত্বকে পর্যালোচনা করবে এবং এই দুনিয়ার শাসনভার বনী ইসরাইলের বংশধরদের হাতে আজীবনের জন্য সমর্পণ করবে। ইয়াহুদিদের (Zionist) ধর্ম বিশ্বাস হলো এটা। এটাই হলো তাদের দ্বীন। তারা তাদের ধর্মকে কখনোই পরিবর্তন করবে না।

এভাবে তাদের এই সকল পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, থিওডর হেরজেল (Theodor Herzl) ইসরাইল প্রতিষ্ঠার করার জন্য সুলতান আব্দুল হামিদ খানের কাছে ফিলিস্তিনের ভূমিকে তাদেরকে দিতে বলেন। বিনিময়ে তারা ইউরোপের কাছে উসমানি খিলাফতের ঋণকে মওকুফ করে দেবেন। কিন্তু সুলতান আব্দলু হামিদ খান এটাকে অস্বীকার করে বলেন, 'শহীদের রক্তের বিনিময়ে কেনাভূমি, কক্ষনো টাকার বিনিময়ে বিক্রি

www.pathagar.com

করা যায় না।' এই কথা শুনার পর ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরে প্রথম ইয়াহুদি কংগ্রেস (Zionist congres) আহ্বান করে এবং সেখানে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১. সুলতান আব্দুল হামিদ খানকে মসনদচ্যুত করতে হবে।

২. উসমানী খিলাফাতকে বিলুপ্ত করতে হবে।

৩. আগামী ১০০ বছরের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে হলেও খিলাফতের চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে।

আর এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব দেয়া হয়, ইয়াহুদি মুরশিদ এবং ইতালির ইয়াহুদি হাকহাম (Hakham) এম্যানুয়েল কারাসুর (Emanuel Karasu) উপর। এম্যানুয়েল কারাসু এই পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বপ্রথম অন্যান্য প্রস্তুতিগুলো সুচারুভাবে সম্পাদন করে। পরবর্তীতে এগুলো বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হয়। এজন্য সে ইতালি থেকে উসমানীয়দের ভূমিতে অবস্থিত সেলানিকাতে বসতি স্থাপন করে। সেখানে সে সর্বপ্রথম 'ittehat ve terakki' নামক সংগঠনটিকে একটি সংঘ আকারে প্রতিষ্ঠা করে। ম্যাসন লজ (Mason Lodge) প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে সে তার চারপাশে জনবল বৃদ্ধি করতে থাকে। এই এলাকার বিভিন্ন সামরিক কর্মকর্তাকে উত্তেজিত করে তাদেরকে দিয়ে ইস্তানবুল অভিমুখে বাদশাহর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। শান্তিপ্রিয় সুলতান হিসেবে পরিচিত সুলতান আব্দুল হামিদ ইচ্ছা করলে এদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি রক্তপাত করতে চাননি এবং তিনি এদের চাপে ১৮৭৮ সালে তিনি যে সংসদকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছিলেন ত্রিশ বছর পর ১৯০৮ সালে সেটাকে পুনরায় চালু করেন।

এম্যানুয়েল কারাসু (Emanuel Karasu) এই সংসদে একজন সংসদ সদস্য হিসেবে প্রবেশ করে। সেই সংসদের অধিকাংশ সদস্যই অমুসলিম হওয়ায় এবং অন্যরাও নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় এক বছরের মধ্যে সে সুলতান আব্দুল হামিদকে পদচ্যুতির ঘোষণাপত্র জারি করে। এই পদচ্যুতির ঘোষণা সুলতানকে শুনানোর জন্য প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে সে নিজে রাজদরবারে প্রবেশ করে।

১৯০৯ সালে সুলতান আব্দুল হামিদকে সেলনিকাতে নির্বাসিত করে।

www.pathagar.com

এরপর 'Ittehat ve terakki' একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। অনেক সামরিক কর্মকর্তাকে তাদের প্রভাবাধীনে আনে। এভাবে এম্যানুয়েল কারাসু বাসেল কনফারেন্সে নেয়া তিনটি সিদ্ধান্তের প্রথমটি বাস্তবায়ন করে।

এরপর সিরিয়াল আসে দ্বিতীয় পরিকল্পনার। প্রথমেই সে লিবিয়াকে ইতালিয়ানদেরকে প্রদান করে। পরে বালকান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে কোনো প্রকার প্রয়োজন ছাড়াই উসমানী খিলাফতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শামিল করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত গালিচিয়া থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত ৩০টি ভিন্ন পয়েন্টে উসমানী সেনাবাহিনী যুদ্ধ করে। সকল পয়েন্টেই তারা চানাক্কালের মতো অসীম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করার পরও সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে তারা পরাজয় বরণ করে এবং সেভরেস চুক্তিতে (Treaty of sevres) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

সেভরেস চুক্তিটি (The treaty of Sevres) মূলত বৃহৎ ইসরাইল প্রকল্প (Great Israil Project)। ব্রিটেন ফিলিস্তিনকে তাদের নিজেদের জন্য দখল করেনি বরং এটা 'প্রতিশ্রুত ভূমি' (Promised Land) এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইসরাইলকে দেওয়ার মানসে তারা ফিলিস্তিনে হামলা করে। ইয়াহুদিরা (Zionism) বৃহৎ ইসরাইল প্রতিষ্ঠার জন্য সেভরেস চুক্তিকে বাস্তবায়নের জন্য ৫ বছর নিরলসভাবে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ১৯১৯ সালে কাহরামানমারাশে দুধ বিক্রেতা ইমাম এবং রিদওয়ান হোজার মতো বড় বড় জাতীয় বীরেরা তাদের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখেন এবং তারা জনগণকে সাথে নিয়ে ফ্রান্সকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। গ্রিস ১৫ মে ১৯১৯ সালে ইজমিরে দখল অভিযান পরিচালনা করেন কিন্তু সেখানেও তারা বালিখেসিরের হাসান বসরি চানতাই এবং ওয়াহবি চিকরিকচির মতো জাতীয় বীরদের নেতৃত্বে বড় ধরনের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এই বড় বড় বীরদের গড়ে তোলা মিলিশিয়া বাহিনীর সাথে এই ক্রুসেডররা পরিপূর্ণভাবে পেরে উঠতে পারেনি। ২৩ জুন ১৯২০ সালে তুরস্ক জাতীয় সংসদের প্রতিষ্ঠা এবং আনাতোলিয়া দখল করতে না পারায় এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ায় তারা সেভরেস চুক্তিকে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বর্ণবাদী-সাম্রাজ্যবাদী (Racist impetrialist) নামে পরিচিত ইয়াহুদিরা (Zionist) বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ৫ বছর এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালেও তারা পরিপূর্ণভাবে সফল না হওয়ায় তাদের কৌশল পরিবর্তন

www.pathagar.com

করে। যুদ্ধ করে দখল করার পরিবর্তে হাইম নাহুম (Haim Nahum) ডকট্রিনের আলোকে আনাতোলিয়ায় নরম (Soft Strategy) কৌশলের মাধ্যমে বৃহৎ ইসরাইল (Great Israel) রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় এমন কৌশল অবলম্বন করে।

এভাবে মিশরীয় হাকহাম (Hakham) ইয়াহুদি হাউম লাহুম ইননবু উপদেষ্টা নামে ১৯২৩ সালে লুজান চুক্তি (Lausanne Treaty) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। সে এই চুক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার আগে তার ইউরোপিয়ান বন্ধুদের এবং ম্যাসন নেতৃবৃন্দদেরকে যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলোই সে এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে। নাহুম তার ইউরোপীয় বন্ধুদেরকে এই রকম কথা বলেছিল, 'আপনারা ভুল করছেন, আপনারা কি ভেবেছেন যে, আনাতোলিয়াতে আক্রমণ করে তুর্কী মুসলমানদেরকে আপনারা পরাজিত করতে পারবেন? কখনো নয়। তুর্কী মুসলমানদেরকে আপনারা কখনো যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করতে পারবেন না। কয়েক বছরের মধ্যেই এই জাতি পুনরায় জেগে উঠবে এবং তারা তাদের শক্তি পুনরুদ্ধার করবে। এটা কি আপনারা হিসাব করেছেন? যদি তাই হয় তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো লোজান চুক্তির মাধ্যমে এদেরকে একটি সুযোগ দিয়ে এই সময়ের মধ্যে এদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরাতে হবে। এদেরকে তাদের দ্বীনের ও ইতিহাসের চেতনা ভুলিয়ে রাখতে হবে। মুসলিম তুর্কদেরকে একটি ঈমান ও চরিত্র বিধ্বংসী অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করতে হবে। অর্থনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে পত্র-পত্রিকা সকল কিছুকেই হস্তগত করতে হবে। নরম এবং সহজ (Libaralism) পন্থায় এগুলো করার পর, তুরস্ককে ভাগ করে বৃহৎ ইসরাইলের (Great Israel) অংশীদার করতে হবে।

এই শর্তগুলো বাস্তবায়ন করার আগ পর্যন্ত তার্কিশ জাতিকে ইতিহাসের দৃশ্যপট থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। এই শর্তগুলো পরিপূর্ণ করার আগে যুদ্ধ করে আপনাদেরকে পরাজিত হতে হবে।'

এভাবে লোজান চুক্তিকে একটি বিরতিকাল হিসেবে ধরে স্বাক্ষর করা হয়েছে। ইয়াহুদিরা (Zionism) একদিক থেকে হাইম নাহুমের ডকট্রিনকে বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি তাদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য ধাপে ধাপে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারা তাদের দালালদের (collaborator) মাধ্যমে তুরস্ককে ইউরোপীয় ইউনিয়নের

www.pathagar.com

সদস্যভুক্ত করে তুরস্কের ঐতিহাসিক সুনাম সুখ্যাতিকে বিনষ্ট করতে চায়। উপযুক্ত সময় আসলে তারা তুরস্ককে বিশেষ রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে তুরস্ক এবং ইসরাইলকে একই ইউনিয়নের অংশীদার করতে হবে। এরপর বলবে যে, 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন অনেক বড় হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ে আলাদা একটা শাখা করি'। তুরস্ক ও ইসরাইলের অংশীদারিত্বে অন্য আলাদা একটি ইউনিয়ন গড়ে উঠবে এবং আলাদা একটি রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করবে।

ইয়াহুদিবাদ (Zionism) একটি কুমিরের আকৃতির মতো। এই কুমিরের উপরের চোয়াল হলো আমেরিকা আর নিচের চোয়াল হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তুরস্ককে নিয়ে তাদের খেলাকে ভালো করে জানতে হলে, আমাদের জাতিকে কেন দুইশ' বছর যাবত পাশ্চাত্যের কৃষ্টি-কালচারের আলোকে (westernization) গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ভালো করে জানতে হবে। ১৯৮০'র দশক থেকে মিল্লি গরুশের হয়ে সারা তুরস্কে অভিন্ন বাজার (comon market) সম্পর্কে কনফারেন্স করেছি। এই ইউনিয়নের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে তুরস্কের জনগণকে সজাগ ও সচেতন করার ব্যাপারে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বকে পালন করার চেষ্টা করেছি। তুরস্ককে ইউরোপীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থই হলো ৪০ কোটি খ্রিস্টান জনসংখ্যার একটি ইউনিয়নে সাড়ে ৭ কোটি মুসলমান জনসংখ্যা বিশিষ্ট তুরস্ককে নিয়ে একটি প্রদেশ হিসেবে অংশীদার করা, তাদের আজ্ঞাবহ করা, তাদের সাথে নিজেদেরকেও এক দেশের অধিবাসী হিসেবে মনে করা। এ জন্য অর্থনৈতিক সুবিধার আড়ালে গিয়ে অনেক বড় একটি অর্থবহ এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো এটি। ক্রুসেডের মাধ্যমে তারা যেটা অর্জন করতে পারেনি, সেটা তারা এর মাধ্যমে অর্জন করবে। তুরস্ককে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রদেশ বানানোর পূর্বে তুরস্ক তার স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেবে। এরপর তারা যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক না কেন তুরস্ক একটি প্রদেশ হিসেবে 'জি হ্যাঁ' বলবে। কোনো শক্তি আমাদের হাতে থাকবে না, আমাদের বড় বড় সকল সম্পদগুলোই থাকবে তাদের নিয়ন্ত্রণে। আমরা হব তাদের সেবাদাস আর আজ্ঞাবহ গোলাম।

এজন্যই এই জাতির ঈমান চেতনায় বিশ্বাসী লাখ লাখ মানুষকে যারা জিজ্ঞেস করা ব্যতীত একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করে তুরস্ককে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রদেশ বানানোর চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ ঈমানদার ব্যক্তিরা তাদের এই পরিকল্পনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবে।

www.pathagar.com

জার্মানি এবং ফ্রান্সে অনেক বেশি ক্যাথলিক খ্রিস্টান আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই দুই গ্রুপ একে অপরের গলা কেটেছে। যুদ্ধের পর পোপ এই দুই দেশের কর্তাব্যক্তিদেরকে ডেকে বলেছিল, 'এখানে আসেন বাবারা, দেখি বিষয়টা কি?' 'দেখ তোমরা এক হাজার বছর ধরে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হও।' ক্যাথলিক হিসেবে তোমরা তোমাদের পরস্পরের এই রক্তারক্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ কর। কিভাবে হবে এটা? দেখ আমেরিকা কেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভক্ত ছিল, একে-অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, তারা একসাথে হয়ে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। অবশেষে তারা তাদের যুদ্ধ ভুলে এক জাতিতে পরিণত হয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করেছে। তোমরাও একটি রাষ্ট্র হবে এবং একজন অপরজনের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ করবে না।' আজকের এই ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রথম সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ১৯৫৪ সালের রোমের ক্যাথলিক মিটিংয়ে। তারা এটা পোপের পরামর্শক্রমে করেছিল। এই ক্যাথলিক মিটিংয়ে অংশ নেন জার্মানির প্রধানমন্ত্রী কনরাড আডেনাউয়ের (Konrad Adenrouen) ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী রবার্ট স্কুমান (Robert Schumann) এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী ডি গাসপেরি (De Gasperi) এদের তিনজনই ছিল ক্যাথলিক। এই তিন প্রধানমন্ত্রী তিন বছর প্রচেষ্টা চালিয়ে ২৫ মার্চ ১৯৫৭ সালে রোম চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়নের মূল ভিত্তি খৃস্টান সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের সভ্যতা হলো ইসলাম, যে ইসলাম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানবতার কল্যাণ সাধনে কাজ করেছে, হককে সবার উপরে স্থান দেয়ার নীতি-পদ্ধতির উপর অটল রয়েছে। আমাদের যে সভ্যতা হাজার বছরের ইতিহাসে মানবতাকে উন্নতি ও আলোর পথ দেখিয়েছে সে সভ্যতাকে রেখে খৃস্টান সভ্যতাকে গ্রহণ করার মানসিকতা সবচেয়ে বড় চেতনাহীনতা এবং অগ্রহণযোগ্য একটি বিষয়। এ রকম একটি মারাত্মক ভুল, কেবলমাত্র তারাই করতে পারে যারা আমাদের ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ।

আমরা এমন এক জাতি যেই জাতি এক হাজার বছর ইসলামের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করে ধরে গোটা মানবতাকে আলোর পথ দেখিয়েছে। আমাদের প্রতিযোগিতা এটা নয় যে, এমন একটি গাড়িতে উঠা যেটা চারিত্রিক ও নৈতিক দিক দিয়ে এক সর্বনাশা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রচেষ্টা হলো দুনিয়ার সকল মুসলিম দেশগুলোকে সাথে নিয়ে ন্যায় এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি ইউনিয়ন গড়ে তোলা। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়ের জন্য

www.pathagar.com

একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। জাতি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব এটা নয় যে, 'তুরস্ককে ইউরোপীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করা।' আমরা যদি এটা করি শুধুমাত্র তুরস্ক নয়, গোটা মানবতার জন্যই এটা খারাপ কাজ হবে।

কারণ এটা করা হলে মুক্তির দরজাকেই বন্ধ করে দেয়া হবে। যারা ইউরোপ ইউরোপ স্লোগান দিয়ে গলা ফাটান তারা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের হিজাব খুলতে বাধ্য করেন তারা একই চিন্তাধারার মানুষ। যারা ইউরোপ মানেই উন্নতি অগ্রগতি ভাবেন আর ইসলাম মানেই ভাবেন পশ্চাদপদতা তারাও এই চিন্তাকে লালন করেন। সে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে বলে কি, 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আমাদেরকে তাদের ইউনিয়নের যোগ্য মনে করেছে।' এ রকম কথাবার্তা এবং চিন্তা-চেতনা আমাদের পিতৃপুরুষদের সাথে গাদ্দারির শামিল। এর অর্থ কি? কে ইউরোপ? কোথায় প্রবেশের জন্য আমাদেরকে যোগ্য মনে করেছো? আমরা ইতিহাসের সবচেয়ে সম্মানিত জাতি। আমরাই বরং ইউরোপকে কোন ক্ষেত্রে যোগ্য আর অযোগ্য সেটা দেখব।

এই চিন্তা-চেতনার সাথে সম্পৃক্ত অধিকাংশই নফসের দাস। মদ খেয়ে আনন্দের ভুবনে ঘুরে বেড়ানোর মানুষ এরা। তুরস্ক উন্নত হবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা তুরস্ককে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত করতে চায় না। নিজের জাতিসত্তা, আত্মমর্যাদা, ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সে এতোটাই ভুল বলেছে যে, সে কি চাচ্ছে সে নিজেই তা জানে না।

আজকে আমাদের যে মোট জনসংখ্যা রয়েছে, এর সমপরিমাণ মানুষ যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়েছে। আমরা কেন চানাক্কালের যুদ্ধ করেছি? আমরা যদি এই দেশকে ইউরোপের প্রদেশ বানাই তাহলে চানাক্কালের যুদ্ধের শহীদদের মূল্য আমরা দিলাম কোথায়? আমরা যদি চানাক্কালের যুদ্ধে পরাজিত হতাম তাহলে ইংল্যান্ড আমাদের দেশকে দখল করে নিয়ে আমাদেরকে তাদের গোলাম বানিয়ে রাখত। এখন তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে একই কাজ করতে চাচ্ছে। ক্রুসেডের মাধ্যমে তারা যা করতে পারেনি আজ তারা তা রোমের চুক্তির মাধ্যমে আমাদেরকে প্রতারণায় ফেলে সেটা অর্জন করতে চাচ্ছে। ঘটনাপ্রবাহ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ।

একদিন খবরে 'বেলজিয়ামে একটি তুরকিশ গ্রাম' নামে একটি গ্রাম দেখিয়েছিল। নাম হলো ফাইমনভিলে। ক্রুসেডের সময় এই গ্রামের

www.pathagar.com

অধিবাসীগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। 'তোমরা তুর্কিদের পক্ষে, সুতরাং তোমরা তুরকিশ' এই বলে তারা তাদের অভিহিত করেছিল সেই ১০০ বছর পূর্বে।

সেদিন থেকে আজও তারা তুর্কিদের গ্রাম নামে পরিচিত। তাদের দরজায় চাঁদ-তারা অঙ্কিত রয়েছে। এই গ্রামের ফুটবল দলের ইউনিফর্মেও চাঁদ-তারা অঙ্কিত। কিন্তু তারা মদ খায় এবং শূকরের মাংস ভক্ষণকারী এমন এক গ্রামের অধিবাসী। এটা কেন আমি আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি? আমাদের সোলায়মান আরিফ এরময় সাহেবের সুন্দর একটি বাণী রয়েছে, 'হোজাম, (উস্তাদ) এরা আমাদেরকে অভিন্ন বাজারে (Common market) অংশীদার করে সমগ্র তুরস্ককেও বেলজিয়ামের সেই গ্রামের অবস্থার মতো করতে চায়।' এজন্য বলছি। মানবিকতা হতে, হকের মূল্যবোধ থেকে আমাদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আর এখান থেকে না আমাদের জন্য, না তাদের জন্য কোনো কল্যাণ হবে। কারণ আমরা আমাদের দ্বীনকে রক্ষা করে সেটার আদলে রাষ্ট্র গঠন করে তাদের জন্য উপমা হওয়া আমাদের জন্য আবশ্যক। কিছু সময়ের জন্য ধরে নিলাম যে, আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নে ঢুকেছি। কি হবে? সকল টাকা-পয়সা ইয়াহুদিদের হাতে। তারা এখানে এসে কৌশলগতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিনে নেবে অর্থাৎ আজ তুমি যে ফ্যাক্টরির মালিক আগামীকাল সেটার মালিক হবে। একজন ইয়াহুদি, একজন আর্মেনিয়ান অথবা একজন রোমান। তুমি তোমার ফ্যাক্টরিতে একজন হিসাবরক্ষক হয়ে থাকবে। আজকে ট্যুরিস্টিক একজন হোটেল মালিক আগামীকাল তাদের ওয়েটার হয়ে থাকবে। কেন? কারণ অভিন্ন বাজার (Common Market) ব্যবস্থা এমন একটা বাজার ব্যবস্থা যেটা ধনীকে আরও ধনী এবং দরিদ্রকে আরও দরিদ্র বানায়। তাদের মাথাপিছু আয় তোমার দশগুণ। এই দরিদ্র ব্যক্তি গিয়ে যখন সেই ধনীর সাথে অংশীদার হবে তখন ধনী হওয়া তো দূরে থাক নিজের পুঁজিও হারাবে। তাদের পদ্ধতিটাই হলো শোষণের পদ্ধতি। কোনো শিল্প-কারখানাই তুমি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। অর্ধশতাব্দী ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বপ্নে শুধু শুধু/মূল্যহীনভাবে কেটে গেছে। কোনো শিল্পায়ন হয়নি। আমাদের শুরু করা ভারি শিল্পায়নের (Heavy Industrialization) কাজকে এগিয়ে নেয়ার বিন্দুমাত্র পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এখনই যান গিয়ে সুপার মার্কেটগুলোতে দেখুন। রাজধানী আঙ্কারার মার্কেটগুলোতে গ্রিসের ভুট্টা দিয়ে বানানো চিপস বিক্রয় করা হচ্ছে। সকল

www.pathagar.com

শেলভগুলো আমেরিকা, ইতালি এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন পণ্যসামগ্রি দ্বারা পরিপূর্ণ। কারণ তারা অভিন্ন অংশীদার (common) আর আমরা হলাম বাজার (market)। ইউরোপীয় ইউনিয়নে না ঢুকতেই এই অবস্থা? প্রবেশের সাথে সাথেই তাদের পণ্য এসে আমাদের পণ্যকে গ্রাস করে ফেলবে। আমরা কি হব? আমাদের নিজেদের ফ্যাক্টরিতে, নিজেদের দেশে কেরানী হয়ে থাকব।' না কি বলেন– আমরাও কাজ করব। আমাদের দেশের মানুষ পরিশ্রমী।' হ্যাঁ সঠিক কিন্তু...।

এখন কিছু সময়ের জন্য অন্যভাবে চিন্তা করুন। আমরা মুসলিম দেশগুলোর সাথে মিলে একটি অভিন্ন বাজার (Common Market) প্রতিষ্ঠা করেছি। সে সময় কি হবে? দেড়শ' কোটি মুসলিম রয়েছে। মুসলিম দেশগুলো ইউরোপিয়ান দেশগুলোর মতো এতো পূর্ণ নয়। সকল দিক থেকে তারা অপূর্ণ। কারণ তাদেরকে শোষণ করতে করতে আজকের এই অনুন্নত অবস্থায় এনে ফেলে দিয়েছে। এই দেশগুলোর মধ্যে প্রযুক্তিগতভাবে সবচেয়ে উন্নত হলো তুরস্ক। তুরস্ক এমন একটি অবস্থানে অবস্থান করছে যে, আজ যদি আর একটু উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে অগ্রসর হয় তাহলে, বিমান, ট্যাংক তৈরি এবং বৃহৎ শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে পারবে।

আজ সৌদি আরব আমেরিকাকে বিমানের জন্য যে অর্ডার দেয় সেটার ১ অর্ডারের মূল্যই হলো ৫ বিলিয়ন ডলার। এখন আমেরিকার বিমান ফ্যাক্টরিতে ৭ লাখ মানুষ কাজ করে। এই ৭ লাখ মানুষের ৩ লাখ আমেরিকান সেনাবাহিনীর জন্য, আর বাকি ৪ লাখ মানুষ বাহির থেকে আসা অর্ডারের জন্য অর্থাৎ মুসলিম দেশগুলো থেকে আগত অর্ডারকে ডেলিভারি দেয়ার জন্য কাজ করে। এই অর্ডার যদি আমরা পাই তাহলে আমরা কি হব? আমরা একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারব। দুনিয়ার অর্ডার এবং দুনিয়ার টাকা, দুনিয়ার কাজকর্মের ক্ষেত্রে কেউ আমাদেরকে পেছনে ফেলতে পারবে না। এ রকম একটি ঐতিহাসিক সুযোগ আজ আমাদের সামনে। তুরস্কের সুযোগ-সুবিধা ইউরোপের দরজায় নয়, বরং মুসলিম দেশগুলোকে নিয়ে একটি ইউনিয়ন গড়ে তোলার মধ্যে এবং অভিন্ন বাজার সৃষ্টি করার মধ্যে আমরা তাদের মতো, আমাদের মুসলিম ভাইদের শোষণ করব না। আমরা যেমনভাবে হাতে হাত ধরে এক হাজার বছর চলেছিলাম, তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য আমরা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করব পাশাপাশি আমরাও শক্তিশালী হব।

www.pathagar.com

শতাব্দী আজ আমাদের সামনে এই সুযোগ এনে দিয়েছে, যে তুরস্ক মুসলিম বিশ্বের উন্নতি-অগ্রগতি এবং সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণের একটি কারণ হতে পারে।

আমাদের সাথে তারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। এই সত্য এবং বাস্তবতাটি ইয়াহুদিরা (Zionism) জানে। এমনকি আমরা জানি না কিন্তু তারা জানে। তারা জানে বলেই বছরের পর বছর ধরে তারা আমাদের সাথে এমন আচরণ করছে। তারা জানে যে, তুরস্ক যদি কোনো রকম সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তারা এটা চায় না। চায়না বলেই তারা সবসময় তুরস্ককে নিয়ে মাথা ঘামায়।

আলহামদুলিল্লাহ্, বছরের পর বছর ধরে ঝড়-বৃষ্টিকে পেরিয়ে তুরস্কের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি। অভিন্ন বাজার (Common Market) কি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কি? এটা নিয়ে মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করেছি। সাড়ে সাত কোটি মানুষকে এর সত্যতা সম্পর্কে বুঝানোর চেষ্টা করেছি। আমাদের জনসাধারণ যদিও এগুলো জানে। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি আরও একবার বলতে চাই, ইসলামিক ইউনিয়ন অবশ্যই একদিন প্রতিষ্ঠা হবে ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া অন্য কোনো পথ আর আমাদের সামনে নেই। আজ থেকে আমরা এটা বলছি এবং ইলান (Proclamation) করছি। আমাদের মধ্যে যারা এই চিন্তা-চেতনার বিপরীত চিন্তা করেন, আগামীকাল যখন ইসলামিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হবে তারাও এর সফলতাকে আলিঙ্গন করবে।

www.pathagar.com

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

ইয়াহুদিবাদী-পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের মানববিধ্বংসী পরিকল্পনাগুলোকে বুঝার জন্য মধ্যপ্রাচ্য এবং মুসলিম বিশ্বের বিগত একশ' বছরের অবস্থা আমাদের জন্য খুবই সহায়ক। বিশেষ করে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে তাদের কার্যক্রমগুলো বুঝার জন্য আপনাদেরকে একটু অতীতে নিয়ে যেতে চাই। বাগদাদের প্রাণকেন্দ্রে একটি সুউচ্চ দালানের আভিমেলি অডিটোরিয়ামে আমি উপস্থিত ছিলাম। চল্লিশটি মুসলিম দেশ থেকে আগত বুদ্ধিজীবী বিজ্ঞানী এবং সেসব দেশের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাসহ প্রায় ৬০০ জন উপস্থিত ছিলো। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় সে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। তার পেছনে দু'জন জেনারেল দাঁড়িয়ে তার বডিগার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

সেটা ছিল ১৭ জুন ১৯৯০ সাল। অর্থাৎ উপসাগরীয় সঙ্কট শুরু হওয়ার দেড় মাস পূর্বে। সেইদিন সাদ্দাম হোসেন ৪ ঘণ্টা বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি তার বক্তব্যে একদিন পূর্বে আমেরিকাতে ইয়াহুদি হসবিরা কি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেটা সম্পর্কে এভাবে বলছিলেন, 'ইরাক-ইরান যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল বিপজ্জনক অবস্থায় পতিত হয়েছে। ইরাকী সেনাবাহিনী ৯ বছর যুদ্ধ করে এই সুদীর্ঘ সময়ে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। সেই সাথে তারা অন্যদের থেকে প্রাপ্ত আধুনিক সমরাস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণের মাধ্যমে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে। দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরিচালনায় তারা দক্ষতা অর্জন করেছে। যেভাবেই হোক এই শক্তিকে নিঃশেষ করতে হবে এবং ইরাকের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের সকল দেশের পক্ষ থেকে অস্ত্রের অবরোধ আরোপ করতে হবে।

সাদ্দাম হোসেন, আমেরিকাতে ইয়াহুদি লবির এই পরিকল্পনা প্রকাশের পরবর্তীতে কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে হবে সেই সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, 'তারা সরাসরি আমাদের উপর অবরোধ আরোপ করেছে। শুধুমাত্র প্রতিরক্ষার দিক থেকে নয়, আমরা যে পেট্রোরাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি এটাতেও তারা বাধা দিতে চায়। আমাদের পাইপ লাইনগুলোও তারা অন্য দেশে থেকে বের করে দিতে শুরু

www.pathagar.com

করেছে। তারা আমাদেরকে নিয়ে অনেক বড় বড় ষড়যন্ত্রের ফাঁদ তৈরি করছে। তাদের পক্ষ থেকে অনেক বড় আঘাত অচিরেই আমাদের উপর আসবে। তাদের এই ষড়যন্ত্র শুধু ইরাককে কেন্দ্র করে নয় বরং গোটা মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেই তারা অগ্রসর হচ্ছে। এজন্য আমি এই কনফারেন্সের স্লোগান হিসেবে 'কুরআনের এই আয়াতটিকে নির্বাচন করেছি। (সূরা আনফাল-৬০) 'তোমরা তোমাদের (শত্রুদের) মোকাবিলায় নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বাধিক শক্তি অর্জন করে রাখ।'

পুরা ৯৯ দিন পর ২৩ জুলাই ১৯৯০ সালে পুনরায় বাগদাদে। উপসাগরীয় সঙ্কটের উত্তপ্ত দিনগুলো। যে কোনো সময় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পারে এমন সন্দেহ আকাশে-বাতাসে। এই সময় সাদ্দামের সাথে আমি। কিন্তু এবার না সেই বিশালাকার দালানের অডিটোরিয়ামে না সাদ্দাম হোসেনের প্রাসাদের চাকচিক্যময় কোনো জায়গায়। তার প্রাসাদের সাধারণ একটি অডিটোরিয়ামে। সাদ্দাম হোসেন তেজোদীপ্ত এবং দৃঢ়চিত্তে অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করলো। 'জনাব এরবাকান, আপনাকে স্বাগতম। অনেকদিন ধরে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি নাই। পুনরায় সাক্ষাৎ পাওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত।' এই কথা বলে তিনি তার কথা শুরু করলেন। তিন ঘণ্টাব্যাপী আমরা দু'জন কথা বলেছি। এই সাক্ষাতে সাদ্দাম হোসাইন ৯৯ দিন আগের কনফারেন্সে তার বক্তৃতায় যে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সেগুলো সম্পর্কে বললেন এবং তার উপর যে পরিকল্পনাগুলো চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সেগুলোর ভার বহন করতে না পেরে তিনি কুয়েত আক্রমণ করেছেন। অর্থাৎ 'নিজের ইচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে আমি এই পদক্ষেপ নিয়েছি বলে জানালেন। সারা দুনিয়ার দৃষ্টি যখন বাগদাদের উপর সেই সময় রাত ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ৩ ঘণ্টার সেই সাক্ষাতের পরে হোটেলে যখন ফিরছিলাম তখন সেখানকার কথাগুলো পুনরায় স্মরণ করার চেষ্টা করছিলাম। সকল কিছুকে বাদ দিয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপসাগরীয় সঙ্কট কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল? বিশ্বমানবতা এই সময়ে দীর্ঘস্থায়ী কোরিয়ান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, আফগানিস্তান যুদ্ধসহ অনেক যুদ্ধ দেখেছে। কিন্তু উপসগারীয় এই সঙ্কট এই সবগুলো যুদ্ধের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সারা দুনিয়া এটার পক্ষে-বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এটা কেন এতো গুরুত্ব পেয়েছিল?

www.pathagar.com

এসব কিছু চিন্তা করছিলাম। হ্যাঁ, সত্যিকার অর্থেই এই অগ্নিঝরা দিনগুলোতে সারা দুনিয়া যখন এটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখনকার সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা বাগদাদে। ২২ দিন ২২ রাত চেষ্টা করে যখন 'উপসাগরীয় শান্তি মিশন' এর সফলতার চিন্তায় মশগুল তখন মাঝপথে এটা ব্যর্থ হতে যাচ্ছিল। সারা দুনিয়া যখন যুদ্ধ বাধানোর পক্ষে কাজ করছিল, উপসাগরের সেই জলন্ত অগ্নিকে আরও জ্বালিয়ে দেয়ার চেষ্টায় রত, আমরা তখন সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে এটা থামানোর চিন্তায় অস্থির। কোনোক্রমেই যাতে যুদ্ধ না বাধে এ জন্য আমরা আমাদের সকল শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আর এই কাজ শুরু করেছিলাম ৯ জুলাই ইস্তানবুল থেকে মক্কায় এক কনফারেন্সে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। বাগদাদ, মক্কা, আম্মান এবং ত্রিপোলির মধ্যে ফাটল দূর করার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা চলছিল। বিমানে আমার একটি ঘটনা মনে পড়েছিল। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা পুনরায় মনে করলাম। ১৯৫২ সালের বসন্তকাল। জার্মানিতে আমার ডক্টরেটের থিসিস এবং সহকারী প্রফেসর হিসেবে যোগদানের থিসিস শেষ করার পর Achen Techische Hochschole এ প্রফেসর স্কিমিডের সাথে আজকের অস্ত্র কারখানার মৌলিক ভিত্তি স্থাপনকারী ক্ষেপণাস্ত্র এবং লিউপাউ ট্যাঙ্কের ইঞ্জিনের উন্নতিকল্পে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রফেসর স্কিমিড জার্মানির যুদ্ধ বিষয়ক সর্বোচ্চ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দুনিয়াতে সর্বপ্রথম জার্মান সেনাবাহিনী ইউরোপ থেকে লন্ডনে V1-V2 ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে যে হামলা চালিয়েছিল, সেই ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় তিনি আমার সাথে দেখা করতে চাইলেন। তার হাতে ছিল ESSO পেট্রোল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার ড. মুলের একটি গোপন কনফারেন্সের দাওয়াতি কার্ড। তিনি এই কনফারেন্সে যাবেন না। কিন্তু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্সে তার নাম লেখা চেয়ারটি যাতে ফাঁকা না থাকে এই ব্যাপারে তিনি গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন যে, যদি সম্ভব হয়, আমি যাতে গিয়ে তার নামে লেখা চেয়ারটাতে বসি আমি খুবই খুশি মনে এটাকে গ্রহণ করলাম।

আর কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত শহর আকহেন (Aachen) নবনির্মিত অনেক চাকচিক্যময় একটি বিল্ডিংয়ে। মূলত এটি ছিল Aachen

www.pathagar.com

শহরের গাছপালায় পরিপূর্ণ একটি মনোরম জায়গায় অবস্থিত একটি হোটেল। প্রবেশের সময় খুবই সতর্কতার সাথে চেক করছিল। আমন্ত্রণ পত্র দেখিয়ে আমি প্রফেসর স্কিমিডের চেয়ারে বসলাম। শহরের বড় বড় কর্মকর্তা, ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী প্রফেসরগণ, সফল ব্যবসায়ী এবং বিখ্যাত লেখকদেরকে এই কনফারেন্সে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। ESSO পেট্রোল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার তার উদ্ভাবনী বক্তব্যে এই কথাগুলো বলেছিলেন।

'আজকে আমি আপনাদেরকে যে প্রোগ্রামে দাওয়াত দিয়েছি এর নাম হলো আজকের সৌদি আরব।' আর এই রকম নামকরণের মূল কারণ হলো এই কনফারেন্সের গোপনীয়তা রক্ষা করা। এই মিটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো, 'আমি সৌদি আরবের দাম্মামে নতুন যে পেট্রোলের খনি আবিষ্কৃত হচ্ছে সেখান থেকে এসেছি। আমেরিকানদের সাথে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পেট্রোলের খনির সন্ধান পেয়েছি। আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে বাছাইকৃত অতিথিদের নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান। আমরা পাশ্চাত্যে যারা আছি তাদের স্বার্থে এই খনিটিকে কিভাবে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যায় এজন্য আজ আমরা পরামর্শ করব। আপনাদেরকে এই বৃহৎ খনি সম্পর্কে ধারণা দেয়ার পর মূলত এখন আমি আপনাদের পরামর্শ শুনতে চাই।'

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পেট্রোল কোম্পানির সন্ধান পাওয়ার পর তারা সৌদি আরবে তেল উত্তোলন শুরু করেছিল। আর এই খনিতে পেট্রোলের পরিমাণ ছিল পৃথিবীর মোট রিজার্ভের শতকরা ২০ ভাগ। আর পাশ্চাত্য এই বিশাল রিজার্ভকে তাদের জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিল। একদল প্রথমদিন থেকেই এর জন্য সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। আর ড. মুল্লার তার বক্তব্যে মুসলিমদের সম্পর্কে এত কথা বলেছেন যে, সত্যিকার অর্থে তার কথার সাথে মুসলিমদের কোনো যোগসূত্র ছিলো না। তার পথ ধরে মুসলমানদের অধিকার হরণ করার জন্য সেখানে উপস্থিত অতিথিগণও এমন অমানবিক প্রস্তাব এবং পরামর্শ দিয়েছিল যে, তার প্রতিক্রিয়া দেখানোর চেষ্টা করেও তা পারিনি।

আমার জীবনে আর কোনোদিন এমন উত্তেজিত হইনি। প্রফেসর স্কিমিডের স্থানে বসায় এবং তার পরিবর্তে যাওয়ায় সেদিন আমি চুপ থাকতে বাধ্য ছিলাম। কিন্তু আমার মধ্যে এমন প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়েছিল যে, সে রাতে আমি বসে ৪০ পৃষ্ঠার একটি চিঠি তুরস্কে অবস্থানরত বন্ধুদেরকে পাঠিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

উপসাগরীয় অঞ্চলের এই পেট্রোলকে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য প্রথমদিন থেকেই এমন চোখে দেখে আসছে। এই পেট্রোলকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে।

কারণ পাশ্চাত্যের শিল্প-কারখানাকে টিকিয়ে রাখতে হলে এর বিকল্প নেই। অর্থাৎ এটা তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেই হবে। অন্যকথায় বলতে গেলে, পাশ্চাত্যের কাছে পেট্রোলের মূল্য হয় তাদের জীবনের মতো। কারণ এর মাধ্যমেই তারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়ে থাকে। পেট্রোলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখার জন্য পাশ্চাত্যের পরিকল্পনা এবং পর্দার আড়ালে তাদের আসল চরিত্র সেদিন প্রকাশিত হয়েছিল। পেট্রোল খনিসমূহের মালিক মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে এবং মানুষের জীবনের বিরুদ্ধে তারা কত বড় অবিচার এবং জুলুম নির্যাতনের পথ বেছে নিতে পারে সেদিনের তাদের কথায় এটা প্রকাশিত হচ্ছিল।

তথাপি ১৯৭৩ সালে ইসরাইল যখন অন্যায়ভাবে তার প্রতিবেশী দেশগুলোতে আক্রমণ করেছিল তখন সৌদি আরবের বাদশা তার অধিকারের অংশ হিসেবে পশ্চিমা দেশে রপ্তানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি করায় তারা এর প্রতিক্রিয়ায় পাশ্চাত্যের সকল দেশ এক হয়ে বিখ্যাত Energy Agency প্রতিষ্ঠা করে। সেই সময় তুরস্ককেও এই এজেন্সিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিল। এই এজেন্সির মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমগণ যাতে তেলকে অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করতে না পারে। আর আমরাও এই এজেন্সির সদস্যভুক্ত হওয়ার মধ্যে জাতীয় কোনো স্বার্থ খুঁজে পাইনি। আমরা সরকারে থাকা অবস্থায় দীর্ঘ চার বছর এই এজেন্সির সদস্য হওয়ার বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছি। কারণ আমরা আমাদের ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ থেকে তুরস্কের প্রয়োজন মাফিক পেট্রোল সস্তা দামে আমদানি করতে পারতাম।

Energy Agency-র মাধ্যমে পাশ্চাত্যের দেশগুলো প্রতি ব্যারেল তেলের মূল্য ৪০ ডলার থেকে ৬ ডলারে নামিয়ে আনে। আর এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাশ্চাত্যের দেশগুলো তাদের রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য দ্রুত সময়ে বৃদ্ধি করে। ফলাফল হিসেবে মুসলিম দেশগুলোই তাদের শোষণের শিকার হয়েছিল।

এর কিছুদিন পরই উপসাগরীয় অঞ্চলে পাশ্চাত্যের বন্ধু ইরানের শাহ এর পতনের পর পরবর্তী সরকার পাশ্চাত্যের অনুগত না হওয়ায়, আমেরিকা

www.pathagar.com

উপসাগরের পেট্রোলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে পুনরায় সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং ফ্লাইং স্কোয়াড (Flying Squad) প্রস্তুত করে। আর এই স্কোয়াডকে যে কোনো সময় ব্যবহার করতে পারার জন্য তুরস্কের ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি চায়। সেই সময় আমরা সংসদে এর তীব্র বিরোধিতা করি এবং আমাদের সকল শক্তি দিয়ে এটা প্রতিহত করি। উপসাগরীয় অঞ্চলে এই সমৃদ্ধশালী তেলের খনিগুলোর সন্ধান পাওয়ার পর থেকেই এই অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের জন্য তারা নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বুনে আসছে। পাশ্চাত্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকেই তাদের সর্বাধিক সামরিক শক্তি এই উপসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন করে। এত কম সময়ের ব্যবধানে এই অঞ্চলে এত সৈন্য সমাবেশ ঘটানোর কারণ কি? এতো গুরুত্ব কোথা হতে আসে? সর্বশেষ উপসাগরীয় সঙ্কট অথবা বিগত ৪০ বছর ধরে বিরতিহীনভাবে ঘটানো ব্যাপারগুলোকে বুঝতে হলে পেট্রোলের এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের পেট্রোল খনিগুলোর গুরুত্ব এবং দুনিয়াতে এর প্রভাবশালী ভূমিকাকে জানা খুবই জরুরি।

গবেষণায় দেখা যায় যে, ভবিষ্যতে শক্তির যোগান দেওয়ার জন্য বর্তমানে যে পেট্রোল রয়েছে সেটা সীমিত এবং ভবিষ্যতে গোটা বিশ্ব পেট্রোল সঙ্কটে পতিত হতে পারে। সকল প্রকার বিকল্প ব্যবস্থার পরও এখনও মানুষের শক্তির যোগান দেয়ার জন্য পেট্রোল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজদ্রব্য। অন্যদিক থেকেও বর্তমান সভ্যতা প্রতিরক্ষা এবং অস্ত্র কারখানার মূল চালিকা শক্তি হলো পেট্রোল। কারণ বিমান, ট্যাংক, জাহাজ এসব কিছুই পেট্রোল দ্বারা চালিত হয়। অপরদিকে মানুষের স্বাভাবিক চলাচলের জন্য যানবাহনগুলোও পেট্রোল দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। এই সকল বিশেষত্বই পেট্রোলের গুরুত্ব এতো বাড়িয়ে দিয়েছে। সমগ্র মানবসভ্যতার জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ এই পেট্রোলের রিজার্ভ পৃথিবীতে সীমিত।দুনিয়াতে মজুত পেট্রোলের পরিমাণ ইরাকে ১০ ভাগ, কুয়েতে ১০ ভাগ, ২০ ভাগ সৌদি আরবে, ১০ ভাগ ইরানে রয়েছে। পৃথিবীর ৫০ ভাগ পেট্রোল এই উপসাগরীয় অঞ্চলে মজুত রয়েছে। আর এর আজকের মূল্যমান ট্রিলিয়ন, ট্রিলিয়ন ডলার। এই উৎসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা মানে সারা পৃথিবীর শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। সারা দুনিয়ার মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো সামর্থ্য হাতে রাখা তাদের জন্য জরুরি। অপরদিকে উপসাগরীয় এই দেশগুলো পেট্রোল বিক্রয় করে সেই টাকা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রেখেছে যার

www.pathagar.com

পরিমাণ ৭০০ বিলিয়ন ডলার। এই বিশাল অংকের টাকা সেই দেশের ব্যাংকগুলো মূলধন হিসাবে ব্যবহার করছে। উপসাগরীয় রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার এটি একটি অন্যতম কারণ।

পৃথিবীর ধনী দেশগুলোর একটি সংগঠন আছে এক কথায় আমি এদেরকে নিপীড়ক সংগঠন বলে অভিহিত করে থাকি।

এই 'নিপীড়ক শক্তি' একদিক থেকে গোটা দুনিয়ার পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণ করে, অপরদিকে ব্যাংক, শিল্প প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক কোম্পানি, সকল যোগাযোগ মাধ্যম। রাজনৈতিক দল এবং উন্নত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গোয়েন্দা সংস্থার মতো প্রভাবশালী মেকানিজমের মাধ্যমে তারা বিশ্বমানবতাকে শোষণ করে আসছে। এই নিপীড়ক শক্তি যে শুধুমাত্র অনুন্নত দেশগুলোকেই শোষণ করে তা নয়। এরা উন্নত দেশের মানুষগুলোকেও শোষণ করে। প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে যে পরিবর্তনের হাওয়া লাগিয়ে থাকে এর ফলাফল হিসেবে এই নিপীড়ক শক্তি তার পুঁজিকে ঋণ হিসেবে দিয়ে থাকে। এভাবে তারা একদিকে এই দেশগুলোকে পরিচালনা করে থাকে অপরদিকে তাদের সেই ঋণের সুদের মাধ্যমে শোষণ করে থাকে। এভাবে তারা সারা বিশ্বের ৬০০ কোটি মানুষকে শোষণ করে চলছে।

এই 'নিপীড়ক শক্তি'র কার্যকলাপকে যখন দেখি, দুনিয়াজুড়ে তার ভূমিকা এবং কার্যপ্রণালীকে দেখে, বাল্যকালের ভৌতিক সিনেমার কথা মনে পড়ে যায়। এক রক্তচোষা ড্রাকুলা ছিল যে মানুষের রক্ত খেয়ে জীবন ধারণ করত। এজন্য সে সকল ধরনের কাজ করত। অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করত। কামড়াত এবং ভেঙে ফেলত। তেমনিভাবে আজকের এই 'নিপীড়ক শক্তি' ৬০০ কোটি মানুষের অধিকারকে হরণ করছে, তাদেরকে শোষণ করছে, নির্যাতন করছে এবং চোখের পানিতে আজ তারা ভেসে বেড়াচ্ছে।

২৩ জুলাই ১৯৯০ সালে বাগদাদে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে দেখা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'জাতিসংঘ এবং পাশ্চাত্য ইসরাইলের দখলদারিত্ব সম্পর্কে কোনো কথা বলে না। কিন্তু আজ আমাদের বিরুদ্ধে তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ।

ইসরাইলের কাছে পারমাণবিক বোমা এবং রাসায়নিক অস্ত্র থাকার পরও পাশ্চাত্যের কোনো দেশ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না। ফিলিস্তিনে ইসরাইলের

www.pathagar.com

হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে তাদের কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় না। কিন্তু আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের যে অস্ত্র রয়েছে সেটাকে তারা নিঃশেষ করে দিতে চায়। 'সাদ্দাম হোসেন মূলত তার কথার মাধ্যমে এই নিপীড়ক শক্তির অন্তর এবং মস্তিষ্ককে বুঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে এই অঞ্চলকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কি পরিকল্পনা সেটাকে জানা জরুরি। মুসলিম দেশগুলোর শক্তিক্ষয়ের এবং অর্থক্ষয়ের অন্যতম কারণ ছিল ইরাক-ইরান যুদ্ধ। আট বছর স্থায়ী এই যুদ্ধের অবসানের প্রাক্কালে মুসলমানগণ তাদের মধ্যকার সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বকে বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের পর ইরাকের সেনাবাহিনী আরও বেশি অভিজ্ঞ এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর এ কারণেই ইসরাইল এটাকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। ইসরাইল, ইরাককে তার সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে। ইরাককে শায়েস্তা করার জন্য যে কোনো পথ অবলম্বন করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা দেয়। ইরাক তার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ৭০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণের জালে আটকা পড়ে। যুদ্ধের পরই যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এই বৈদেশিক ঋণ তার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়।

এই অবস্থায় তিনি সৌদি আরব এবং কুয়েতের শরণাপন্ন হয়ে বলেন, 'আমরা এই যুদ্ধ সকলের জন্যই করেছি। এই ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদেরকে সাহায্য করুন।' সৌদি আরব এবং কুয়েত ইরাকের প্রতি সাহায্যের হাতকে প্রসারিত করে। যুদ্ধের পর সৌদি আরব ইতিবাচক সাড়া দিয়ে এর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই করে। কিন্তু কুয়েত তাদের মধ্যকার সীমান্ত সমস্যার জের ধরে এটাকে সমাধান করার জন্য বসরার কাছের দু'টি দ্বীপের মালিকানা দিতে বলে কিন্তু ইরাক এতে রাজি না হওয়ায় কুয়েত ও ইরাকের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে সাহায্য করতে অস্বীকার করে। যার ফলে জেদ্দার সেই সংলাপ ফলপ্রসূ হয়নি। ইরাক, কুয়েত আক্রমণ করে কুয়েতকে ইরাকের অংশ বলে ঘোষণা করে। আর আমেরিকা এই সুযোগে উপসাগরে এবং সৌদি আরবে বিশাল সৈন্য সমাবেশ ঘটায় এবং অবিরামভাবে এই শক্তিকে বৃদ্ধি করতে থাকে।

ইরাক এবং জর্ডানকে অবরোধ করে ফেলে। এই অবরোধকে যারা ভাঙার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগের জন্য জাতিসংঘ থেকে বিল পাস করে।

www.pathagar.com

এই অচলাবস্থা চলার সময় OIC মিটিং আহ্বান করে। কিন্তু উপসাগরীয় সঙ্কটের কোনো সমাধান বের করতে ব্যর্থ হয়। সদস্য দেশগুলো দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সকল সদস্য এক হয়ে সংলাপ করবে এমন অবস্থা বিনষ্ট হয়ে যায়। ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে এবং সমস্যার সমাধানে বিচারকের ভূমিকা পালন করার কথা ছিল তুরস্কের। কিন্তু সেই সময়ের সরকার শুরু থেকেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশের কথামতো চলতে থাকে এবং একটি পক্ষাবলম্বন করায় তুরস্ক এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় এবং তার অধিকারকে খর্ব করে।

২২ দিন ২২ রাতের অবিরাম পরিশ্রমের ফলাফল 'উপসাগরীয় শান্তি মিশন' ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ ছিল এগুলো। আমাদের এই কাজ ৯ জুলাই ১৯৯০ থেকে শুরু হয়ে ১ অক্টোবরে গিয়ে শেষ হয়েছিল। আমাদের এই কাজ চারটি গ্রুপ থেকে শুরু হয়। আমি বাগদাদ, মক্কা এবং ট্রাবলুসের বিভিন্ন কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছিলাম। উপসাগরীয় সঙ্কট সমাধানের জন্য আম্মান, মক্কা এবং বাগদাদে মুসলিম কমিউনিটির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বিভিন্ন বৈঠকের আয়োজন করেছি। সঙ্কট থেকে সুন্দরভাবে উত্তরণের জন্য সৌদি আরব এবং ইরাকের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একসাথে বসেছি। উপসাগরের ঘটনা মানব ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরের সাথে সম্পৃক্ত একটি ফ্যাক্টর। এজন্য আমরাও আমাদের কাজের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। প্রথমেই আমি এই ফ্যক্টরগুলো সম্পর্কে একটু আলোকপাত করতে চাই।

সাম্রাজ্যবাদ, অর্থাৎ 'নিপীড়ক শক্তি': প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এই পার্থক্যটি দূরীভূত হওয়ার পর থেকে এই 'নিপীড়ক শক্তি' সকল মজলুমের বিরুদ্ধে আরও প্রবলবেগে হামলে পড়ে জুলুম করা শুরু করেছে। আমেরিকা, লিবিয়া, ডোমেনিকা, গ্রানাডা, পানামা এবং লাইবেরিয়াতে সরাসরি যুদ্ধাভিযান পরিচালনার পর এখন তাদের উপর বেপরোয়াভাবে জুলুম-নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করেছিল। আমাদের ভূমিকা ছিল যেভাবেই হোক এটাকে বাধা দেয়া। এজন্য আমরা চেয়েছি এই সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য শক্তিকে সর্বাগ্রে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে বিদায় করা।

www.pathagar.com

ইয়াহুদিবাদ (Zionism): ইয়াহুদিদের অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করা এবং তারা যাতে অন্য কোনো পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের বৃহৎ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো সুযোগ না পায়। এজন্য মুসলিম দেশগুলো যাতে তাদের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে এবং তারা যাতে দুর্বল না হয়। অর্থনৈতিকভাবে কোনো ক্ষতির স্বীকার না হয়ে পড়ে।

পেট্রোল : এটা হলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পদ। আর এই সম্পদ যাতে মানুষকে শোষণ ও নিপীড়নের জন্য ব্যবহৃত না হয় মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য ব্যবহৃত হয়। এজন্য এই কৌশলগত সম্পদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ যাতে কোনোক্রমেই সুদখোর পুঁজিবাদীদের হস্তগত না হয়। এটা যাতে এর আসল মালিক মুসলিম দেশগুলোর কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইসলামিক সংগঠন : সাম্রাজ্যবাদীরা যখন সমগ্র মানবতাকে শোষণ করতে প্রস্তুত সেই সময়ে এই সংগঠনসমূহ মুসলিম দেশগুলোর শাসকদেরকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে থাকে। মুসলিম দেশগুলোর শাসকগণ OIC-র মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করলেও বিভিন্ন কারণে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে না। যদিও উপসাগরীয় সঙ্কটের সমাধানের জন্য OIC-র পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ একত্রিত হয়েছিলেন। তারা সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে পুনরায় একত্রিত না হতে পারার মতো অবস্থার সৃষ্টি করে সকলেই বিদায় নেন।

শাসকগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলো বছরের পর বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয় কোনো ভূমিকা না রাখতে পারায় মুসলিমদের প্রতিষ্ঠিত এই কমিউনিটি সংগঠনগুলো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রাখায় মুসলিমদের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। এই সংগঠনগুলোর মধ্যে কতিপয় রাজনৈতিক দল হিসেবে, কতিপয় ফাউন্ডেশন হিসেবে, কতিপয় আরো অন্যান্য সংগঠন হিসেবে একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম কমিউনিটি ইউনিয়ন এই সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করত।

১৩টি দেশের রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রথমবারের মতো আম্মানে একত্রিত হয়। আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল একটি পরিকল্পিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা। অপর একটি উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর সমাধানের একটি পথ খুঁজে বের করা। এই প্রোগ্রামে আমাদের এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হই।

আমাদের মূলনীতি হলো মুসলিম দেশগুলোর সমস্যাগুলোকে পরস্পরের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা। প্রয়োজন হলে অপর মুসলিম দেশের মধ্যস্থতায় সমাধানের চেষ্টা করা। কিন্তু কোনোক্রমেই যুদ্ধ বা ধ্বংসাত্মক পথ বেছে না নেয়া।

এই শর্তসমূহের আলোকে কাজ করলে যে উপকারগুলো হবে তা হলো, লাখ লাখ মুসলমানের রক্তপাত হবে না, মুসলিম দেশগুলো ধ্বংস হবে না এবং সুযোগ সন্ধানী বহির্শক্তি কোনো প্রকার হস্তক্ষেপের সুযোগ পাবে না। যদি সৌদি আরব এবং কুয়েতের প্রতিরক্ষার জন্য সকল মুসলিম দেশ একত্রিত হয়ে একটি শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠন করতে পারত, তাহলে সময়ের ব্যবধানে এই বাহিনী মুসলিম দেশগুলোতে প্রতিরক্ষার একটি বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠত।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে মক্কায় যে কনফারেন্স শুরু হয়েছিল এর প্রথম দুইদিন যে সকল বক্তা বক্তব্য রেখেছিলেন তারা সকলেই শুধু এ কথা বলেছিলেন যে, ইরাক এ ক্ষেত্রে অপরাধী এবং এ কারণেই সৌদি আরব বাধ্য হয়ে পাশ্চাত্যের শক্তিকে তার মাটিতে স্থান দিয়েছে। যদিও কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, উপসাগরীয় সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ সমাধান করা। এজন্য দ্বিতীয় দিনের বিকেলের অধিবেশনে আমি বক্তব্য রাখি। আমার এই বক্তব্য সকলেই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনেছিল। সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য মুসলিম দেশসমূহের করণীয় কি এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত কথা বলেছিলাম। এই সঙ্কট উত্তরণের জন্য মুসলিম দেশগুলোর কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন এ সম্পর্কে প্রস্তাবনা পেশ করেছিলাম। এই সঙ্কট সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এই কমিটি কাজ করে যাবে। এ কথা বলেছিলাম। আমার এই বক্তব্য কনফারেন্সের ঘোষণা পত্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

মহান রবের কি করুণা আমাদের এই কনফারেন্স ১২ জুলাই পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়। ১৯৮০ সালের ১২ জুলাই থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমাকে একটি দ্বীপে নির্বাসন দিয়েছিল। সেই সময়ে জুমআ থেকে শুরু করে কোনো নামাজই আমাকে মসজিদে আদায় করার অনুমতি দেয়নি। আর আজ

www.pathagar.com

কালো গিলাফে ঢাকা কা'বা শরীফের দরজাকে আমাদের জন্য বিশেষভাবে খুলে দিয়ে কা'বার ভেতরে আমাদেরকে নামাজ পড়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

কনফারেন্সের পরে সর্বপ্রথম সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স সুলতান বিন আব্দুল আযীযের সাথে যোগাযোগ করি। আমাদের দুই ঘণ্টাব্যাপী এই বৈঠক খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এর আগেই আমাদের একটা পরিকল্পনা ছিল যে, উপসাগরীয় সঙ্কটের সমাধানের জন্য কুতাইহিয়াতে একটি সমাবেশ করব। এই উদ্দেশ্যে ১৪ জুলাই আমি তুরস্কে ফিরে আসি। ১৫ জুলাই আমরা সমাবেশ করি। এর পরের দিন ১৬ জুলাই উপসাগরীয় শান্তি মিশনের কাজের জন্য আম্মানে যাওয়ার সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী এজেবিদ-এর সাথে একই বিমানে ছিলাম।

১৯৮০ সালে এক সেনা অভ্যুত্থানে তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। তিনি এ কথাই বুঝতে পেরেছেন। আম্মানে ইরাক এম্বাসীর কর্মকর্তাদের সাথে বাগদাদে আমাদের প্রোগ্রামের বিষয়ে আলোচনা করে একই দিনে জেদ্দায় যাই। ১৭ জুলাই সোমবার মুসলিম কমিউনিটি ইউনিয়নের সাথে পুনরায় একটি বৈঠক করি। মিটিংয়ের বক্তব্যই হোক অথবা সৌদি বাদশাহর সাথে আলাপচারিতায় হোক উপসাগরের শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের তিনটি মূলনীতির অন্য কোনো বিকল্প নেই এটাই বুঝানোর চেষ্টা করেছি। আমাদের এই মূলনীতি তিনটি শুধুমাত্র উপসাগরীয় সঙ্কটের জন্য নয় বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সকল সমস্যা সমাধানে এই মূলনীতিগুলোকে অবলম্বন করা উচিত। উপসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে সর্বপ্রথম যে পদক্ষেপটি নেয়া জরুরি ছিল সেটা হলো, সকল পক্ষকে গ্রহণ করে তাদের সকলের সম্মান এবং খ্যাতি রক্ষা করবে এমন কোনো সমাধান বের করা। দ্বিতীয় ধাপে করণীয় যেটা ছিল সেটা হলো সঙ্কট উত্তরণের জন্য কোনো সিদ্ধান্তকে কখন বাস্তবায়ন করতে হবে সেটা নির্ধারণ করা। তৃতীয়ত এই সিদ্ধান্তসমূহকে কে বা কোন সংগঠন কিভাবে বাস্তবায়ন করবে সেটাকে নির্ধারণ করে দেওয়া। আমার এই প্রজেক্টকে বিস্তারিতভাবে বাদশাহ ফাহাদকে বুঝিয়েছি। বাদশাহ ফাহাদ তখন আমাকে বলেছিলেন, 'জনাব এরবাকান, আমরা শান্তি চাই। এর জন্য আপনারা সকল পন্থা অবলম্বন করুন। এর জন্য সকল দরজায় কড়া নাড়ুন। যদি না খোলে আবার কড়া নাড়ুন।' এই কথা বলে তিনি শান্তির পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন।

www.pathagar.com

সৌদি আরবের মক্কা এবং জেদ্দার মতো শহরগুলোতে উপসাগরীয় যুদ্ধাবস্থার কোনো উত্তেজনা অনুভব না হলেও, যে সব শহরে এক লাখ কুয়েতি এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, যে সকল শহরে এর প্রভাবে কত মানুষ অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছিল সেটা অনুভব করা খুবই কষ্টকর ছিল।

কুয়েতের আমীরের পরিবারের ১০০০ সদস্য, ২২ জন সরকারি কর্মকর্তা এবং সংসদ সদস্যগণ সৌদি আরবের তায়েফে অবস্থান নিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থিত শেরাটন হোটেল কুয়েতের অস্থায়ী সরকারি অফিসে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন দেশে অবস্থিত দূতাবাসগুলোকে এখান থেকেই পরিচালনা করা হতো। একইভাবে তাদের মন্ত্রিসভার বৈঠকও এই হোটেলের হল রুমেই করতেন।

২০ জুলাই বৃহস্পতিবার সকালে জেদ্দার কাসরি মুতামারাতে কুয়েতের শ্রমমন্ত্রী আমাদের সাথে বৈঠক করার সময় নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছিলো।

'আপনারা জানেন যে, ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে ইরাককে সাহায্য করেছি। বড় রকমের অর্থ সাহায্য ছাড়াও আমাদের বন্দরগুলো তাদেরকে ব্যবহার করার জন্য দিয়েছিলাম। যুদ্ধের পর ইরাকের অনুরোধগুলোকে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করেছি। জেদ্দাতে আলোচনা চলা অবস্থায় ইরাকের পক্ষ হতে হঠাৎ করে এই প্রোগ্রামকে বাতিল করা হয়।

এর অল্প কিছু সময় পরই ইরাক সামরিক অভিযানের মাধ্যমে কুয়েতকে দখল করে নেয়। এর কিছুদিন পরই কুয়েতকে ইরাকের অঙ্গরাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দখলদারিত্বের পর থেকে ইরাকের দখলদার বাহিনী কুয়েতি জনসাধারণের উপর জুলুম-নির্যাতন শুরু করে। লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা অনেক নির্যাতন পরিচালনা করে। হাজার হাজার মানুষ অসহায় ও পেরেশান অবস্থায় জীবনযাপন করছে। আমাদের ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করা হয়েছে, স্থাপত্য ও সামুদ্রিক সম্পত্তিকে ইরাকে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এই সাক্ষাতের সময় কুয়েতের শ্রমমন্ত্রী নিজে এভাবে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করছিলেন, 'কুয়েত থেকে আসার সময় সাথে কোনো কিছুই আনতে পারিনি। আমার পরনে যে কাপড় দেখছেন এটাও সৌদি আরবের এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার নিয়েছি। বিগত পঞ্চাশ দিন যাবত কুয়েতে অবস্থানরত আমার পরিবারের কোনো খবর নিতে পারিনি। 'এই প্রতিনিধিদল কুয়েতের পক্ষ থেকে

www.pathagar.com

দু'টি দাবি পেশ করেছিল। ইরাককে নিঃশর্তভাবে কুয়েত থেকে ফিরে যেতে হবে এবং উসমানি খিলাফতের সময় কুয়েতের জনগণ যেমনভাবে সাবাহ পরিবারকে তাদের আমীর নির্বাচিত করেছিল তেমনিভাবে এখনও তাদেরকে আমীর হিসেবে মসনদে বসতে দিতে হবে। ইরাক এবং কুয়েতের এই সমস্যাকে সংলাপের মাধ্যমে সমাধান করে, ইরাকের কুয়েত দখলে কুয়েতের যে ক্ষতি হয়েছে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

কুয়েতের প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠকের পর সৌদি আরবের সাথে সম্পর্কিত কাজগুলো শেষ হয়েছে এই মর্মে কায়সর-ই-মুতাসারাতে একটি সংবাদ সম্মেলন করি। এর কিছু পরই বিশেষ বিমানে করে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে যাই।

আম্মানে পৌছার সময় তখন সেখানে স্থানীয় সময় ছিল ৪ ঘটিকা। দিনের বেলায় আম্মান দেখার সুযোগ পেলাম। বিমানবন্দর ও এর আশপাশের এলাকা ইরাকী শরণার্থীতে ভরপুর ছিল। সেখানে ছিল লম্বা সারি। তাদের হাত ঢাকা ছিল অথবা ছোট কোনো ব্যাগ ছিল এর মাধ্যমেই বুঝা যেত যে তারা কত দ্রুত সময়ে রাস্তায় বের হয়েছে।

আমাদের প্রথম কাজ ছিল ইরাকী দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা। দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ আমাদেরকে জানালেন যে, চারদিন পূর্বে মক্কা যাওয়ার আগে বাগদাদের প্রোগ্রামে আপনাদের অংশ নেয়ার ব্যাপারে যে সব বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেছিলেন আমরা সবগুলোই করেছি।

এই সময়ের মধ্যে মুসলিম কমিউনিটি ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শুক্রবার নতুন একটি মিটিং করার সুযোগ পাই। এই প্রোগ্রামে ইরাক সফরে, ইরাকী কর্মকর্তাদের সাথে কি কথা বলব কিভাবে বলব এবং কোন কোন বিষয়ে পরামর্শ দেব এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিই।

আধুনিক সাজে সজ্জিত বাগদাদ যার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে টাইগ্রিস নদী এবং সবুজ খেজুর গাছ এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে বহুগুণে এমন একটি শহরের উপর দিয়ে পরের দিন বাগদাদ বিমানবন্দরে পৌছলাম। অতিথি রুমে প্রবেশের পূর্বে দেখলাম যে, তিন মাস পূর্বে এই বিমানবন্দরে যে লোক সমাগম ছিল এটার কোনো কমতি নেই। সর্বপ্রথম যেটা দেখে আমি আশ্চর্য হলাম সেটা ছিল এটা। এরপর আমাদেরকেও যারা গ্রহণ করতে এসেছিল তারাও খুবই

www.pathagar.com

প্রফুল্ল এবং উজ্জীবিত। উপসাগরীয় সঙ্কটের কোনো ছাপই তাদের চোখেমুখে ছিল না। উষ্ণ সংবর্ধনার পর আমরা হারুণুর রশিদ হোটেলে আসি। বাগদাদ সম্পর্কে যে সকল খবর প্রকাশিত হচ্ছিল বাস্তবে তার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষের জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, খাবার বা অর্থনৈতিক কোনো সমস্যাই তাদের ছিল না। তাদের চোখে মুখে কোনো প্রকার শঙ্কা ও ভয়ভীতি ছিল না। রাস্তায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এক পরিবেশ বিরাজ করছিল।

বাগদাদের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জনগণের মুখে কোনো প্রকার শঙ্কার ছাপ দেখতে না পেয়ে আমরাও হোটেলে শান্তিতে একটি রাত যাপন করি। এর পরদিন ছিল ২৩ জুলাই রোববার। সেইদিন আমরা সাদ্দাম হোসেনের সাথে দেখা করতাম। আর এই সময় রাতের বেলায় লিবিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট হাফিজ আমিনের সাথে সিরিয়ার বাথ (Baath) পার্টির সভাপতি, সিরিয়া কম্যুনিস্ট পার্টির সভাপতি, সিরিয়া ইখওয়ানুল মুসলিমীনের দুইজন নেতাসহ৫ সদস্যের একটি দল আমাদের সাথে দেখা করতে আপ্রাণ। আমাদেরকে যে তথ্য তারা দিয়েছিলো সে অনুযায়ী, সিরিয়ান জনগণের উপর বড় প্রভাব বিস্তারকারী এই রাজনৈতিক প্রতিনিধি দলকে সাদ্দাম হোসেন সমর্থন করেন এবং বাগদাদে তাদেরকে যে বিল্ডিংটি তিনি দিয়েছেন সেটাতে বসেই তারা তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। সিরিয়ার সাবেক এই সকল শাসকবৃন্দের সাথে মুসলিম কমিউনিটি ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের একটি বৈঠক আহ্বান করি। এই মিটিংয়ের সিরিয়ার প্রতিনিধিগণ মুসলিম কমিউনিটি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমাকে কথা বলতে অনুরোধ করে। আমি প্রায় ১ ঘণ্টা বক্তব্য রাখি। দুনিয়া এবং উপসাগরীয় সঙ্কটের বিষয়াবলীকে ব্যাখ্যা করার পর মানবতা এবং বিভিন্ন দেশের উপর পরিচালিত হত্যাযজ্ঞ এবং শোষণ থেকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।

আর এটা যে কেবলমাত্র ন্যায়ভিত্তিক শাসন পদ্ধতির মাধ্যমেই হতে পারে। এটা তুলে ধরেছিলাম। এই পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম। আমার বক্তব্য শোনার পর সিরিয়ান নেতৃবৃন্দ আমার সাথে কোলাকুলি করে ধন্যবাদ জানান এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য একসাথে কাজ করার ঘোষণা দেন।

আর সেই সময় রাজপ্রাসাদ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন এসে বলেন যে, সাদ্দাম হোসেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। এরপর সাদ্দাম হোসেনের

www.pathagar.com

সাথে তার প্রাসাদে একটি রুমে আলোচনায় বসি। আমাদের এই আলোচনায় সাদ্দাম হোসেন সংক্ষিপ্তভাবে বলেন যে, 'আমরা শান্তি চাই। কিন্তু অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। হযরত মুহম্মদ (সা.)ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাদ্দামের এই কথাগুলো 'ইরাক শান্তির দরজা উন্মুক্ত রাখবে নাকি বন্ধ করে দেবে' এই শঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

উপসাগরীয় শান্তি মিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে দেখা করার পর সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখল এবং একীভূত করার কারণগুলোকে দুটি মূল বিভাগে ভাগ করে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেন। প্রথম বিভাগ ছিল ঐতিহাসিক এবং আইনগত কারণসমূহ। এই সম্পর্কে সাদ্দাম এই কথাগুলো বলেছিলেন, 'ঐতিহাসিকভাবে উসমানীয়দের পতনের পর থেকে কুয়েত সবসময় ইরাকেরই একটি অংশ ছিল। ইরাক থেকে পৃথক হয়ে আলাদা কুয়েত রাষ্ট্র গঠনের মূল পরিকল্পনাকারী ছিল ইংল্যান্ড। পারস্য উপসাগরের একটি বন্দর এবং কুয়েতের সমৃদ্ধ পেট্রোল খনিগুলো যাতে ইরাকের হস্তগত না হয় এজন্য ইংল্যান্ড এই পরিকল্পনা করে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইরাক কখনো কুয়েতকে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেয়নি। ১৯৩০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কুয়েতকে ইরাকের সাথে একীভূত করার লক্ষ্যে আমাদের পূর্বের শাসকগণ অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সর্বশেষে আমাদের আগের শাসন নূরী সাঈদের সময় কুয়েতকে ইরাকের সাথে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং ১৯৫৮ সালের ১৮ আগস্ট অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে ঘোষণা দেয়া হয়। আমাদের জেনারেল কাসিমের নেতৃত্বে ১৪ আগস্ট ১৯৫৮ সালে অর্থাৎ অভিযান পরিচালনা ঘোষণার চারদিন পূর্বে অভিযান পরিচালনা করে কুয়েত দখল করে নেয়া হয়। আমরা উপসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি চাই বলে এবং মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব রক্ষার গুরুত্ব প্রদান করার কারণে এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকি। বরং এর বিপরীতে আমরা দুইটি ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ হিসেবে বসবাস করাকেই শ্রেয় মনে করেছিলাম। এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইরাকের ইতিহাসে কুয়েতের সাথে সবচেয়ে সুন্দর এবং ভালো আচরণ করেছে আমাদের সরকার। হ্যাঁ ১৯৭৫ সালে আলজেরিয়াতে অনুষ্ঠিত ইরাকের সাথে ইরানের সমস্যাগুলোকে সমাধানের লক্ষ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেখানে আমাদের দেশের পক্ষে আমার স্বাক্ষর রয়েছে। এই

www.pathagar.com

চুক্তিতে কুয়েত সম্পর্কিত বিষয়াবলীও স্থান পেয়েছে। কিন্তু আমরা যখন সতর্কতার সাথে এই চুক্তি পর্যবেক্ষণ করি তখন দেখতে পাই যে, কুয়েতের সাথে আমাদের মতপার্থক্যগুলোকে অস্বীকার না করে বরং সমাধানের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। সাদ্দাম কুয়েত দখলের পক্ষে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন:

'আপনারা জানেন যে, ইরাক এবং কুয়েতের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো সীমানা নির্ধারিত হয়নি। বছরের পর বছর ধরে কুয়েত এবং ইরাকের মধ্যকার সংলাপ– একটি অমীমাংসিত এলাকাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অমীমাংসিত এলাকা পারস্য উপসাগরের সুবিয়ান এবং উরবা (Worba) দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত। আর এটা কুয়েতের অর্ধেকের সমান। এই অঞ্চলটি ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় কুয়েতের সাথে বাফার স্টেট হিসেবে ছিল। এই বাফার জোন পেট্রোল খনিতে ভরপুর একটি অঞ্চল। এখানকার পেট্রোল রিজার্ভের পরিমাণ কুয়েতের মোট রিজার্ভের প্রায় অর্ধেক এবং মাটির নিচে এগুলো আমাদের পেট্রোল খনির সাথে সম্পৃক্ত। এখান থেকে পেট্রোল উত্তোলন করা হলে আমাদের খনিগুলো দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আমাদের উৎপাদন কমে যাবে।

ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময়, আমাদের সমস্যা সঙ্কুল অবস্থার সুযোগ নিয়ে, আমেরিকার উৎসাহে, আমাদের অনুমতি ছাড়া এই অঞ্চল থেকে তারা বিপুল পরিমাণের পেট্রোল উত্তোলন করে। যুদ্ধের সময় তারা আমাদের আপত্তিকে উপেক্ষা করতে থাকে। আমরা ইরানের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায়, এই কাজের হিসাব-নিকাশ যুদ্ধের পর করার জন্য রেখে দেই। আমরা আমাদের ক্ষতকে আরোগ্যের জন্য যুদ্ধের পরের সময়টাকে বেছে নিই। যুদ্ধের খরচ বাবদ কুয়েত, সৌদি আরবের কাছ থেকে বড় রকমের ঋণ নেই। এই ঋণের কিস্তি এবং সুদ আমাদের অর্থনীতিতে খুবই সমস্যা সঙ্কুল অবস্থার সৃষ্টি করে। আমাদের উন্নয়নের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা সৌদি আরব ও কুয়েতের কাছে আবেদন করি যে, 'আমরা এই যুদ্ধ আপনাদের জন্যও করেছি। আমাদের এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের পাশে দাঁড়ান। ঋণের একটি অংশকে মওকুফ করে আমাদের উন্নয়নে সাহায্য করুন।' কুয়েত যে অমীমাংসিত এলাকা থেকে বৃহৎ পরিমাণে পেট্রোল উত্তোলন করেছিল আমরা সেখান থেকে আমাদের পাওনা দাবি করি।

www.pathagar.com

আমাদের এই আবেদন সৌদি আরব গ্রহণ করে এবং পূর্ণ করে। কুয়েত শুধু আমাদের এই আবেদনকে ফিরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি বরং আমাদের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগী হয়। আমেরিকার পরামর্শে অমীমাংসিত এলাকা থেকে তেল উত্তোলন অব্যাহত রাখে। OPEC এ তেলের দাম বৃদ্ধিতে বাধা দেয় এবং বিশ্ববাজারে কম মূল্যে তেল রপ্তানি করে তেলের দাম কমাতে বাধ্য করে। কুয়েত এই সকল কাজ করার সময় অন্যদিকে আমেরিকা (USA) আমাদেরকে তার টার্গেটে পরিণত করে। ইরাক-ইরান যুদ্ধের পর আমাদের সেনাবাহিনী আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়, দক্ষ এবং শক্তিশালী একটি বাহিনী হওয়ায় এবং ইসরাইলের হুমকি সত্ত্বেও সেনাবাহিনীকে বিলুপ্ত না করায় আমেরিকা আমাদের সেনাবাহিনীকে ইসরাইলের জন্য একটি হুমকিস্বরূপ বিবেচনা করতে থাকে। অপরদিকে উপসাগরীয় অঞ্চলের পেট্রোলকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারেও শঙ্কাবোধ করতে থাকে।

এজন্য আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলো একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে একের পর এক অবরোধ আরোপ করতে থাকে এবং অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। আমাদেরকে শোষণ করার জন্য তাদের এই পরিকল্পনা আজ সর্বোচ্চ শিখরে এসে পৌঁছেছে। সেই সময় বাগদাদের এক কনফারেন্সে আপনাদের সামনে সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরেছিলাম। আমেরিকার ইয়াহুদিলবীগণ সেইদিন কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে অবহিত করেছিলাম। পরবর্তীতে আরবলীগের সম্মেলনে এবং OIC-র সম্মেলনেও মুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে এসব তুলে ধরেছিলাম। অপরপক্ষে এই দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও আমাদের চাওয়াগুলোকে জোরালোভাবে উত্থাপন করি। সর্বশেষ জেদ্দায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনেও আমেরিকার পরামর্শে কুয়েত আমাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে। এই অবস্থায় কুযেতকে একীভূত করার জন্য দখল করতে বাধ্য হই।

সাদ্দাম তার দীর্ঘ আলোচনায় ঘটনাবলীর সর্বশেষ উন্নয়ন অবস্থা ব্যাখ্যা করেন। তিনি তার কথার সারাংশে আগামী দিনে তার চিন্তার সারসংক্ষেপ হিসেবে বলেন, 'আমরা এই অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা চাই। উপসাগরীয় সঙ্কটের উত্তরণে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষেই আমার অবস্থান। সৌদি আরবকে কোনো প্রকার সমস্যা করার নিয়ত আমাদের নেই। এজন্য আমরা সকল ধরনের

www.pathagar.com

গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত। নিষেধাজ্ঞা এবং অবরোধের বিপরীতে সকল ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। আমরা কখনোই প্রথমে কোনো হামলা করতে চাই না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যদি আমাদের বিপক্ষে কোনো অভিযান চালায় তাহলে আমরা তাদের সমুচিত জবাব দিতে প্রস্তুত। আর এটা করার যথেষ্ট শক্তি আমাদের রয়েছে। এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সৌদি আরব ছাড়তে হবে। সৌদি আরব যদি অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন বোধ করে তাহলে সেটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য নিয়ে নয়, মুসলিম দেশগুলোর সাহায্য নিয়ে করতে পারে।'

সাদ্দামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সর্তকতার সাথে শোনার পর তাকে আমরা প্রশ্ন করতে শুরু করি। প্রথম প্রশ্ন ছিল, 'আপনি কি নিষেধাজ্ঞা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেন?' সাদ্দাম এভাবে তার জবাব দিয়েছিলেন।

'আপনারা এখন ইরাকে আছেন। আপনারা নিজেরাই অবস্থা স্বচক্ষে দেখছেন। ৫০ দিন যাবত সবচেয়ে ভয়াবহ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পরও এই নিষেধাজ্ঞা আমাদেরকে প্রভাবিত করতে পারেনি। সবকিছুই স্বাভাবিক। কারণ আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছি। আমরা মূলত কৃষিভিত্তিক দেশ। আমাদের ভূমি দুনিয়ার সবচেয়ে উর্বর ভূমি। ইতিহাসের বিখ্যাত মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় আমরা বসবাস করি। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সৈনিকদেরকে অব্যাহতি দিয়েছি। পশু পালন এবং কৃষিক্ষেত্রে সহজ শর্তে সর্বোচ্চ ঋণের বন্দোবস্ত করেছি। সামনের বছরগুলোতে আমাদের প্রয়োজন মেটাবে এ পরিমাণ মজুত আমাদের রয়েছে। অপরদিকে এগুলোকে রক্ষা করার জন্যও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। এ জন্য আমরা দীর্ঘস্থায়ী যে কোনো নিষেধাজ্ঞাকে মোকাবিলা করতে পারব। নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তারা আমাদেরকে বাগিয়ে নিতে পারবে না। আমাদের উপর যারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আপনারা তাদের কথা চিন্তা করুন। তারা আমাদের পেট্রোল বিক্রয় এবং রপ্তানিকে বন্ধ করে দিয়েছে তারা এটা মোকাবিলা করতে পারবে কিনা? আমাদের পেট্রোল বিশ্ববাজারে রপ্তানি না হওয়ায় পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক দেশের অর্থনীতি এবং বিশ্বস্টক মার্কেট আজ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। অপরদিকে আমাদের কাছে মাল বিক্রি না করা অনেক কোম্পানি এবং দেশ বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা উত্তোলনের জন্য তারা আমাদের চেয়ে বেশি প্রচেষ্টা চালাবে। আমাদের বাগদাদ থেকে

www.pathagar.com

বসরা পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা খেজুর বাগানে ভরপুর। বাৎসরিক খেজুর উৎপাদন ২.৭ মিলিয়ন টন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এটা প্রমাণিত যে, খেজুর মানুষের শরীরের সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট। এ জন্য প্রয়োজন হলে ইরাকীগণ বছরের পর বছর ধরে খেজুর খেয়েই বেঁচে থাকতে পারবে।'

জনাব সাদ্দাম হোসেনের সাথে দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা বৈঠকের পর রাজপ্রাসাদ থেকে নতুন সূচনার একটি স্বপ্ন নিয়ে ফিরে আসি। কারণ আমাদের এই বৈঠকে সাদ্দাম হোসেন শান্তির দরজাকে বন্ধ করেননি। সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে তিনি বলেছেন যে, 'আমরা শান্তি চাই'। অন্যদিকে উপসাগরে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের পূর্বে জাতিসংঘের মহাসচিব পেরেজ ডি কুয়েলার (Periez De Ceullar) ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারিক আযিযের সাথে মস্কোতে সাক্ষাৎ করেন। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড সেভার্ডনাডজে তাদের এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'কুয়েত ইরাকের সাথে একীভূত হয়েছে এবং কুযেত ইরাকের ১৯তম প্রদেশ। এই বিষয়টি সমাপ্ত হয়েছে। আমরা এরপর আর কোনো সাক্ষাৎ করতে পারব না।' কিন্তু আমাদের সাথে দীর্ঘ সাক্ষাতে সাদ্দাম হোসেন এমন কোনো কথাই বলেননি।

এই সাক্ষাতের পর, ২৪ জুলাই লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলীতে যাই। মুসলিম দেশ থেকে আগত ৬০০র মতো বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করি। এখানে বক্তব্য প্রদান কালে আমি উপসাগরীয় সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপকারিতাগুলো উল্লেখ করি।

আমার বক্তৃতার সবচেয়ে বড় উপকার হয় কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীগণ কোনো প্রকার পক্ষ নেওয়ার পরিবর্তে, মুসলিমরা ভাই ভাই এই চেতনাবোধে জাগ্রত হয়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সঙ্কট সমাধানের পক্ষে সকলেই ঐকমত পোষণ করে।

এই অঞ্চলে আমরা এত নিবিড়ভাবে কার্য পরিচালনার পর দুঃখজনক হলেও সত্য তুরস্ক উপসাগরীয় সঙ্কটের সময় একটি ভুল পথ অবলম্বন করে। ইরাক-ইরান ৮ বছরব্যাপী যুদ্ধের সময় ইরাক তুরস্কের কাছ থেকে ২ বিলিয়ন ডলার ঋণ নেয়। উপসাগরীয় সঙ্কটের শুরুতেই ইরাক ঘোষণা করে যে, তারা বিনা ফিতে বাৎসরিক ১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পেট্রোল তুরস্ককে দেবে। তুরস্ক

www.pathagar.com

আমেরিকার (USA) প্রভাবে ইরাকের এই সর্বোচ্চ আকর্ষণীয় অফারকে প্রত্যাখ্যান করে। বিনা ফিতে যে পেট্রোল নিতে পারত দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরবর্তীতে তাদের সেটা দ্বিগুণ দামে এবং ফি দিয়ে নগদ ক্রয় করার জন্য চেষ্টা চালাতে হয়েছে। এই ভুল পদ্ধতির কারণে আমাদের দেশে জ্বালানি সঙ্কটের পাশাপাশি জ্বালানির দাম বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

এছাড়াও তেলের পাইপলাইনগুলো তুরস্কের পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়। এজন্য আমাদের দেশ বাৎসরিক ৫০০ মিলিয়ন ডলারের উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে ইরাকের সাথে সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হয়। ইরাকের সাথে সকল ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এ জন্য তুরস্ক ৮০০ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় থেকে বঞ্চিত হয়। ইরাকে তুর্কিশ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তুরস্ক বাৎসরিক ৫০০ মিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স থেকে বঞ্চিত হয়। যুদ্ধের পর তুরস্ক ইরাককে অবকাঠামোগতভাবে সাহায্য করলে ইরাক ও তুরস্ক উভয় দেশই লাভবান হতো এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পেত।

আমার এই বর্ণনা থেকে আমাদের দেশের প্রকাশ্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে এটা ধারণা পাওয়া যাবে। এসব সিদ্ধান্তের কারণে আমরা নাগরিক জীবনে এবং অর্থনৈতিকভাবে আরও বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হই। এভাবে এসব সিদ্ধান্তের কারণে, দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়ান এলাকার পরিবহন খাত এবং এর সাথে সম্পর্কিত ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। ৯ ট্রিলিয়ন লিরা মূল্যের যানবাহন এবং ৩০ হাজার পরিবহন চালক বেকার হয়ে পড়ে। পরিবহন বন্ধ হওয়ায় সে এলাকার রেস্টুরেন্ট, হোটেল, দোকানপাট বন্ধ হয়ে পড়ে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো তুরস্কের সরকার কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ না নিয়ে, আমেরিকার নিষেধাজ্ঞায় শরিক হয়। এভাবে তারা দরকষাকষি থেকে বঞ্চিত হয়। এমনকি পরবর্তীতেও আমেরিকাতে গিয়ে এই ক্ষতি পূরণের কোনো ব্যবস্থা করতে পারেনি।

তুরস্কের কূটনীতি আমেরিকা ও ইসরাইলের প্রতি এতোটাই নতজানু হয়ে পড়েছিল যে, তাদের কোনো প্রকার কৌশল গ্রহণের মানসিক শক্তিও ছিল না। নিজেকে পূর্বেই এমন একটি অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার পর কারো কাছ থেকে কোনো প্রকার সহযোগিতাও পাচ্ছিল না। অপরদিকে উপসাগরীয় দেশগুলোও

www.pathagar.com

আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের সেনাবাহিনীর বিশাল ব্যয়ভার বহন করে যাচ্ছিল। এই শর্তগুলোকে তুরস্ক যুক্ত না হলে তাদের পক্ষে কোনো কিছুই করা সম্ভবপর ছিল না।

উপসাগরে আসা সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার ছিল আকাশচুম্বী। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ৫ হাজার সৈন্যের বার্ষিক ব্যয়ভার ধরা হয়েছিল ২ বিলিয়ন ডলার। তাহলে উপসাগরে আসা ৩ লাখ সৈন্যের ব্যয় কত হয়েছিল সেটা অনুমান করা যায়। এই বিশাল অংকের ব্যয় উপসাগরীয় দেশগুলোকে বছরের পর বছর ধরে পরিশোধ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আমেরিকার নির্দেশে কোরিয়ান যুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণের কারণেই মূলত আমাদেরকে NATO'র সদস্যভুক্ত করা হচ্ছে না। তুরস্কের বৈদেশিক নীতি তাদের সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে। আমেরিকার নির্দেশে পুনরায় উপসাগরীয় সঙ্কটে তুরস্ক সেনাবাহিনী প্রেরণ করে এবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। মূলত এটাই ছিল হিসাব। হায়রে! এই স্বপ্ন সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনায় সাহায্যকারী হওয়া ব্যতীত মূলত আর কোনো অর্থ বহন করে না। বৃহৎ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা হিউডর হেরজেল করেছিল মূলত এটা বাস্তবায়নে সাহায্য করা ছাড়া আর কোনো অর্থ ছিল না। মূলত আমেরিকার সিনেটে প্রস্তাব পাস হয়েছিল যে, ইরাককে কুয়েত দখলে উদ্বুদ্ধ করা যা পরবর্তীতে প্রকাশ পেয়ে যায়। বাগদাদে আমেরিকার মহিলা রাষ্ট্রদূত ইরাকী কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন যে, 'আপনারা কেন কুয়েত দখল করছেন না?' এ কথা বলে তারা সবুজ সংকেত দিয়েছিল। একইভাবে আমেরিকার পরিচালকরা কুয়েতি কর্তৃপক্ষকে এ কথা বলে চুক্তি করেছিল যে, 'ইরাকের অনুরোধকে কখনোই গ্রহণ করবেন না, আপনাদের পেছনে আমরা আছি।'

এই বিষয়টিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করার জন্য ২২ দিন ২২ রাত প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কনফারেন্সে, মিটিংয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সর্বদা এই সমস্যাকে কিভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে কথা বলেছিল। এতো বেশি দেশ, শহরে ছুটে বেড়িয়েছি, এত বেশি জায়গায় অবস্থান করতে হয়েছে যে, মাঝেমধ্যে রাতে ঘুমানোর সময় কোন হোটেলে কোথায় ঘুমাচ্ছি এটা চিন্তা করে বের করতে হতো।

www.pathagar.com

এই যোগাযোগের সময় আরবি ভাষায় আজমাতুল হালিচ (উপসাগরীয় সঙ্কট) এই শব্দটা এত বেশি শুনেছি যে, তুরস্কে ফিরে আসার পর দিনের পর দিন তা কানে বাজত।

হায়রে হায়... খুবই লজ্জাজনক। সঙ্কটের দুই পক্ষ ইরাক এবং কুয়েতের কর্তৃপক্ষের অন্তর্দৃষ্টি এবং জ্ঞানের পরিধিকে শাণিত করতে, তাদের আকাঙ্ক্ষা এর অহমিকাকে কমাত, পূর্ণ চিত্রকে তাদের দেখানোর জন্য, আমাদের করা সতর্কবাণীগুলোর গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য বুঝাতে গিয়ে ইয়াহুদিবাদীদের কাজগুলোকে সহজ করে দিয়েছিল। ইয়াহুদিবাদের পুতুল আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের মিলিত শক্তি তাদের সকল ভারি অস্ত্র ইরাকের উপর প্রয়োগ করেছিল। দিনের পর দিন বিমান হামলা করে তারা ইরাকে ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছিল। স্থলবাহিনীর হামলায় সাদ্দামের স্থল বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

সামরিক-বেসামরিক কোনো প্রকার পার্থক্য ব্যতিরেকে হাজার হাজার বিমান হামলা চালিয়েছিল। বসরা এবং বাগদাদকে বোমারু বিমান দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের সবচেয়ে বড় দুশমন ইরাককে পর্যুদস্ত করে এমন অবস্থায় পতিত করেছিল যে, ইরাক নিজেকে রক্ষা করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিল। কুয়েতে একজন ইরাকি সৈন্যও অবশিষ্ট ছিল না। সবাইকে বের করে দিয়েছিল কিন্তু ইরাকে ফেরার সুযোগও দেওয়া হয়নি। পলায়নকৃত সকল ইরাকি বাহিনীকে বন্য পশুর মতো আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিয়েছিল। স্থলপথের হাজার হাজার সামরিক ট্রাক, ট্যাঙ্ক, জিপ সবকিছুকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল। ইরাকি সেনাবাহিনীকে রীতিমতো পঙ্গু করার পর যুদ্ধ শেষ হয়।

মুসলিম দেশগুলো যখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে উপসাগরীয় সঙ্কট সমাধানের চেষ্টা করছিল তখন তারা এটা আঁচ করতে পেরেছিল যে, শান্তিপূর্ণ সমাধান না হলে এর পরিণতি কি হতে পারে। মুসলিম দেশগুলো আজ পুড়ে ছারখার হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। ভূমধ্যসাগরের আশপাশের মুসলিম দেশগুলো আজ সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণে, তুরস্ক এবং ইরানকেও টার্গেট করে চারপাশ থেকে পরিবেষ্টিত করে রাখা হয়েছে। ইয়াহুদিদের (Zionist) কুঠার আজ উপরে উঠেছে; এটা কখন যে, আঘাত হানবে সে জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

www.pathagar.com

অথচ ইরাক, ইরানের সাথে যেমনিভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করেছিল যদি একইভাবে সহজ শর্তে কুয়েত থেকে ফিরে আসত এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের ঘোষণা দিত তাহলে কি হত? আক্রমণকারীদের হাত থেকে সবচেয়ে বড় হাতিয়ারটি ছিনিয়ে আনতে পারত। ইরাকের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছিল যে, ইরাক নিজের দেশ এবং অন্য দেশের উপর জুলুম করছে, 'ইসরাইল নয়, মুসলিম দেশের সাথে লড়াই করছে' এই প্রগাগান্ডা থেকে মুক্তি পেত। আমেরিকার হাত থেকে কুয়েত কার্ডটিকে ছিনিয়ে আনতে পারত। ইরাক এবং অন্য মুসলিম দেশগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেত। ইরাক তার সামরিক শক্তিকে আরও বহুগুণে বৃদ্ধি করতে পারত।

এই অঞ্চলে পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর বদলে, যুদ্ধ নয় শান্তির জন্য 'মুসলিম শান্তি বাহিনী' গঠনের একটি প্রস্তুতি পর্ব শেষ হতো। উদ্যোগগুলো মুসলিম দেশগুলোর হাতে থাকত। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতো। ইরাক উন্নতি-অগ্রগতির দিকে পা বাড়াতে পারত। মুসলিম দেশগুলো নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করতে পারত। মুসলিম দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতো।

আমেরিকা ইয়াহুদিদের কারখানা থেকে অস্ত্র কেনার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারত। আমাদের সকল প্রচেষ্টা এবং সংগ্রাম শুধুমাত্র তুরস্কের জন্য ছিল না। মুসলিম বিশ্বকে এবং সমগ্র মানবতাকে ইহুদীদের জুলুম থেকে রক্ষা করার জন্যই ছিল। এ জন্য আমরা এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, 'যদিও তাদের চক্রান্তগুলো এমন পর্যায়ের ছিল যাতে পাহাড় টলে যেত।' তারা যত শক্তিশালী হোক না কেন, সকল শক্তি এবং ক্ষমতার মালিক হলেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

পাহাড় যেমন ভরের/ওজনের প্রতীক একই সাথে কঠিনতারও প্রতীক। শক্তি দিয়ে এটাকে সরিয়ে ফেলা অসম্ভব এবং অবাস্তব কথার নামান্তর। কিন্তু তারা যদি এমন শক্তিরও অধিকারী হয় তবুও আল্লাহতায়ালার শক্তি ও ক্ষমতার কাছে তাদের সকল চতুরতা কিছুই নয়। আল্লাহ্ সকল কিছুর পাশেই হাজির নাজির আছেন এবং তিনি যা বলবেন সেটাই হবে।

www.pathagar.com

শোষকশ্রেণীর এই সকল ষড়যন্ত্র এবং পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত সাফল্যে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ্ চাইলে জালিমদেরকে শক্তিশালী থাকা অবস্থায়ও নিঃশেষ করে দিতে পারে। কারণ 'আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হলেন অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং ইনতিকামের অধিকারী।'

আল্লাহ্ যালিমকে কখনো ছেড়ে দেন না। ষড়যন্ত্রকারীগণ নিজেদেরকে কখনো রক্ষা করতে পারে না। এখানে ইনতিকাম শব্দটি 'জুলুম' এবং 'ষড়যন্ত্রকারী' শব্দ দু'টির যথোপযুক্ত অর্থ প্রদান করে থাকে। এই অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারী জালিমগণ নিজেদেরকে ইনতিকামের (প্রতিশোধের) যোগ্য/ অধিকারী বানিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ্ তায়ালার ভাষ্য মতে, ষড়যন্ত্র এবং জুলুমের বিনিময়ে রয়েছে ভয়াবহ আযাব। কেননা শুধুমাত্র শাস্তির মাধ্যমেই ইলাহী আদালত পূর্ণতা লাভ করে।

আমাদের কাজ হলো প্রচেষ্টা চালানো। তারা যেমনিভাবে দুই হাজার বছর ধরে বাতিলকে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে আমাদেরকেও তাদের চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে, জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে, পৃথিবীর সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্য জানমাল দিয়ে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

www.pathagar.com

সাইপ্রাস শান্তি মিশন

আমাদের সামনে পৃথিবীর একটি মানচিত্র নিয়ে আমরা যখন তাকাই তখন দেখতে পাই যে, আমাদের তুরস্ক এবং প্রতিবেশী দেশ সাইপ্রাস দুনিয়ার সম্পূর্ণ মাঝখানে অবস্থিত। এজন্য সাইপ্রাস নামক দ্বীপটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কৌশলগতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। মুসলমানগণ সর্বপ্রথম উমাইয়াদের আমলে সাইপ্রাস দখলে আনে। হযরত উসমান (রা.)-এর সময় থেকে মুসলমানগণ এখানে বসবাস করে আসছে। সেই সময় থেকেই তারা এই দ্বীপের গুরুত্ব অনুধাবন করে আসছিল। আমরা জানি যে, হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর মুহতারেমা খালাদের মধ্যে উম্মে হারাম (রা.)-এর কবর লারনাকা শহরে অবস্থিত। এজন্য আমরা আমাদের শান্তি মিশন লারনাকা পর্যন্ত দীর্ঘ করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলাম। মুসলিম বিশ্বের সাথে ঐতিহাসিকভাবে এর সম্পৃক্ততা এবং মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে এর অবস্থান হওয়ায় কৌশলগতভাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। সাইপ্রাস মুসলিম দেশগুলোর মাঝে অবস্থিত একটি দ্বীপ।

১৩শ' শতাব্দীর শেষের দিকে ক্যাথলিক জেনসি (Catholic genoese)'রা এখানে আগমন করে। তাদের পরই আগমন করে ভেনেটিয়ানসগণ। কারণ ১৪শ' ১৫শ' এবং ১৬শ' শতাব্দীতে নৌ শক্তিতে তারা পারদর্শিতা অর্জন করে এবং সমগ্র ভূমধ্যসাগরকে তারা তাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার প্রচেষ্টা চালায়। সাইপ্রাসে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে তারা সমগ্র ভূমধ্যসাগরে প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে। সাইপ্রাসে বসবাসরত অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের উপর ক্যাথলিকরা ৩০০ বছর চরম জুলুম-নির্যাতন পরিচালনা করে।

এই অবস্থায় উসমানীয়গণ খুবই অস্বস্তি অনুভব করেন। সমগ্র দুনিয়ায় হক ও আদালত প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ উসমানীগণ নিজেদের অঞ্চলে এই জুলুম নির্যাতনকে সহ্য করতে পারেনি। ভূমধ্যসাগরে দস্যুতা, হজ্জযাত্রী এবং বণিকদের পথ রুদ্ধ করায় উসমানীয় রাষ্ট্র ১৫৭০ সালে লাল মুস্তাফা পাসার সেনাপতিত্বে ৪০ হাজার শহীদের বিনিময়ে সাইপ্রাসকে জালিমদের হাত থেকে মুক্ত করে। সাইপ্রাস উসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি অংশে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

ভূমধ্যসাগর এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরে আসে। এই দ্বীপে ৩০৮ বছর অর্থোডক্সসহ সকলেই শান্তিতে বসবাস করেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর ইয়াহুদিগণ তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিকে (Promised Land) ফিরে পাওয়ার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। উসমানীয় রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন বাহানা সৃষ্টি করতে থাকে। বিভিন্ন যুদ্ধ সংঘটিত করে। এসব যুদ্ধের প্রাক্কালে উসমানীয় রাষ্ট্র সমগ্র দুনিয়ার সাথে যুদ্ধরত থাকায়, সাইপ্রাসের শাসন কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব উসমানী রাষ্ট্রের অধীন থাকবে এই শর্তে ১৮৭৮ সালে সাইপ্রাসকে ইংল্যান্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

কিন্তু তারা উসমানীয় রাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগে, দ্বীপের জনসংখ্যার কাঠামো পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালায়। যেমনিভাবে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বনী ইসরাইল জাতিকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ফিলিস্তিনে একত্রিত করেছিল, তেমনিভাবে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা রোমকদেরকে সাইপ্রাসে একত্রিত করতে থাকে। এই দ্বীপে রোমকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করার পর তুর্কিশ বংশোদ্ভূত এবং সেখানে বসবাসরত অন্যান্য বংশোদ্ভূত মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের সংঘাত সৃষ্টি করে মুসলমানদের উপর গণহত্যা পরিচালনা করতে থাকে।

১৯৬০ সালে তারা মিশ্র একটি প্রজাতন্ত্র গঠন করে। ১৯৬৩ সালে পুনরায় তারা গণহত্যা পরিচালনা করে। অনুরূপভাবে ১৯৬৭ সালেও মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালায়। ১৯৭৪ সালে সাইপ্রাসে সাকারসের বিরুদ্ধে ক্যু করে এসকার (Eska) নেতা সেম্পসন এই দ্বীপকে গ্রিসের সাথে অন্তর্ভুক্তকরণের ঘোষণা দেয়। দ্বীপে পুনরায় গণহত্যা শুরু হয়।

১৯৭৪ সালে আমরা কোয়ালিশনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর সাইপ্রাসকে একটি অশান্ত ও হত্যাযজ্ঞের নগরী হিসেবে দেখতে পাই। আমাদের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইসমেত ইননু। সাইপ্রাসে বড় ধরনের গণহত্যা পরিচালনা করা হয়। তিনি শুধু এর উপর দিয়ে কিছু টহল বিমান পাঠান। সেগুলো টহল দিয়েই ফিরে আসে। এই গণহত্যার বিরুদ্ধে তিনি কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। রক্তের বন্যায় যখন সাইপ্রাসভেসে যাচ্ছিল তখন তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। তার পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী হন সোলায়মান

www.pathagar.com

ডেমিরেল। তিনি টহল বিমান পর্যন্ত পাঠাননি। কিন্তু ১৯৭৪ সালে মিল্লি গরুশ কোয়ালিশনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়। গণহত্যা শুরু করার প্রাক্কালে সত্য এবং ন্যায়ের পতাকাবাহী মিল্লি গরুশের থাবা সেম্পসনের ঘাড় মটকে দেয়। সাইপ্রাসের বীর মুজাহিদগণ এবং আমাদের বীর সেনাবাহিনী যুদ্ধের সর্বোচ্চ উপমা সৃষ্টি করে সমগ্র দুনিয়াবাসীকে চমকে দেয়। কারণ সাইপ্রাস যুদ্ধ স্থল, নৌ, বিমানবাহিনীর সমন্বয়ে পরিচালিত একটি যুদ্ধ ছিল। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত সাইপ্রাসে আর কোনো রক্তপাত হয়নি। দ্বীপে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

দুর্ভাগ্যবশত, বৈদেশিক শক্তিগুলো এই দ্বীপটিকে ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করতে চায়। সাইপ্রাসকে নিয়ে ইয়াহুদিদের লক্ষ্য হলো Turkish Republic of Northern Cyprus কে বিলুপ্ত করে মুসলমানদেরকে সেখান থেকে বের করে দিয়ে সাইপ্রাসকে সম্পূর্ণরূপে মুসলিম দেশ থেকে পৃথক করে ফেলা। এভাবে সাইপ্রাসের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমেরিকান ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ইসরাইল যতই শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র হোক না কেন ১৫০ কোটি মুসলমানের মধ্যে তার অবস্থান হওয়ায় সর্বদা একটি ভীতিকর অবস্থায় থাকে। একদিন এরা একত্রিত হয়ে আমাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করবে এই ভয়ে তারা অস্থির। এজন্য এর নিরাপত্তার জন্য তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করে থাকে। এই কারণেই তারা সাইপ্রাসকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

বিগত ত্রিশ বছর ধরে সাইপ্রাস, সাইপ্রাস, সাইপ্রাস বলে জিকির করার মূল কারণ এটাই। কারপাজ উপ-দ্বীপের মাধ্যমে সাইপ্রাস তুরস্ক পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। এটি তুরস্কের অতি নিকটস্থ একটি দ্বীপ। আল্লাহ্ না করুন এই দ্বীপটি যদি শত্রুদের হস্তগত হয় তাহলে সেখানকার বিমানঘাঁটি থেকে আনাতোলিয়ার যে কোনো স্থানে তারা খুব দ্রুত এবং সহজেই আক্রমণ করতে পারবে। এমনকি, এখান থেকে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে আনাতোলিয়ার বিভিন্ন অংশকে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করা সম্ভব। সাইপ্রাস, ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে ভাসমান একটি নৌবহরের আকৃতির মতো। যে এটাকে হস্তগত করতে পারবে সেই মূলত ভূমধ্যসাগরের কর্তৃত্ব দখল করতে পারবে। এজন্য এটা তুরস্কের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের সাথে সম্পৃক্ত। সাইপ্রাস তুরস্কের

www.pathagar.com

অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। সাইপ্রাস মানে হলো তুরস্ক। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তিশৃঙ্খলা, মুসলিম দুনিয়ার শান্তি এবং তুরস্কের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সাইপ্রাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা এসব বিষয়কে মাথায় রেখেই 'সাইপ্রাস শান্তি মিশন' পরিচালনা করেছিলাম। গণহত্যা বন্ধের সাথে সাথে তুরস্কের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করেছি।

উসমানীয়গণ কার্লোউইটজ চুক্তির পর থেকে ভূমি হারানো শুরু করে। এর দীর্ঘ ৩০০ বছর পর সাইপ্রাস শান্তি মিশনের মাধ্যমে সাইপ্রাস দখল সবচেয়ে বড় কৌশলগত বিজয়। যারা আজকে পাশ্চাত্যের চাপে সাইপ্রাস বিষয়ে আপস করার চিন্তা করে তারা ইতিহাসের এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারবে না। 'সাইপ্রাস শান্তি মিশনের' সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হয়েছিল? প্রজাতন্ত্র গঠনের পর তুরস্কের সেনাবাহিনী সর্বপ্রথম দেশের বাইরে বের হয়ে কিভাবে এই বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল? ১৯৭৪ সালে এই শান্তি মিশন কিভাবে শুরু হয়েছিল, বিস্তারিতভাবে জানার মাধ্যমে আমরা উপকৃত হতে পারব।

এজেবিদ ইংল্যান্ডে যাবে। ইংল্যান্ড কি বলবে সেটার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এজেবিদ আফিয়নে থাকা অবস্থায় আমাদের এক নির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নেই যে, 'অবশ্যই হামলা করা জরুরি'। CHP র (এজেবিদের দল) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এ কথা বলেন যে, 'এটা একটা দুঃসাহসী কাজ হবে। সাবধান! এমন কোনো কাজ করবেন না। এর অর্থ হবে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।' এজন্য না মন্ত্রিপরিষদে, না জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হই। এজন্য তাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বসে থেকে সময় নষ্ট না করে বিমানবন্দরে বসেই সেনাবাহিনীকে নির্দেশনা দেই যে, 'প্রস্তুতি নিয়ে অভিযান শুরু করুন'।

আমরা 'মিল্লি সালামেত পার্টি' হিসেবে শুরুতে এজেবিদের ইংল্যান্ডে যাওয়ার বিষয়টি সমীচীন মনে করিনি। আমাদেরকে শুধু তারা সময়ক্ষেপণ করাত এবং গড়িমসি করত। ইংল্যান্ডের সাথে কোনো প্রকার মিলিত অভিযান পরোক্ষভাবে মূলত গ্রিসের পক্ষেই যেত। তুরস্ক সাইপ্রাসের জামিনদার রাষ্ট্র ছিল। জামিনদার রাষ্ট্র হিসেবে অভিযান পরিচালনার অধিকার আমাদের ছিল। প্রধানমন্ত্রী এজেবিদ, লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর বিভিন্ন বাহিনী প্রধানের সাথে বিমানবন্দরে দেখা করি। স্যাম্পসন দ্বীপে ক্যু করেছি কিন্তু সাথে সাথে

www.pathagar.com

তাকে সবাই গ্রহণ করেনি। মাকারইসের বাহিনীর সাথে বিভিন্ন জায়গায় তাদের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। তাই আমরা এই বিশৃঙ্খলা থেকে লাভবান হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করি। বাহিনীর প্রধানগণ বলেন যে, 'আমাদের নিশ্চিত একটি আদেশ প্রয়োজন। কারণ আমাদের সেনাবাহিনী ২ বার হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। আমাদেরকে বলেছিল, 'আপনার জাহাজ প্রস্তুত করুন'। আমরা প্রস্তুতি নিয়ে অভিযান শুরু করেছিলাম। এরপর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জনসনের চিঠি পাওয়ার পর আমাদেরকে বলেছিল 'না, ফিরে আসুন!' আমাদের সৈন্য সামন্তকে ইসকেনজেবিয়াতে নামাতে বাধ্য হই। এভাবে ফিরে আসার পর জনাব ডেমিরেলের পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার বলা হয় যে, 'জাহাজ প্রস্তুত করুন'। আমরা প্রস্তুতি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বারও আমাদেরকে ফিরে আসতে হয়েছে। আজকে আপনি আমাদেরকে প্রস্তুতি নিয়ে অভিযান পরিচালনা করার জন্য বলছেন এবং যদি আমাদেরকে ফিরে আসতে বলেন তাহলে কিন্তু আমরা এই সেনাবাহিনীকে কোনো সময়ই আর সত্যিকারের কোনো অভিযান পরিচালনা করার ব্যাপারে বিশ্বাস করাতে পারব না। এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে আপনার সিদ্ধান্ত প্রদান করুন।'

সেই সময় আমি তাদেরকে এই প্রশ্নটি করেছিলাম, 'এখনই আপনারা ধরে নিন যে, আমি আপনাদেরকে সরকারিভাবে নির্দেশ প্রদান করলাম। কত দ্রুত সময়ের মধ্যে আপনারা সাইপ্রাসের কিরেনিয়া অভিমুখে যাত্রা করতে পারবেন?

তারা বললেন যে, 'আমাদের একদল সেনাবাহিনী ইসকেনদেবিয়াতে, কমান্ডোর একটি গ্রুপ নিয়ে সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দ্বীপে পৌঁছাতে খুব তাড়াতাড়ি হলে সোমবার সকাল পর্যন্ত লাগতে পারে।'

এজেবিদ লন্ডন থেকে ফিরে আসতে আসতেই যুদ্ধ জাহাজগুলো প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এর পরের দিন সকালে বন্দর থেকে ছেড়ে যাবে এমন প্রস্তুতিতে উপনীত হয়েছিলাম। এর আগে দুই বার যেমন ফিরে আসতে হয়েছিল এবারও যাতে এমন না হয়। এজন্য সেনাপ্রধান ও অন্যান্য বাহিনীর প্রধানদেরকে নিয়ে এজেবিদকে রাজি করানোর ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলাম। তুরস্কে কি করা হয়েছে এ সম্পর্কে আমরা তাকে বিস্তারিত বুঝিয়েছি এবং সর্বশেষ তাকে বলেছিলাম যে, 'জাহাজ যাত্রা করতে প্রস্তুত, সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ অবস্থায় ফিরে আসা অসম্ভব।

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর সদস্যগণ বলছে যে, যদি এবার ফিরে আসি তাহলে আর কখনো সাইপ্রাস অভিযানে আমরা বের হব না।' এজেবিদ তিন বাহিনীর প্রধানগণকে প্রশ্ন করলেন যে, 'যদি যুদ্ধ শুরু করি তাহলে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য আমাদের আছে কি? এমন প্রশ্নের জবাবে আমাদের নৌবাহিনীর প্রধান বললেন যে, 'আমি কৃষ্ণসাগরের সন্তান একটি নৌকা দিয়েও আমি সেখানে যেতে পারব।' তার এই কথা খুবই আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে সেমিহ সানজারসহ অন্যান্য প্রধানগণও জোর দিয়ে বললেন যে, অবশ্যই এই অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন।'

এই অবস্থায় অনেক রাজনীতিবিদ ও সংশয়বাদীগণ খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো। যেমন তারা এমন কথা বলতেও দ্বিধা করেনি যে, 'আমেরিকার লিখিত অনুমতি ব্যতীত এমন কাজ করা উচিত হবে না।' এমন পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়েছিল।

অবশ্যই পাশ্চাত্যও এক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিনজারের সহকারী জোসেফ সিসকো দ্রুত সময়ের মধ্যে এথেন্সে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এর পরপরই তুরস্কে এসেছিলো। ফেরার সময় এজেবিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলো। একদিন জাতিসংঘ বিকেল ৫টায় যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব পাস করে। সিসকেও সে সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে এবং আমেরিকার আদেশ জানিয়ে ফেরার সময় এজেবিদকে বলেন যে, 'যুদ্ধ বিরতি করুন, যেখানে আছেন সেখানেই থামুন, আর একটুও সামনে অগ্রসর হবেন না।' এজেবিদ এরপর মন্ত্রিসভার বৈঠক আহ্বান করেন।

আমি মন্ত্রিসভার বৈঠকে বললাম যে, 'ইসরাইল আজ পর্যন্ত জাতিসংঘের কোন্ প্রস্তাবকে মেনে নিয়েছে? জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেই যে তুরস্ককে সেটা মেনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। দেশ ও জাতির অস্তিত্বের প্রশ্নে এই প্রস্তাবকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনার কোনো যৌক্তিকতা নেই।' জনাব এজেবিদ এতে একমত পোষণ করেন। এমনকি তিনি মিল্লি সালামেত পার্টিকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, 'আপনাদেরকে ধন্যবাদ, আপনারা আমাদেরকে একটি ভুল থেকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু যুদ্ধ বিরতি বিতর্ক এখানেই শেষ হয়নি। পরদিন সকালে আবার মন্ত্রিসভার বৈঠক আহ্বান করা হয়। সকালে মন্ত্রিসভার বৈঠকে CHP (Republican People's Party)-র মন্ত্রীদের একাংশ চুপ ছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু অপর একটি অংশ আমাদের মিল্লি সালামেতের নেতা-কর্মীদের টিপ্পনি কেটে বলছিল যে, আমাদের রাডার কাজ করছে না, ক্ষেপণাস্ত্রগুলোও ভালোভাবে কাজ করছে না। 'দেখছেন তো এখন কি হবে?'

তখন আমরা তাদের জবাবে বলেছিলাম যে, 'আপনারা যে তথ্য-উপাত্ত দিচ্ছেন সেটা আমরা বিশ্বাস করি না। সেনাবাহিনীর কি অবস্থা আমরা তাদের মুখ থেকেই শুনব।' আর সেই সময় পরিকল্পনা সংস্থার প্রধান নেজদেত উরু পাশা অপর একজন জেনারেলের সাথে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এসে উপস্থিত হন। অভিযান সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে ব্রিফিং করলেন। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম যে, 'তাশুজুর রাডার নাকি নষ্ট এটা কি সঠিক?' তিনি বললেন, 'না তো কে বলছে।' এ কথা বলে তিনি উত্তর দিলেন। 'আমাদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো নাকি উৎক্ষেপণ হচ্ছে না সঠিক নাকি?' এই প্রশ্ন করার পর তিনি উত্তরে বললেন যে, এ রকম আরও ৫টি অভিযান পরিচালনা করার মতো ক্ষেপণাস্ত্র আমাদের কাছে মজুত আছে।'

বৈঠক চলছিল। উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি চেয়েছিলাম যে, এই অভিযান তার লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে এবং আমরা এটা পারব এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতাম। এজন্য আমি বৈঠকের শেষ পর্যায়ে সেনা কর্মকর্তাদের কাছে এই প্রশ্ন করলাম যে, আপনারা এখন যে অবস্থায় অর্থাৎ জি-৫ লাইনে অবস্থান করছেন, এই অবস্থায় কি আমরা আমাদের রফা করতে পারব?'

সেনা কর্মকর্তাগণ সেদিন এই জবাব দিয়েছিলেন, 'আমরা সেখানে যে সেনাদল পাঠিয়েছি সেটাকে এই বাগানের মতো একটি জায়গায় জড়ো করে রাখতে পারব না। এখানে অবস্থান করা সম্ভব নয়। এভাবে যদি আমরা জড় হয়ে থাকি তাহলে এতো বোমা বৃষ্টিতে আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। আমরা একটি যুদ্ধাবস্থায় আছি। আর সেনাবাহিনীর দিক থেকে এমন জায়গায় অবস্থান সম্ভব নয়।'

আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এভাবে সেদিন আমরা দ্বিতীয়বারের মতো যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে বাধা দিই। এরপর এজেবিদ সিসকোর সাথে দেখা করে বলেন যে, লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত অভিযান চলবে। কিন্তু কাজ এখানেই শেষ হয়নি। দ্বিতীয় দিন রাতে, পুনরায় তারা যদ্ধ বিরতির জন্য আসে। তারা বলে যে, 'দেখুন সমগ্র দুনিয়াকে আমাদের প্রতিপক্ষ বানাচ্ছি।' আমি তাদের

www.pathagar.com

উত্তরে বললাম যে, আমরা দুনিয়ার অবস্থা নয়, আমাদের সেনবাহিনীর অবস্থা দেখব। আমাদের সেনাবাহিনী যখন নিজেদেরকে প্রতিরক্ষা করতে পারবে এমন অবস্থায় আসবে কেবল তখনই আমরা যুদ্ধ বিরতির কথা চিন্তা করতে পারি।' আমি সেনাবাহিনীর সাথে কথা বলেছি তারা বলল যে, তারা এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে।' তার উত্তরে আমি বললাম যে, অবস্থা যদি তাই হয় তাহলে আমাকে একটু সময় দেন আমি কথা বলে দেখি।' মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে বের হয়ে আমি সেনাপ্রধানের সাথে দেখা করতে যাই। মরহুম সেনাপ্রধান সেমিহ সানজার পাশা যেখানে বসে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আমি তার কাছ থেকে সর্বশেষ অবস্থা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন যে,

'আমরা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে জি-৫ লাইনে পৌঁছে যেতে পারব। আগামীকাল ১টার পূর্বে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করবে না। কারণ আমরা আগামীকাল ৫টার মধ্যেই সেনাবাহিনীর দিক থেকে জি-৫ লাইনকে হস্তগত করতে পারব। আমাদের অভিযানের প্রথম ধাপ ছিল এটাই। এরপর আমরা দ্বিতীয় ধাপ শুরু করব।

শ্রদ্ধাভাজন, মরহুম সেনাপ্রধান সেমিহ সানজার পাশাকে বলেছিলাম যে, 'দেখুন আপনাদের বিশেষজ্ঞগণ এবং জেনারেলগণ এসেছিলেন। তারা বললেন যে, শেষ পর্যন্ত আমরা এখানে টিকে থাকতে পারব না। সবুজ লাইন পর্যন্ত আমাদেরকে যেতে হবে। দেখুন মিল্লি সালামেত পার্টি হিসেবে আমরা যে কোনো সময় যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত নিতে পারব এমন শক্তি আমাদের আছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার অভিযান শুরু করার ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া আমাদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য আমি আপনার কাছ থেকে সৈন্য হিসেবে একটি প্রতিশ্রুতি চাচ্ছি। যাই করুন না কেন যেভাবেই হোক দ্বিতীয় দফার অভিযান অব্যাহত রাখবেন। যদিও এখানে ধরে রাখা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর সানজার পাশা বললেন যে, 'আপনাকে সৈনিকের প্রতিশ্রুতি দিলাম।'

তিনি তার হাতে যে মানচিত্রটি এঁকেছিলেন সেটাকে স্মৃতি হিসেবে এনেছিলাম। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এসে তাদেরকে ব্যাখ্যা দিলাম। তাদেরকে বললাম যে, আমাদের সেনাপ্রধান সবুজ লাইন পর্যন্ত যাত্রা করতে চেয়েছেন এবং এটাকে নিরাপদ বলেছেন। মিল্লি সালামত পার্টির পক্ষ থেকে আমরা সেনাবাহিনীকে বলেছিলাম যে, 'পরের দিন ৫টা পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতির ঘোষণাকে

www.pathagar.com

দীর্ঘায়িত করতে পারব। কিন্তু জনাব এজেবিদ সেই দিন ৫টা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ১১টায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে আমরা পর্যালোচনা করে দেখতে পাই যে, এতে আগে যুদ্ধ বিরতির ঘোষণার কারণে লেফকমার একটি অংশকে আমরা হারাই।

মিল্লি গরুশ হিসেবে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সাইপ্রাস শান্তি মিশনের মাধ্যমে সমগ্র সাইপ্রাসকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়া। এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল, আমরা জামিনদার রাষ্ট্র হিসেবে এই অভিযান পরিচালনা করেছিলাম। আমাদের জামিনদারিত্ব সমগ্র সাইপ্রাসের উপরেই। যদি এটাই হয় তাহলে সমগ্র সাইপ্রাসের নিরাপত্তা রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত, রোমের অংশেও আমাদের ভাইয়েরা আছে সেখানের গ্রামগুলোতে তাদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। আমরা যদি দ্বীপের এক অংশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে অপর অংশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছেড়ে দেই তাহলে সেখানে জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো টেবিলে বসে দর কষাকষির সময় আমরা শক্তিশালী অবস্থায় থাকতে পারতাম। কারণ সাইপ্রাসের অর্ধেক আর পুরোটাই দখল করার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। বহিঃশক্তি কখনোই তুরস্কের ব্যাপারে ইনসাফ দেখাতে পারেনি।

আমরা দ্বিতীয় দফা অভিযান পরিচালনা করতে চেয়েছি। কিন্তু ভৌগলিক অবস্থানকে ভিত্তি হিসেবে ধরেছিলাম। এজন্য দ্বিতীয়বার অভিযান পরিচালনা শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং হাজারবার চেষ্টা করে দ্বিতীয় দফা অভিযান শুরু করি। দ্বিতীয় দফার অভিযানে কোনো প্রকার বিরতি ব্যতীত আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকি। বলি যে, 'কমপক্ষে লারনাকাকে যে কোনো মূল্যে দখল। পরবর্তীতে আমরা এটা জানতে পারি যে, লারনাকা দখল করার উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী আমাদের সেনাপতিদেরকে গোপনে নির্দেশ দেয়া হয় যে, 'আপনারা যাবেন না, ফিরে আসুন।' পরবর্তীতে সেই সেনাপতি আমাকে বলেন যে, 'জনাব এরবাকান আপনি যদি আমাদের ফিরিয়ে না আনতেন তাহলে অনেক বেশি ভালো হতো।' এজেবিদও জানত না। আমি বললাম যে, 'আমরা দুইজনই এখানে আছি। আমরা ফিরে আসার কোনো নির্দেশনা দেই নাই। ফিরে আসার ব্যাপারে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল আমরা সেটা এখন জানতে পারলাম।'

www.pathagar.com

আমরা জেনেভা কনফারেন্স থেকে কোনো কিছুই প্রত্যাশা করিনি। কারণ জেনেভা কনফারেন্স আমাদের জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে কোনো প্রকার মূল্যায়নের দাবি রাখেনি। এখানে রোমানদেরকে জি-৫ লাইন থেকেই ৫ কিলোমিটার পেছনে যাওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছিল। যদি তারা 'রাজি হতো' তাহলে এটা সম্পূর্ণ আমাদের স্বার্থ বিরোধী হতো। কেন? কারণ কিছু দিন পর তারা এসে আবার হামলা করার প্রস্তুতি নেবে। গ্রিস এবং অন্য দেশে সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে আমাদেরকে প্রতিহত করবে। এটা হবে আমাদের জন্য খুবই বিপদজ্জনক। কারণ সেনাবাহিনীর সদস্যগণ আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করার সময় বলেছিল যে, সেনা অভিযানের খরচ ছিল সেদিনের লিরার হিসাবে ৯ বিলিয়ন। অর্থাৎ ৫০০ মিলিয়ন ডলারের একটা ব্যয়। দ্বিতীয়ত এই অভিযান পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ৪০ হাজার সেনা সদস্যের প্রয়োজন। অভিযান পরিচালনার সময় প্রতি ৪ জনে ১ জন হতাহত হতে পারে এই হিসাবও মাথায় রাখতে হবে।' মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে ৫০০ শহীদের বিনিময়ে আমরা এই অভিযানে সফলতা লাভ করি। এই সংখ্যা এ কথা প্রমাণ করে যে, আমাদের সেনাবাহিনী কতটা গ্রহণযোগ্য ছিল। সাইপ্রাসকে প্রদেশভিত্তিক গঠনের ব্যাপারেও আমরা বিরুদ্ধাচরণ করি। এটা করলে রোমানদের সুবিধা হবে এবং অল্প কিছুদিন পরই গ্রিস খুব সহজেই এই দ্বীপকে নিজের করায়ত্ত করে নেবে।

সেখানে আমাদের মেম্বার, চেয়ারম্যান থাকবে ঠিকই কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকবে তাদের হাতে! এটা আবার কিভাবে? অর্থাৎ রোমানদেরকে না চিনেই এমন একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এজন্য আমরা শক্তভাবে এর বিরোধিতা করি। এই বিতর্ক জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে চলছিল। আল্লাহ্র রহমতে সেনাবাহিনী আমাদের পক্ষে ছিল। তারা বলেন যে, 'প্রাদেশিক ব্যবস্থা আমাদের কোনো কাজে আসবে না। বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণও আমাদের কাছে থাকবে না।' দু'টি স্বাধীন দেশ হিসেবে ভূমিকে ভাগ করার ব্যাপারে আমরা চিন্তা করেছিলাম। 'সাইপ্রাসকে ভাগ করে দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হোক। শান্তি মিশন শুরু করার সময় আমাদের মূল সিদ্ধান্ত ছিল এটাই। শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্য আমরা এটাকে ঘোষণা করি। ভূমিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দু'টি স্বাধীন দেশ হবে।' এই কথা আমরা বলেছিলাম।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালার কাছে শুকরিয়া আদায় করছি যে, এখন দ্বীপে শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। এতো দীর্ঘদিন ধরে সেখানে শান্তি বিরাজ করছে কোন করণে? কারণ হলো ভূমিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করার কারণে। সেই সময় এটা সম্পর্কে কথা বলাকেই বড় বীরত্বের কাজ বলে বিবেচনা করা হতো। এমনকি সেই সময় বলত যে, 'চুপ করো না, করতে পারবে না।' কেন?

কারণ পাশ্চাত্যের বড় ভাইগণ এটাকে পছন্দ করত না বলে। সমগ্র দুনিয়া আমাদের বিপক্ষে চলে যাবে। আচ্ছা কি হয়েছিল পরবর্তীতে? ১০ বছর চলে গেছে, তারা এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে, সেখানে স্বাধীন একটি রাষ্ট্র গঠন ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই। কিন্তু সেটাও তারা পরিপূর্ণভাবে করতে পারেনি। যেমন বসতি স্থাপনের সময় মারাশকে জেনেশুনে ফাঁকা রাখে। এভাবে তারা বড় একটি ভুল করে। আপনারা মারাশকে ফাঁকা রাখবেন রোম কি চিন্তা করবে জানেন? তারা বলবে যে, এটা আমাদের জন্য ফাঁকা রেখেছে তাহলে আমাদেরকে দিয়ে দেন। যদি তারা এমন দাবি করে তাহলে আমরা তাদের কি জবাব দেবো? সাইপ্রাসের বিষয়ে যে কোনো প্রকার আপসমূলক রাজনীতি, রোমকে সর্বদা সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে এবং তারা এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার আশায়, পাশ্চাত্যের প্রিয়ভাজন হওয়ায় আমরা যত আপস করার চেষ্টা করব রোম ততোই দুঃসাহসী হয়ে উঠবে এবং আরও অনেক বেশি করে তাদের সুযোগ কাজে লাগাবে আর বিনিময়ে আমরা কিছুই পাব না।

এ সব কিছুর পর, বুটরস ঘালি মূলত সাইপ্রাসে আসল ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। বুটরস ঘালি মিশরীয় একজন অর্থোডক্স খ্রিস্টিয়ান। তিনিও তার বাবার মতো ইসলাম বিদ্বেষী ছিলো। তার ভাই গ্রিসে বসবাস করতেন এবং তিনি ভাসিলিউ (Vasiliu)'র সাথে অংশীদার ছিলো। বুটরস ঘালি (Butros Ghali) সমান জাতিসংঘ, জাতিসংঘ সমান অর্থোডক্স আর অর্থোডক্স মানে হলো রোম। বুটরস ঘালির বাবা যেমনভাবে উসমানীয়দেরকে ধ্বংস করার জন্য এবং ছিন্নভিন্ন করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কাজ করেছিল, তেমনিভাবে তার সন্তানও তুরস্ক এবং মুসলিম দুনিয়াকে খণ্ড বিখণ্ড করে মুসলিমদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য তার পিতার চেয়েও অনেক বেশি উৎসাহ নিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। সে ক্ষমতায় বসার সাথে সাথেই সাইপ্রাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে নিয়ে গ্রিসের হাতে সমর্পণ করার পরিকল্পনা হাতে নেয়। সেই

www.pathagar.com

পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের অংশহিসেবে সে বলেছিল যে, 'আগে মারাশ এবং গুঁজেল ইয়র্টকে আমাদের হাতে হস্তান্তর করবেন পরবর্তীতে বাকিটুকু দেখব। তুরস্ককে আল্টিমেটাম দিয়ে বলে যে, 'মারাশকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে হবে। রোমকগণ ফামাগুস্টা দুর্গ (Famagusta castle) পর্যন্ত আসবে, তারা সমগ্র অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করবে।' তাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পর নিকোসিয়া বিমানবন্দরকে তাদের হোটেলে পর্যটক আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহার করবে কিন্তু এরজান বিমানবন্দরকে বন্ধ করে দেবে।

এটা কেমন আকাঙ্ক্ষা, কেমন দ্বৈতনীতি! বসনিয়া, আজারবাইজান, ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরের হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে জাতিসংঘের এতো সিদ্ধান্ত দেয়ার পরও সেগুলো কোনো কাজে না আসে তাহলে সাইপ্রাসের ব্যাপারে নেয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা এতো গুরুত্বপূর্ণ কেন? কারণ সে সকল সিদ্ধান্ত মুসলমানদের হত্যার ব্যাপারে। সেগুলো বাস্তবায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অপরদিকে সাইপ্রাসের ব্যাপারে নেয়া সিদ্ধান্তের অর্থ হলো সেখান থেকে মুসলমানদেরকে উচ্ছেদ করে দ্বীপকে খ্রিস্টিয়ান ও রোমানদের দিয়ে দেয়া। এ জন্য অর্থোডক্স পোপ বুটরস ঘালি তার সকল কাজ বাদ দিয়ে সাইপ্রাসকে নিয়ে ব্যস্ত। ঘটনা এখানেই শেষ নয়, আমেরিকার বিখ্যাত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ারেন ক্রিস্টোফার আঙ্কারায় আসে। সে মাত্র ৬ ঘণ্টার ব্যবধানে, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে। এতোজনের সাথে সাক্ষাৎ মাত্র ৬ ঘণ্টায় কেন? কারণ, সবাই প্রস্তুত হয়ে তার জন্য দাঁড়িয়েছিল। অপরদিকে আমাদের সাবেক প্রেসিডেন্ট তুরগুত ওজাল, বিল ক্লিন্টনের সাথে দেখা করার জন্য আমেরিকাতে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করেছিলেন। সেখানে এপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য এক সপ্তাহ অপেক্ষা করে। অপরদিকে তাদের লোকজন এখানে এলে সকলেই লাইন ধরে অপেক্ষা করে। হাতে একটি আপেলের জুস নিয়ে এসেছিল। এই ক্রিস্টোফার বলেন কি : 'আপনাদেরকে ৫০টি A-10 বিমান দেওয়ার জন্য সিনেটে প্রস্তাব পাস করেছি।

দেখুন এই কাজে! কত বড় একটা অনুগ্রহ! আপনাদেরকে দেব এটাও বলে না, আপনাদেরকে দেব বলে সিনেটে প্রস্তাব করেছি। এই কথা বলে। আপেলের জুস না দিয়ে, শুধু দেখায়। আর কি বলে?' এই A-10 বিমান আমেরিকার বাহিনী এখনো ব্যবহার করছে।' তার কথার ধরন দেখুন। 'এখনো

www.pathagar.com

ব্যবহার করছে' মানে কি? এর মানে হলো, 'এগুলো এখন অচল হওয়ার পথে, ফেলার জন্য ডাস্টবিন তালাশ করছে।' আমেরিকার সাহায্য করার অর্থ হলো এটা।

অন্যদিকে আমেরিকা তুরস্ককে কোবরা হেলিকপ্টার দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু এর সংখ্যা এবং কখন দেবে এটা পরে ঠিক করবে। অর্থাৎ ফামাগুলতা দেবেন, গুজেল ইউরথ দেবেন এরপর কোবরার সংখ্যা নির্ধারিত হবে। ২টি আপেল জুস দেখাচ্ছে, আর এর বিনিময়ে আপনাকে ২টি চুরিকাঘাত করবে।

১৫ মে ১৯১৯ সালে গ্রিস ইজমিরে কেন আক্রমণ করেছিল? 'তারা বলেছিল আমরা আনাতোলিয়া এবং বাইজান্টাইনকে দখল করব।' সাইপ্রাসে ১৯৬০-১৯৬১ সালে গঠিত যৌথ সরকারকে কেন ভেঙে দিয়েছিল? তাদের নিয়ত এখানে পরিষ্কার।

শুধুমাত্র সাইপ্রাস নয়, তারা সমগ্র আনাতোলিয়াকে দখল করতে চায়। এ জন্য বিন্দু পরিমাণ আপোষের চিন্তাও করা যাবে না। শহীদের রক্তের বিনিময়ে কেনা ভূমি কখনো বিক্রি করা যায় না। যারাই আপসের পথ বেছে নিয়ে দেশ-জাতির সাথে বেইমানি করবে, শুধুমাত্র শহীদগণ নয় বর্তমান বংশধরগণ এবং আগামী দিনের প্রজন্মও তাদের প্রতি লানত দেবে। 'সাইপ্রাস ইস্যু' বলে আমাদের কোনো ইস্যু নেই। সাইপ্রাস নিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের নিয়ে গঠিত এই দেশটির পক্ষে মুসলিম দেশগুলো থেকে স্বীকৃতি আদায় এবং Turkish Republic of Northern Cyprus নামক দেশটিকে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা।

www.pathagar.com

আমাদের সভ্যতা

ইতিহাসের একটি বিরাট সময় আমাদের জাতি হকের পতাকাকে উড্ডীন করে ধরে রেখেছিল। তারা কখনোই শক্তি দিয়ে কোনো জাতিকে শোষণ করেনি, তাদের অধিকার হরণ করেনি। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দু'টি সভ্যতা উসমানীয় ও সেলচুক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিল তারা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শান্তি-শৃঙ্খলা ও আদলের দৃষ্টান্ত তারা বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছে। তারা মান-সম্মান, ইজ্জত ও সোনালী অতীতের অধিকারী ছিলেন।

নিকট অতীত পর্যন্ত দুনিয়ার অন্যান্য জাতির সাথে আলাদা আলাদাভাবে নয় তাদের সম্মিলিত শক্তির মোকাবিলা করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিল। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বীরদর্পে এগিয়ে এসেছিল। তাদের বর্বর আক্রমণ প্রতিহত করে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। আমাদের এই জাতি ৫০০ বছর পূর্বে ইস্তানবুল বিজয়ের সময় ৪০০ বছর পূর্বে ভিয়েনা অভিযানের সময় এবং ১৯২২ সালে সাকারিয়ার যুদ্ধে যে বীরত্ব প্রকাশ করেছিল, নিঃসন্দেহে এর মূল শক্তি ছিল ঈমান এবং ঈমানী চেতনা।

আমাদের দুশমনরা যখন আমাদের এই জাতিকে বাহির থেকে পরাজিত করতে পারছিল না অনেক শতাব্দীর পর তারা আমাদের ঈমানকে দুর্বল করার পথ বেছে নেয়। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে, মিশনারীদের মাধ্যমে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে, পুঁজিবাদের মাধ্যমে, চিন্তাকে দূষিত করার মাধ্যমে, আমাদের মানুষগুলোর দ্বীন, আকীদা বিশ্বাস, পবিত্রতা ও সাংস্কৃতিকে পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিজাতীয় এই আন্দোলনগুলো আমাদের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে এবং খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সেই সালতানাতকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।

অনেক হত্যাযজ্ঞের পরও আমাদের এই জাতি চানাক্কালের যুদ্ধে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে বিস্ময়কর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে। নিকট অতীতের এই দলিল সুস্পষ্টভাবে একথার সাক্ষী বহন করে যে, আমাদের জাতীয় জীবনী শক্তি এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আজকে আমরা যে সকল শর্তের মধ্যে বসে আমাদের আন্দোলন পরিচালনা করছি, এটা সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ যে অসীম

www.pathagar.com

সাহস নিয়ে ইস্তানবুল বিজয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন সেটার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আজ আমাদের সেই ঈমান এবং সেই মশালের একান্ত প্রয়োজন। আজ আমরা যদি সেই ঈমানকে জীবন্ত করতে না পারি আমাদের রুহকে আলোকিত করতে না পারি তাহলে কাগজের উপর লেখা পরিকল্পনা এবং আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ আর কখনোই ফিরে আসবে না। আমাদের জাতির হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতেও সক্ষম হব না। কারণ সেই গৌরব কাগজের উপর লেখা পরিকল্পনা দিয়ে ফিরে আসবে না। হাজার বছর ধরে আমাদের যে রূহটি ঘুমিয়ে আছে সেটাকে উজ্জীবিত করতে হবে।

আমাদের জাতির অতীত ইতিহাস ফিরিয়ে আনতে হলে ইতিহাস, দ্বীন, অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি জাতির ঈমানী চেতনাকেও ফিরিয়ে আনতে হবে। এই সমষ্টিগত চেতনাকে আমরা 'জাতীয় চেতনা' বলে অভিহিত করে থাকি। জাতীয় চেতনা জাতিকে তার জীবনীশক্তি দান করে। বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল হলে একটি জাতির পতন ঘটে। আমাদের এই সম্মানিত জাতি বিগত ২শ' বছর যাবৎ বহিঃশক্তির আক্রমণে জাতীয় চেতনা হারিয়ে আজ দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। নিজেদের ভূমিতে আজ তারা প্রবাসী/পরবাসী।

এ জন্য, পাশ্চাত্যের কৃষ্টি এবং সভ্যতাকে অনুসরণ করে যেসব দেশকে আমাদের দেশের চেয়ে উচ্চতর ভেবে আমাদের দেশ আজ পশ্চিমাদের মতো হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। জাতীয় স্বকীয়তাকে বিকিয়ে দিয়ে তুরস্ক পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মধ্যে বিলীন হতে পারবে না। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, এর গঠন এবং ইতিহাস এর জন্য প্রস্তুত নয়।

বিগত ২শ' বছর ধরে আমাদের এই সম্মানিত জাতির উপর ইয়াহুদিগণ, রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য সকল প্রকার উপকরণ দ্বারা এতটাই প্রপাগাণ্ডা চালিয়েছে যে, এই জাতির সন্তান হওয়ার পরও অনেকেই সমস্যার সমাধানের জন্য বামপন্থী, লিবারেলিজম এবং পুঁজিবাদকে বেছে নিয়েছে। ইয়াহুদিগণ ২শ' বছর অনেক প্রচেষ্টা চালিয়ে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে আমাদের অনেক সন্তানদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছে।

বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক সঙ্কট জনগণ সৃষ্টি করেনি, এটা সৃষ্টি করেছে সেই সকল বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবদগণ যারা জাতির ফিতরাতের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের

www.pathagar.com

স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাজ করেছে। আজকে যুব সমাজের একটি অংশ আমাদের জাতীয় চিন্তা-চেতনার বিপরীতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পেছনে যে ছুটে বেড়াচ্ছে, বস্তুবাদী, নৈরাজ্যবাদী হচ্ছে, অযত্ন-অবহেলায় জীবনযাপন করছে, পিতামাতার অবাধ্য হচ্ছে এসব কিছুর মূল কারণ হলো পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ।

আজকে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে যদি আমরা অভিযোগ করি, ব্যবসা-বাণিজ্যে অস্থিরতা, শোষণ, অবৈধ কমিশন, অবৈধ অর্জন থেকে যদি আমরা অস্বস্তিতে ভুগি তাহলেও আমাদের বলতে হবে যে, এটা চরিত্র গঠন এবং উন্নত নৈতিকতা এবং জাতীয় ঐতিহ্যকে লালন না করে কাজ করার ফলাফল। আমাদের জাতির একটি বড় অংশ এই অধঃপতনের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ায় এই অস্থায়ী প্রভাব খুব সহজেই দূর হয়ে যাবে। কিন্তু এটা হবে জাতির আকাঙ্ক্ষা এবং অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকে কাজ করার মাধ্যমে। আমাদের এমন বিষয়গুলো এ রকম কাজের সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যেমনভাবে সারা দুনিয়াতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও ন্যায়ের উপমা সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনিভাবে এখনো গৌরবময় এবং মহত্ব সৃষ্টিকারী, শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং এটা আমাদের নিকটবর্তী। আমাদের জাতি কখনো আশাহত হয়নি, হতাশায় ভোগেনি, আশাহত হবেও না। আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত শক্তি, ইচ্ছা এবং ঈমান আমাদের জাতির মধ্যে মজুত রয়েছে। এখনো এই বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির আন্দোলনকে আরও বেগবান করে একবিংশ শতাব্দীতে সত্য এবং সুন্দরের পতাকাকে তুলে ধরা সম্ভব।

আর এটার জন্য আমাদের শুধুমাত্র একটি জিনিসের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন সেটা হলো রুহানী শক্তি অর্থাৎ ঈমানদৃপ্ত চেতনা। যে শক্তি দিয়ে আমরা ইস্তানবুল জয় করেছিলাম, চানাক্কালে মুক্ত করেছিলাম, স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম এবং সর্বশেষ সাইপ্রাস বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছিলাম। আমাদের জাতি যেটা চায়, যেটা আকাঙ্ক্ষা করে, সেটা মিল্লি গরুশ খুঁজে পাবে। কারণ মিল্লি গরুশ হলো আমাদের জাতীয় চেতনার ভিত্তি। যার উপর ভিত্তি করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সত্য এবং সুন্দরের পতাকাকে আমরা তুলে ধরে রেখেছিলাম।

হ্যাঁ! বৈদেশিক শক্তিগুলো এবং ষড়যন্ত্রকারীগণ আমাদের জাতীয় ভিত্তির মর্মমূলে ঢুকে পড়েছিল। পরবর্তীতে ঢুকে পড়া এই শক্তিগুলোর প্রভাব

www.pathagar.com

আমাদের ভিত্তিকে নড়বড়ে করতে পারেনি। আমাদের ভিত্তি অনেক মজবুত আল্‌হামদুলিল্লাহ্। মিল্লি গরুশ আমাদের জাতিকে তার ভিত্তি সম্পর্কে সজাগ করার পাশাপাশি, যারা অন্যের পোশাক পরে বামপন্থী, লিবার‍্যালিজম এবং নাম না জানা আরও অন্যান্য মতবাদ প্রচার করে চলছে তাদের সম্পর্কেও জাতিকে সজাগ; সচেতন করে যাচ্ছি।

বামপন্থী, ডানপন্থী, লিবারেলি এসব মতবাদ কোনোটাই পরিপূর্ণ মতবাদ নয়। এই মতবাদ এবং দর্শনগুলোতে অপূর্ণতা রয়েছে। যদি আমরা সফল হতে চাই তাহলে জাতীয় চেতনাকে জীবন্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আর এটাকে জীবন্ত করার সবচেয়ে বড় উপাদান হলো চরিত্র এবং আধ্যাত্মিকতা (আখিরাতমুখী জীবন)। এ জন্য অর্ধশতাব্দী ধরে 'সবার আগে চরিত্র এবং আধ্যাত্মিকতা এই কথাগুলোকে আমাদের পতাকা বানিয়েছি।

মিল্লি গরুশ আমাদের সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। আমাদের জাতির মধ্যে কোনো প্রকার বিভাজন আমরা চাই না, সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে চাই। একই জাতি এবং একই ইতিহাসের অধিকারী বংশধরদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করাটাই হলো আমাদের মৌলিক কাজ। আমাদের রাস্তা হলো ভ্রাতৃত্ব এবং শান্তির রাস্তা। আমরা দোষারোপের নীতিতে বিশ্বাস করি না। আমাদের রাস্তা হলো যুক্তি এবং প্রমাণের রাস্তা। একই জাতির সন্তানের মধ্যে চিন্তার পার্থক্য, দর্শনের পার্থক্য হতে পারে কিন্তু এটার উপর ভিত্তি করে কখনোই কাদা ছোড়াছুড়ি কিংবা বিভাজন হতে পারে না। চিন্তা ও দর্শনের এই পার্থক্য কখনো অনৈক্যের কারণ যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

শত শত বছর ধরে আমরা এক দেহ এক প্রাণ হয়ে বসবাস করছি। কারণ ইসলামের ভ্রাতৃত্ব আমাদেরকে একে-অপরের সাথে বেঁধে রেখেছিল। আমি যখন বিস্‌মিল্লাহ্ বাদ দিয়ে এ কথা বলি যে, 'আমি তুর্ক, আমি সঠিক, আমি কর্মঠ' আরেকদিক দিয়ে কুর্দ এক মুসলিম দাঁড়িয়ে বলা শুরু করছিল যে, 'ও তাই নাকি? আমিও একজন কুর্দ, আমি আরও সঠিক, আমি আরও বেশি পরিশ্রমি'। এভাবে এই দেশের মানুষদেরকে কিছু লোক একে অপরের শত্রু বানিয়েছে। নিজেদের দ্বীন এবং জাতিসত্তা ভুলে গিয়ে অস্বীকারকারী, বর্ণবাদী এবং বস্তুবাদী রাজনীতির শিকার হয়ে আমাদের এই দেশ বছরের পর বছর ধরে অনেক বিপর্যয়ে পতিত হয়েছে। ভাষাগত বিষয়টি এটার এক জ্বলন্ত উপমা। আচ্ছা তার্কিশ ভাষায় কথা বলবে নাকি কুরদিশ ভাষায়? মানুষের

www.pathagar.com

মৌলিক মানবীয় অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে বড় অধিকার হলো নিজের মাতৃভাষায় কথা বলা এবং নিজের সভ্যতায় বেড়ে উঠা। মাতৃভাষায় কথা বলবে এবং সেটা তার সন্তানকেও শিক্ষা দেবে। যদি এগুলো বাধা দেন তাহলে জালিম হবেন।

আচ্ছা আমরা এই বিষয়ে কি বলে থাকি : 'বন্ধু, তুমি কুরদিশ ভাষায় কথা বলতে চাও তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা বলো দেখি তুমি কি বলতে চাও।'

'আমি নাস্তিকতা সম্পর্কে বলতে চাই, আমি তুরস্ককে ভাগ করব।'

তাহলে তুমি তুর্কিশ ভাষায় কথা বল আর কুরদিশ ভাষায় কথা বল তুমি ক্ষতিকর।

'কি বলতে চাও।'

'ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য এবং সংহতি সম্পর্কে বলব।'

তাহলে তুমি উগান্ডা ভাষায় কথা বলো না কেন, আমি তোমার কপালে চুমো দিয়ে বুকে টেনে নেব।

এই বিষয়টির সমাধান, ভিন্ন একটি রাষ্ট্র এবং ভিন্ন একটি ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। কখনো এমন কোনো সমাধান হতেও পারে না। কারণ এগুলো না আমাদের দেশ-জাতির জন্য, না মানবতার জন্য এবং না আমাদের কুর্দ বংশোদ্ভূত ভাইদের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনবে। পাশ্চাত্যের দেশগুলো এক হয়ে একদেশে পরিণত হচ্ছে। অপরদিকে আমরা তাদের ষড়যন্ত্রের জালে পা দিয়ে পৃথক হতে চাচ্ছি এটা কি সঠিক হবে? তারা আমাদেরকে ভাগ করার জন্য, শোষণ করার জন্য এবং একে-অপরকে পৃথক করার জন্য এই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছে। আমাদের কেউ যাতে এই ষড়যন্ত্রের সহযোগী না হয়। দক্ষিণ-পূর্বের কুর্দিশ ভাইয়েরা ইস্তানবুল, ইজমিরে পার্সপোর্টের মাধ্যমে এলে এর মাধ্যমে কে লাভবান হবে?

এর বিপরীতে ইজমিরের তুর্কিশ ভাইয়েরাও যদি দেশ ভাগ করে পাসপোর্ট নিয়ে যেতে বাধ্য হয় এর মাধ্যমে কে লাভবান হবে? যে কোনো বর্ণ বা ভাষার লোকই হোক না কেন সাবধান, আমাদের কোনো ভাই যাতে ইয়াহুদি, আমেরিকা ও ব্রিটিশদের এই প্ররোচণায় বিভ্রান্ত না হয়। ইতিহাস আমরা

www.pathagar.com

সকলেই জানি। তারা এর মাধ্যমে আমাদেরকে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত করে তাদের নিজেদের ফায়দা হাসিল করতে চায়। এই নোংরা পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে চায়।

ইস্পাত কঠিন একটি জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য সামাজিক জীবনে শান্তি এবং একে-অপরের প্রতি সহনশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। উন্নয়নের জন্য বড় শর্ত হলো রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা। যদি আমরা সত্যিকার অর্থেই দেশ ও জাতির কল্যাণ চাই, দেশ ও জাতির উন্নয়ন চাই তাহলে, এই বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। নাগরিক অধিকারের মধ্যে থেকে যে কেউ তার চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করতে পারে। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাব।

যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা নামে একটা শব্দ আছে। সামাজিক জীবনে অনেক অঘটনের পেছনে এর ভূমিকা রয়েছে। এই মূল বিষয়টিকে নিষ্পত্তি করা একান্ত প্রয়োজন। এটার নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে আমাদের দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism, laicism) মানে হলো সকলের চিন্তা-চেতনা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা এবং ইবাদতের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা। কেউ কাউকে তার বিশ্বাসের জন্য জোরজবরদস্তি করতে পারবে না। আমাদের ইতিহাস এবং জাতীয় ভিত্তিতে এরূপ চিন্তার অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন, আমাদের দ্বীনের হানাফী মাযহাবের মতে, 'আমাদের মাযহাব মতে, কেউ অজু করার পর যদি তার শরীর থেকে রক্ত বের হয় তাহলে তার অযু নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু অন্য মাযহাব মতে রক্ত বের হলেও অজু ভাঙবে না। এভাবেই ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে।

এখানে 'অন্যান্য মাযহাব' এই শব্দটি ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির আভিধানিক অর্থ থেকে আসা একটি শব্দ। 'আমাদের থেকে ভিন্ন চিন্তার অধিকারী লোকজনও আছে 'এটা তাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করার নামান্তর। এটা শব্দটির একটি আভিধানিক অর্থ, এই অর্থেই এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফরাসি বিপ্লবের পর এই শব্দটি আইনি ভাষায় ব্যবহৃত হতে শুরু হয়। কেন এটাকে ব্যবহার করা হয়েছিল? ফ্রান্সে কেউ কেউ ধার্মিক, গির্জার সাথে সম্পৃক্ত, আবার কেউ কেউ নয়। তারা কি বলেছিল? আমরা ধর্মনিরপেক্ষ হব, অর্থাৎ কাউকে তার চিন্তা-চেতনার কারণে আমরা নিন্দা করব না। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো এটা।

www.pathagar.com

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বছরের পর বছর ধরে ধর্মনরিপেক্ষতাকে আমাদের দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বাসী ও ধার্মিকদের উপর চরম জুলুম-নির্যাতন পরিচালনা করা হয়েছে। এজন্য ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ আমাদের জাতির কাছে সুখকর নয়। আপনারা যদি আমাদের কোনো গ্রামে গিয়ে কোনো নানীকে প্রশ্ন করেন, 'নানী ধর্মনিরপেক্ষতা নামে নাকি একটা কিছু আছে, কখনো শুনেছেন নাকি?' তিনি উত্তরে বলবেন যে, না এটা আবার কি জিনিস?'

অপরদিকে এটাও সত্য যে, আমাদের মধ্যে এমন এক ধরনের লোক আছে যারা ভালো, সুন্দর, সত্য যদি কোনো কিছু থাকে, বিশেষত পাশ্চাত্যে যদি থাকে তাহলে এটাকে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করে নেবে। কিন্তু যদি বলেন যে, ইসলামেও এটা বলেছে তাহলে সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হওয়া শুরু করবে। কারণ ইসলাম বিরোধিতা এবং পাশ্চাত্যমুখিতা তাদের নষ্ট চিন্তার ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। এজন্য আমরা বিশেষ করে পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত শব্দগুলোকে আমাদের সংবিধান লেখার সময় আমাদের ইতিহাসের সাথে সঙ্গতি রেখে তুর্কিশ ভাষায় লেখার পক্ষে মত পোষণ করি। রাষ্ট্র জনগণের স্বার্থ রক্ষা ও তাদের প্রতি ন্যায় মনোভাব পোষণ করতে বাধ্য। কোনো বড় কোম্পানি বা হোল্ডিং তার শ্রমিক এবং কর্মচারীদেরকে যাতে শোষণ করতে না পারে এটা নিশ্চিত করা। আবার কারো ব্যক্তিগত সম্পদও যাতে কেউ বা কোনো গোষ্ঠী অন্যায়ভাবে দখল করতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। হক হলো পবিত্র এবং এটাকে অবশ্যই তার মালিকের হাতে অর্পণ করতে হবে। হকের (অধিকারের) ব্যাপারে কোনো বর্ণ, ভাষা, গোত্র এবং গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য না করা। যুদ্ধের সময়ও হারানো সম্পদ পেলে তার মালিককে খুঁজে তার হাতে ফিরিয়ে দেয়া আমাদের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা এমন একটি জাতির উত্তরসূরি। আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ ন্যায়পরায়ণতার সাথে কিভাবে সমগ্র দুনিয়াকে শাসন করেছে আমাদেরকে সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তার আলোকে কাজ করতে হবে।

আমাদের মৌলিক বিষয় হলো, হক এবং আদালত। সত্যিকারের হকদার ব্যক্তি যদি দুর্বলও হয় তবুও সে আমাদের কাছে শক্তিশালী। অন্যদিকে অন্যায়কারী ব্যক্তি যদি শক্তিশালী হয় তবুও সে আমাদের কাছে দুর্বল। যে কোনো অবস্থায় হোক না কেন, যদি কেউ তার নিজের মত চিন্তা না করার

www.pathagar.com

কারণে তার উপর নির্যাতন চালানো হয়, নিঃসন্দেহে এমন কোনো কাজের স্বীকৃতি দেয়া যাবে না। রাষ্ট্রের সকল কিছুকেই আমানত হিসেবে গ্রহণ করা এবং এই আমানত তার অধিকারীকে বিশ্বস্ততার সাথে ফেরত প্রদান করা আবশ্যক। এজন্য নির্বাচনের সময় ব্যক্তির জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং গ্রহণযোগ্যতা দেখার পাশাপাশি তার চরিত্র এবং নৈতিকতার দিকেও নজর দেয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

জনগণের সেবামূলক কাজে যেসব আনুষ্ঠানিকতা দীর্ঘ সূত্রিতার সৃষ্টি করে সেগুলোকে অপসারণ করে সহজ উপায়ে কম সময়ে কিভাবে জনগণের সেবা করা যায় এমন পদ্ধতি চালু করা আবশ্যক। রাষ্ট্রীয় কাজে সকল প্রকার আড়ম্বরতা পরিহার করা এবং অপচয় অপব্যয়কে বন্ধ করা, ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি নামক সকল অসুস্থ্যতাকে সমূলে নির্মূল করে সকলের প্রতি ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা যাবে এমন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। সামাজিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য পরমত সহিষ্ণুতা এবং ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা, একে অপরের প্রতি সহিষ্ণু আচরণ করা এবং ভ্রাতৃত্বের মনোভাব পোষণ করা প্রভৃতি আমাদের দায়িত্ব। উন্নয়ন এবং অগ্রগতির মূল শর্ত হলো সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা। সামগ্রিক উন্নয়নের প্রথম শর্ত হলো ভ্রাতৃত্ব। সাড়ে সাত কোটি মানুষ আমরা সবাই ভাই ভাই। এই চেতনাকে আমাদের আরও শক্তিশালী করতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো-রাষ্ট্র হলো জনগণের সেবক তাদেরকে নির্যাতনকারী এবং তাদের উপর আধিপত্যকারী নয়। রাষ্ট্র তার জনগণের সাথে মিশে যাবে। এটার মানে কি? এমন একটি রাষ্ট্র হবে যে শুধুমাত্র উগ্র উপলক্ষেই নয়, এক ভাই আরেক ভাইয়ের কাজের ক্ষেত্রে শুধু সাহায্য করার ক্ষেত্রেই নয় বরং নিজে নিজে যখন চিন্তা করবে তখনও সে বলবে আমার কত সুন্দর একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা আছে।

তুরস্কে মিল্লি গরুশ সবসময় হকের পতাকাকে উড্ডীন করে রেখেছে। এই মিল্লি গরুশের মাধ্যমেই এই দেশটি ১০৭১ সালে মালাজগিরত যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিল। এরপর আমাদের জাতীয় চিন্তা-চেতনার প্রতীক এই মিল্লি গরুশ অসংখ্যবার বিজয় অর্জন করেছে। ইস্তানবুল বাম-আদর্শের মাধ্যমে, লিবারালিজমের মাধ্যমে বিজিত হয়নি। বরং মিল্লি গরুশের মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল এই একইভাবে চানাক্কালের যুদ্ধও মিল্লি গরুশের চেতনার আলোকে হয়েছিল। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং সাইপ্রাস বিজয়ও মিল্লি গরুশের

www.pathagar.com

মাধ্যমে হয়েছিল। এজন্য মিল্লি গরুশের ইতিহাস হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু হয়েছে।

তুরস্কে বহুমুখী রাজনৈতিক দলের সূচনা হয় ১৯৪৬ সাল থেকে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত অনেক রাজনৈতিক দল তুরস্কের রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এরা জাতির প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এজন্য ১৯৬৯ সালে জাতির আশা-আকঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ফোয়ারার মতো, উথলে উঠে জাতির কোলে আশ্রয় নেয় মিল্লি গরুশ। এভাবে ১৪ অক্টোবর ১৯৬৯ সালে সর্বপ্রথম জাতীয় সংসদে মিল্লি গরুশ প্রতিনিধিত্ব করতে শুরু করে। এই নির্বাচনে অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচনে ১৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয় লাভ করে জাতীয় সংসদে মিল্লি গরুশের প্রতিনিধিত্ব শুরু করে। তারা জান-প্রাণ দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। আমাদের মিল্লি নিজাম পার্টি প্রতিষ্ঠার সময় পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে মরহুম আশরাফ আদিপ সাহেব যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তার বক্তব্যের এই কথাগুলো ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

আমি ৯০ বছর বয়স্ক একজন মানুষ। ৭০ বছর ধরে আমি বিশ্বাস করেছি যে, এই জাতি একদিন তার মূলে ফিরে আসবে, এর জন্য লেখালেখি করেছি এবং এর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি।

আজকের এই দিনেও আমি বেঁচে আছি, হয়তো এরপর আমি মারা যাব। কেন না ৭০ বছর যাবত যেটা বিশ্বাস করেছি, যেজন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি আজকে সে আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার যাত্রা শুরু করেছে আর এই দিন পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে হায়াত দান করেছেন। মিল্লি নিজাম পার্টির প্রতিষ্ঠা একটি জাতি তার মূল/আসল অবস্থায় ফিরে আসার নামান্তর। এজন্য এরপর আমি মৃত্যুবরণ করলেই আমার আর কোনো দুঃখ নেই।'

আমাদের জাতীয় মূল চেতনা, মিল্লি গরুশ আন্দোলন নতুন করে শুরু করার পর প্রথম দিনগুলোতে আমাদের প্রতিপক্ষগণ আমাদের বলত যে, 'এই দেশে মসজিদগুলো কি উন্মুক্ত না, যে কেউ ইচ্ছা করলেই কি নামাজ পড়তে পারছে না? মিলাদ শরীফ কি পড়া হয় না? যে কেউ কি রোযা রাখতে পারছে না, হজ্জে যেতে পারছে না? আমরা তো কাউকে বাধা দিচ্ছি না। সকলেই স্বাধীন। আচ্ছা আপনারা আর কি চান?'

www.pathagar.com

আমরা তাদেরকে এই জবাব দিতাম: শিকারি একটি সুন্দর রঙিন পালকওয়ালা পাখিকে শিকার করার পর সেটাকে সে কখনোই মাটিতে পুঁতে ফেলতে চাইবে না। এর ভেতরকে ফাঁকা করে, এর ভেতরে খড়কুটা ঢুকিয়ে ঘরের এক কোণায় সুন্দর করে রেখে দেবে। স্কুলে, জাদঘুরে হয়তো আপনারা খড়কুটা ভরা সুন্দর সুন্দর পাখি দেখেছেন। তারা আমাদেরকে যে প্রশ্ন করছে সেটা হলো এমন : এই পাখির চোখ নেই নাকি? আছে। ঠোঁট নেই নাকি? আছে। পাখা কি নেই? আছে। আচ্ছা আর কি চান? আমরাও একবাক্যে এর উত্তরে বলি যে, 'আমরা খড়কুটায় পূর্ণ মৃত কোনো পাখি নয়, আমরা এই পাখির জীবন্ত রূপটা দেখতে চাই।' এই দেশে আমাদের চাওয়া হলো এটা। মিল্লি গরুশের সাথে অন্যান্য মতাদর্শের অধিকারীদের পার্থক্য হলো খড়কুটায়পূর্ণ পাখি এবং জীবন্ত পাখির মধ্যে যে পার্থক্য তার মতো।

এ সব কারণে মিল্লি গরুশ হচ্ছে এই জাতির মূল, ইতিহাস, আস্থা এবং বিশ্বাস। প্রথম যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখনই তাকে এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চার বছর তিনটি সরকারের সাথে কোয়ালিশন করে এই দলটি অনেক সফলতার স্বাক্ষর রেখেছিল। মিল্লি সালামেতের সময় অনেক বড় বড় কূটনৈতিক বিজয় অর্জন করতে পেরেছিল। এই সময় 'ভারি শিল্পায়নের' বিশাল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। তুরস্কের সকল জায়গায় বড় বড় শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। মিল্লি সালামেত পার্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জাতিকে সেবার ক্ষেত্রে অনেক বড় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব কিছুর পরও যে কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা হলো মিল্লি সালামেত পার্টির প্রচেষ্টার কারণেই তুরস্ক OIC'র সদস্য পদ গ্রহণ করে। তুরস্কের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রাস্তা করার জন্য সকল পদক্ষেপ সেই সময়ই নেয়া হয়েছিল। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মাদ্‌রাসার ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা হয়। আজকে যে লাখ লাখ বিশ্বাসী লোকজন রাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত এটা হলো মিল্লি গরুশের সেই সময়ের কাজের ফলাফল।

সকল স্কুলে, দ্বীন এবং আখলাক শিক্ষা চালু করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কে এই কাজ ছিল সবার ধারণারও অতীত। এরপর ১২ জুলাই ১৯৮০ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর সামরিক সরকার দ্বীন ও আখলাখ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে। মিশর, সৌদি আরব এবং অন্যান্য মুসলিমদেশগুলোতে

www.pathagar.com

যারা পড়াশুনা করত তাদের সার্টিফিকেট তুরস্কে গ্রহণযোগ্য হতো না। এটা আমাদের সময় আইন করে গ্রহণযোগ্য করা হয়। চরিত্র বিধ্বংসী পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা এবং পরিবেশনার বিরুদ্ধে আইন করা হয়। আইন মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটাকে গুরুত্ব দিয়ে সাহসিকতার সাথে বাস্তবায়ন করে।

ওয়াক্ফ সম্পত্তি আত্মসাৎকারীদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয় এবং ওয়াক্ফ করা ৫০০ মসজিদকে পূণরায় স্থাপন করা হয়। ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয়কে ৩/৪ গুণ বৃদ্ধি করা হয়। অপরদিকে আত্মসাৎকৃত ওয়াক্ফ সম্পত্তিকে উদ্ধার করা হয়। রিসালায়ে নূরের মতো দ্বীনি বই-পুস্তক পড়ার ব্যাপারে সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয। এভাবে ইসলামী প্রকাশনায় এক নবদিগন্তের সূচনা হয় এবং ইসলামী জ্ঞানে এক বিপ্লবী ধারার সূচনা হয়। কুরআন শিক্ষার প্রসারের জন্য সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআন কোর্স চালু করা হয় এবং ৩০০০-এর বেশি কুরআন কোর্স সরকারি খরচে চালু করা হয়। একই সময় দারিদ্র্যতা এবং বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে 'ভারী শিল্পায়ন' শুরু করা হয়। জাতীয় যুদ্ধ, শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। নকল করে নয় সম্পূর্ণ নতুন এবং স্থানীয়ভাবে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে ব্যবহার করা হয়। ২০০ বড় ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং প্রাথমিকভাবে উৎপাদন শুরু করে। চিনিকল, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, নাইট্রোজেন শিল্প, কাগজ শিল্প, লোহা এবং ইস্পাত শিল্প, মেকানিক্যাল এবং কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রি, বিমান ফ্যাক্টরি, টুম্যুসান (Tumosan), টেকসান (Teksan), টেমসান (Temsan), টেসাশ এই সকল ফ্যক্টরি মিল্লি গরুশের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বিশ্বাস– বাচ্চা না দেওয়া বকরি থেকেও দুধ বের করে আনতে পারে। এর অন্যতম একটা উদাহরণ হলো রেফাহ পার্টির ক্ষমতার সময় আমাদের আবিষ্কৃত পূল পদ্ধতি (Pool System)।

ইজমিরের TEDAS জনগণের কাছ থেকে বিদ্যুৎ বিল আদায় করে থাকে। আদায়কৃত অর্থে সেই সময়ের শর্তানুযায়ী শতকরা ৪০ শতাংশ সুদে বেসরকারি ব্যাংকে জমা রাখত। এরপর কি হয়? সেই একই বেসরকারি ব্যাংক একই অর্থ সরকারকে ১৫০ শতাংশ সুদে আবার ঋণ দিত। কারণ তেদাশের (TEDAS) টাকা আছে কিন্তু এলাকাতে রাস্তা করার জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থের যোগান দেয়ার জন্য সরকার বেসরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ নিত। আচ্ছা

www.pathagar.com

বেসরকারি ব্যাংক যে রাষ্ট্রকে ঋণ দিচ্ছে এ টাকা কার? রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার নিজের টাকা ৪০ শতাংশ সুদে বেসরকারি ব্যাংকে জমা রাখে আবার তার সেই নিজের টাকা ১৫০ শতাংশ সুদে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। এই পদ্ধতির কারণে আমাদের পূর্বের সরকারগণ এই পথে ১৪ মিলিয়ন ডলার ঋণ করেছিল শুধুমাত্র সুদ পরিশোধ করার জন্য। আমরা আসার পর কি করেছিলাম?

১০ হাজার প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের অর্থকে একটি ইলেক্ট্রনিক সেন্টারে জমা করেছিলাম। রাষ্ট্রের যা আছে সব দেখেছি। সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, 'বেসরকারি ব্যাংকের সকল রাষ্ট্রীয় টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জমা দেবেন।' এই ইলেকট্রনিক প্রস্তুতি নিতে প্রায় ১ মাস সময় নেয়। এরপর দেখি কি, আমাদের রাষ্ট্রের অনেক টাকা আছে! হায় হায় আমরা কত ধনী। এই পদ্ধতির কারণে তেদাশের টাকাকে সরকার বিনা সুদে এলাজার রাস্তা তৈরির কাজে ব্যয় করার ফলে সরকার ঋণের হাত থেকে মুক্তি পায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরে পায়। আমার দেশের হত দরিদ্রদের এই অর্থকে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে, বহিঃশক্তির হাত থেকে বর্ণবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হই।

আমাদের পূর্বের সকল সরকার ৫ মিলিয়ন ডলার লোকসান করত। আমরা আসার পর পরই ২ বিলিয়ন ডলার লাভ করতে সক্ষম হই। তারা আসলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো লোকসান গুণত, আমরা আসায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো লাভ করতে শুরু করে। কারণ ঘোড়া তার মালিকের ইচ্ছা মতো চলে।

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

মাত্র ২শ' বছর আগেও প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আমাদের আলেমদের মত পোশাক পরিধান করাকে নিজেদের জন্য গৌরবজনক মনে করত। অথচ আজ আমরা কোন অবস্থায়? আমাদের আজকের শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা কি? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আজ এমন অবস্থায় উপনীত যে, যে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের দেশ জাতির জন্য কোনো লোক তৈরি হচ্ছে না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নিজেদের অতীত ইতিহাসকে খারাপভাবে উপস্থাপন করে, নিজেদেরকে হেয় করার, ছোট করার জন্য সকল ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের অপর্যাপ্ত দুনিয়াবী দর্শনকে আজ আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী উদ্দেশ্যগুলোকে আজ আমাদের লক্ষ্য হিসেবে পরিণত করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে সমগ্র জাতি আজ দিগভ্রান্ত। নিজ ঘরে তারা আজ প্রবাসীর মতো বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। আমাদের সন্তানগণ আজ জাতীয় চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে।

আজকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্ণমালা 'কায়া ঘুমাও, ঘুমাও, শুয়ে পড়, ঘুমাও' এভাবে শিখানো হয়। আমরা যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করব সেখানে বাচ্চাদেরকে সর্বপ্রথম এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তাকে পরিচয় করাবে। এরপর 'কায়া ঘুমাও, ঘুমাও, শুয়ে পড়, ঘুমাও' এর জায়গায় 'মাহমদু ওঠ, জাগ্রত হও, কাজ কর' এই শিক্ষা দেবে। মিল্লি গরুশের শিক্ষাব্যবস্থায় 'আখলাখ এবং আধ্যাত্মিকতা'ই হবে মূল ভিত্তি। সেখানে তুলে ধরা হবে আমাদের গৌরবময় ইতিহাস। অতীতকে চিনবে এবং পিতামাতা ও বড়দের সম্মান করা শিখবে। সকল প্রকার স্বার্থপরতা থেকে দূরে থাকবে, দেশ এবং জাতির জন্য জীবন উৎসর্গকারী হবে। এমন একটি প্রজন্ম আমরা তৈরি করতে চাই। এভাবে আজকের এই বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থার বদলে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হবে। স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যদি আমাদের সন্তানদের অন্তরকে চরিত্র এবং মাধুর্যের শিক্ষা দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিতে না পারি তাহলে কিছু আইন-কানুন দিয়ে তাদের এই ফাঁকা অন্তরকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বস্তুবাদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের সন্তানদেরকে শুধুমাত্র ব্যাঙের প্রজনন বিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা দিলেই হবে না, তাদেরকে আদব-কায়দা, লজ্জা, সতীত্ব এবং পর্দা সম্পর্কেও শিক্ষা দিতে হবে।

আমাদের সন্তানগণ ১৫ বছর স্কুলে পড়াশুনা করার পরও আদব-কায়দা, লজ্জাশীলতা, সতীত্ব এবং পর্দা এই শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারে না। হালাল, হারাম কি এটা সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ। আমরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের দেশ, জাতীর কল্যাণে কাজে লাগাতে চাই তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। আমাদের দেশকে বিভিন্ন আন্দোলন থেকে রক্ষা করার জন্যও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠকে আল্লাহ্‌র নাম দিয়ে শুরু করতে হবে। যদি সন্তানদেরকে হালাল-হারাম, আখিরাত এবং হাশরের দিনের হিসাব সম্পর্কে শিক্ষা দিতে না পারেন তাহলে এর পেছনের ফলাফলও প্রতিরোধ করতে পারবেন না।

শিক্ষা-দীক্ষায় যদি ইসলামী চেতনা থাকে তাহলে পরিবারেও শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। জীবনে সাফল্য ও শান্তি পেতে চাইলে আমাদের সবাইকে সবকিছুর পূর্বে নফসকে চিনতে হবে। এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে, যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদেরকে নফসের উপর বিজয়ী হওয়ার শিক্ষা দেবে। আমাদের দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। 'দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর এর বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে হবে। পুরুষ, মহিলা সবার জন্য এই স্লোগান হবে 'শেখ অথবা শিখাও'। মিল্লি গরুশ হিসেবে আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো প্রতিটি অঞ্চলে একটি টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। অপরদিকে দ্বীনি শিক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা। এজন্য ইসলামিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা, দ্বীনি আলেমদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করে সামাজিক জীবনে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। মূল্যহীন, স্বাধীন থিওরিভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার বদলে উপকারী এবং লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। কৃষি বিজ্ঞানীগণ দেশের কৃষি উৎপাদন কিভাবে বাড়ানো যায় এ ব্যাপারে গবেষণা করবে এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আজকে যে অচলাবস্থা এটা থেকে উত্তরণের পথ বের করবে।

www.pathagar.com

আমাদের ইঞ্জিনিয়ারগণ ইউরোপ থেকে আগত যন্ত্রপাতিগুলোকে প্রতিস্থাপন করার জন্য নয়, নিজেরাই ট্রাক্টর, ট্যাঙ্ক, বিমান তৈরি করতে সক্ষম হবে এমন শিক্ষাব্যবস্থা দাঁড় করাতে হবে। টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানাগারগুলোর সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে চুক্তি করিয়ে দিতে হবে। সকল ক্ষেত্রেই বড় বড় বিজ্ঞানী, আলেম, শিক্ষাবিদ তৈরি করার উপর আমাদের জোর দিতে হবে।

দেশ ও জাতির আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য দ্বীনি শিক্ষার বিকল্প নেই। দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সকল প্রকার রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালানো একান্ত প্রয়োজন। দ্বীনকে সকল প্রকার অপব্যবহার থেকে মুক্ত রাখার জন্য দ্বীনি শিক্ষা জনগণের মধ্যে এতটাই প্রসার ঘটাতে হবে যে, কেউ যাতে তাদেরকে প্রবঞ্চিত করতে না পারে। শিক্ষাজীবনে নিজের দ্বীনকে আসল উৎস থেকে জানতে না দেওয়ার চেষ্টা আমাদের জাতির জন্য সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। যারা দেশ ও জাতির সেবা করবে তাদেরকে দ্বীন এবং আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে হবে। মাদ্‌রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম শিক্ষা বিভাগকে আরও উন্নত করতে হবে যাতে তারা যুগ জিজ্ঞাসার সকল জবাব দিতে সক্ষম হয়।

কমপক্ষে তাদেরকে সাধারণ শিক্ষার সমান সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের প্রাপ্য অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। জাতির বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য, রাষ্ট্র এবং জনগণের সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য আলেমদের উপর অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন যাতে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করতে পারে এ জন্য তাদেরকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেয়া অপরিহার্য।

উন্নয়ন এবং অগ্রগতির মূল ভিত্তি হলো আখলাক এবং আধ্যাত্মিকতা। এজন্য এই জাতির আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি করার জন্য বড় বড় আলেম তৈরির সকল পরিকল্পনা নিতে হবে। মাদ্‌রাসা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। যেই জাতি মানব ইতিহাসে সত্য এবং আদর্শের পতাকাবাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে সেই জাতির সন্তানদেরকে শুধুমাত্র বস্তুগত জ্ঞান প্রদান করা সবচেয়ে বড় অন্যায়।

www.pathagar.com

তাদের অন্তরকে জাতীয় চরিত্র থেকে মাহরুম করার কারণে অল্প সময়েই এরা ক্ষতিকর ফল দেওয়া শুরু করেছিল। এর সুযোগ নিয়ে সুযোগসন্ধানী শক্তিগুলো আমাদের দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো–আমার দেশ ও জাতির টাকায় পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের আদর্শ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে আমাদের সন্তানদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল।

প্রযুক্তি যত উন্নতি লাভ করুক না কেন, সকল প্রকার উন্নতি-অগ্রগতির মূল উপাদান হলো মানুষ। মানুষ নামক উপাদানটি যত বেশি শক্তিশালী হবে, তার চরিত্র এবং নৈতিকতা যত বেশি সুন্দর হবে, উন্নয়ন ও অগ্রগতিও ততো বেশি শক্তিশালী হবে। মানুষ নামক উপাদানটির নৈতিক চরিত্র যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে এটা দিয়ে গঠিত কোনো কিছুই টেকসই হবে না। বরং শুধু শুধু অর্থ, শ্রম এবং শক্তি ব্যয় হবে।

আইন-কানুন যতই সুন্দর হোক না কেন, যদি এটার পালনকারী মানুষের অন্তরে হক এবং আদালতের প্রতি ভালোবাসা প্রবেশ না করে তাহলে সেটা বিপরীত রূপ নেবে। ন্যায়ের জায়গায় অন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে, সামাজিক ন্যায়বিচারের স্থানে সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি হবে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে এই লক্ষ্যগুলোর প্রতিফলনের জন্য এবং পাঠ্যক্রমকে এই অনুযায়ী সাজানোর জন্য আমরা সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

শিল্পায়ন

প্রথমেই আমি শিল্পায়নের গুরুত্ব তুলে ধরতে চাই। আমাদেরকে কেন শিল্পায়ন করতে হবে? আমাদের কাছে শিল্পায়নের গুরুত্ব কি? আমাদেরকে কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে? এসব প্রশ্নের একটি বোধগম্য জবাব পাওয়া যাবে আমাদের শিল্পায়নের সম্পর্কে জানার মাধ্যমে। এটা এমন কোনো বিষয় নয় যে, সুন্দর সমুদ্র তীরে একটি সুন্দর হোটেল করব কি করব না। মন চাইলে করব মন না চাইলে করব না এমন কোনো বিষয় এটা নয়। শিল্পায়নের বিষয়টি তুরস্কের অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে অনেক শুকরিয়া যে, আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা আমাদের জন্য বড়ই খুশির খবর। যারা জনসংখ্যা কমানোর পক্ষে মত দেয় আমরা তাদের এই চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করি। এই জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া মানে, আমাদের জাতি শক্তিশালী হওয়া। এই জাতি শক্তিশালী হলে শুধুমাত্র আমাদের অঞ্চল নয়, সমগ্র মানবতার সেবা করতে সক্ষম হবে। এটা বিশ্বাস করি বলে, তুর্কিশ জাতি যদি আরও বড় জনসংখ্যার অধিকারী হয় তাহলে তারা শক্তিশালী হয়ে সমগ্র মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। কিন্তু অপরদিক থেকেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

দুঃখজনক হলেও সত্য, অতীতের ব্যর্থতার জন্য আমাদের দেশে এখন লাখ লাখ ভাই বেকারত্বে ভুগছে। প্রতিবছর কমপক্ষে ৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা আজ জরুরি। বৃদ্ধি পাওয়া জনসংখ্যার নতুন কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পায়ন অত্যন্ত জরুরি। আমরা এটা বলতে পারব না যে, শিল্পায়ন ছাড়াও তো আরও অন্যান্য অনেক পথ রয়েছে।' হ্যাঁ আছে তবে সেগুলোর অবস্থা হলো এমন: আজকে আমাদের দেশে যে পরিমাণ কৃষি উৎপাদন হচ্ছে অন্যান্য দেশের দশ ভাগের একভাগ লোকবল দিয়ে সমপরিমাণ কৃষি উৎপাদন করতে পারছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়ন সেখানে লোকবলের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দিচ্ছে। এজন্য সেখান থেকে আমাদেরকে লোকবলকে প্রত্যাহার করার কথা ভাবতে হবে। আগামীদিনে জনগণের মূল কর্মক্ষেত্র হবে শিল্প-কারখানা।

www.pathagar.com

অর্থনীতির সকল সেক্টর একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, সেবামূলক কাজে অবশ্যই মানুষের দরকার রয়েছে। কিন্তু সেবামূলক সেক্টরে যেমন– পরিবহন সেক্টরে, কৃষিক্ষেত্রে যদি আমাদের উৎপাদন থাকে, তাহলে সেটা পরিবহনের জন্য যোগাযোগ খাতের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অর্থাৎ শিল্প এবং কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যতীত শুধুমাত্র যোগাযোগ (Transportation) ব্যবস্থাকে উন্নত করা একটা হাস্যকর অবস্থা। শিল্পায়নের দ্বিতীয় অন্যতম কারণ হলো পৃথিবীর দেশগুলো এক দেশ অপর দেশের সাথে পণ্য বিনিময় করে থাকে, দিন যত যাচ্ছে এটার অবস্থাও দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর শ্রমিকদের ১ ঘণ্টার আয়, অনুন্নত ও গরিব দেশগুলোতে যারা গরম, ঠাণ্ডা এবং কঠোর পরিশ্রম করে তাদের ১০ ঘণ্টার আয়ের চেয়েও বেশি। আজকের বর্তমান পৃথিবীর পদ্ধতি এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শিল্পায়ন মানে হলো, একটি দেশের জনগণের সময়কে মূল্যায়ন করার নামান্তর। এজন্য যারা উন্নত দেশে পরিণত হতে চায়, ভারী শিল্পায়নে গুরুত্ব দেয়া তাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। শিল্পায়ন ছাড়া একটি দেশ কখনো শক্তিশালী হতে পারবে না। আমাদের দেশ এবং জাতিকে পৃথিবীর বুকে পুনরায় একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত করতে চাইলে শিল্পায়নের কোনো বিকল্প নেই।

উদাহরণস্বরূপ জার্মানিতে একটি শহর রয়েছে যেটার নাম হলো সলিগেন। বহু শতাব্দী পূর্বে ক্রুসেডের সময় এই সলিগেন ক্রুসেডারদের সাথে আমাদের দেশে এসেছিল, তার নামানুসারে এই শহরের নাম দেওয়া হয় সলিগেন। সে জার্মান মুসলমানদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীতে সে এ কারণে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল। আমি যখন জার্মানিতে ছিলাম তখন এটা শুনেছিলাম। শহরের নাম একজন ক্রুসেডারের নামে রাখা হয়েছে এ কথা তারা আমাকে বলেছিল। ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করে সে মুসলিমদের কাছ থেকে এটা শিখেছিল যে, 'ইস্পাতে কিভাবে পানি দিতে হয়'। এই সলিগেন, তার দেশে ফিরে যাওয়ার পর জার্মানির এই গ্রামে একটি লোহার দোকান দিয়ে মুসলিম দেশ থেকে শিখে যাওয়া জ্ঞান অনুযায়ী সেখানেও এই কাজ শুরু করে। আর আজকে সেই গ্রাম জার্মানির সবচেয়ে বড় শিল্প নগরীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে

www.pathagar.com

পাই আজকের এই উন্নত ইস্পাত শিল্প-কারখানার শিক্ষক হলাম আমরা। যার মাধ্যমে আজ তারা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। আমরা যেই সভ্যতার ধারক-বাহক সেই ইসলামী সভ্যতা এতটাই উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ সভ্যতা। যদি আমরা আরও কাছের কোনো ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ ইস্তাম্বুলের বিজয়ের মাধ্যমে একটি যুগকে বন্ধ করে আরেকটি নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। এতো বড় একটি ঘটনা অবশ্যই এটা সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহর আধ্যাত্মিক উচ্চতাকেই সর্বাগ্রে নিয়ে আসে। কিন্তু সবসময় আমাদেরকে এটা খুব সতর্কতার সাথে বুঝতে হবে যে, এই উচ্চমানের আধ্যাত্মিকতার সাথে সকল ধরনের বস্তুগত উচ্চতাও সমান্তরালভাবে ছিল। সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ বাইজন্টাইনকে পরাস্ত করার সময় জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রযুক্তি সকল দিক দিয়ে বাইজান্টাইনের চেয়ে অনেক অনেক অগ্রসর ছিল। ইতিহাসে সর্বপ্রথম আমরাই সিরিজ আকারে বল নিক্ষেপ করি। আজকেও ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন স্থানে পতিত হওয়া সেই বল (লোহার বল) গুলোকে দেখলেই বুঝা যায় ৫০০ বছর পূর্বে কত বড় একটা শিল্পকর্মের অধিকারী আমরা ছিলাম। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি হিসেবে একথা বলতে চাই যে, সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ সেই সময়ে যেই আগুনের গোলাসমূহ নিক্ষেপ করেছিলেন, আজকের যুগে এসেও আমরা সেই গোলাসমূহ বানাতে পারব এমন কোন ফ্যাক্টরি আমাদের নেই।

ক্রুসেডাররা ইনেবাহতিতে একটি নৌজাহাজকে বলতে গেলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিল। কিন্তু উসমানীয়গণ মাত্র ছয় মাসের অল্প সময়ের ব্যবধানে, আগের চেয়েও অনেক বড় এবং শক্তিশালী একটি নৌবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা সামান্য কোনো ঘটনা নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরা আমাদের অনেক বিষয় নকল করে আমাদেরকে এই বলে প্রতারিত করে যে, 'আচ্ছা তোমাদের ইতিহাসে ব্যক্তিগত কিছু সফলতা রয়েছে। অল্প পরিসরে শিল্পকর্মও (Art) আছে কিন্তু শিল্পায়ন (Industrialization) অন্য বিষয়। শিল্পায়ন মানে হলো শৃঙ্খলা, শিল্পায়ন মানে হলো সংগঠন (Organization)। তোমরা শিল্পের কারিগর (Artisans) হয়তো তৈরি করতে পেরেছিলে কিন্তু আজকের আধুনিক শিল্পায়ন সম্পর্কে তোমরা অজ্ঞ।'

এই চিন্তাকে তারা ধীরে ধীরে প্রকাশ করতে চাচ্ছে। এজন্য উসমানীয়দের ইনেবাহটি ঘটনার উপর আলোকপাত করা গুরুত্বপূর্ণ। এটা কোনো শিল্প (Art)

www.pathagar.com

কর্মের ঘটনা ছিল না। আজকের চিন্তা-চেতনার আলোকে বলতে গেলে মূলত এটা ছিল অনেক বড় একটি শিল্পায়নের ফলাফল। এর মধ্যে বিশ্বাস ছিল, পরিকল্পনা ছিল, সংগঠন ছিল, শৃঙ্খলা ছিল। আজকের হিসেবে বলতে গেলে এটা ৬ মাসে ৫০টি বিমানবাহী জাহাজ বানানোর শামিল।

আরও বলা হয়ে থাকে যে, 'আচ্ছা এটা তো ৪০০ বছর আগের কথা। আমরা তো সেই সময় সকল দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলাম এটা কি। কিন্তু তার পরে তো সবকিছুই হারাতে শুরু করেছি।' এই চিন্তাও সঠিক নয়। শিল্পায়নের

ক্ষেত্রে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিকট অতীত পর্যন্তও বিরাজমান ছিল। শিল্পায়নের (Heavy Industrialization) ক্ষেত্রে অনেক বড় সংগাম করেছিলেন উসমানী খিলাফতের খলিফা সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ খান।

তার ৩৩ বছরের শাসনামলে ভারি শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তিনি অনেক ভারী শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজকের তুরস্কের আধুনিক উন্নয়নের ভিত্তি মূলত তিনি স্থাপন করেছিলেন। ইস্পাত দিয়ে তিনি প্রসিদ্ধ গালতা সেতু স্থাপন করেছিলেন। ইস্তানবুলের বিখ্যাত মিনারেল ওয়াটার কোম্পানি হামিদিয়ে পানি কোম্পানি, কাগজ ফ্যাক্টরি এবং ইলেকট্রিক প্লান্ট সুলতান আব্দুল হামিদ খানের সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। সুলতান আব্দুল হামিদ খানের সময় শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আরও অনেক বড় বড় সফলতা অর্জিত হয়েছিল।

আনাতোলিয়ার অনেক জায়গায় যে সকল সেনাবাহিনীর ব্যারাক এবং রাষ্ট্রীয় ভবন দেখা যায় এগুলো মূলত তার আমলেই নির্মিত। আজকের আনাতোলিয়া যার সকল রাস্তাঘাটের ভিত্তিপ্রস্তর মূলত ১৮৯৩-১৯৯৮ সালে তার আমলেই নির্মিত হয়েছিল। ৫ বছরের মধ্যে তারা ৭ হাজার কিলোমিটার রেলপথ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার সময় এভাবে দেশে উন্নয়নের এক অনুপম দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই মহান মানুষটিকে আমাদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। একজন অত্যাচারী, দুষ্কৃতিকারী এবং প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি হিসেবে তাকে বিশ্বব্যাপী পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে।

আজকের আধুনিক শিল্পায়নের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে আমরা পেছনে ছিলাম এটা মোটেই সত্য নয়। তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হলো আজ থেকে ১৫০ বছর পূর্বে ইস্তাম্বুলে বিশালাকারে ফ্যাক্টরিগুলো। সেই ফ্যাক্টরিগুলো আজও পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনশীল। একটি বড় টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি হিসেবে ব্রিটেনে যখন

www.pathagar.com

টেক্সটাইল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত তখনই সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এটা ব্রিটেনের কারখানার চারগুণ বড়। আমাদের সেই সময়ের পূর্বপুরুষগণ এগুলোর উপর যথার্থ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। সুলতান আব্দুল হামিদ শিল্পায়নের (Industrialization) ব্যাপারে কি পরিমাণ গুরুত্বারোপ করেছিলেন আশা করি সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা আমাদেরকে উপকৃত করবে। শিল্পায়নের দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তুরস্কের জন্য ফায়দা বয়ে এনেছিল। তুরস্কে ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের উৎপাদন এই সময় শুরু হয়। কৃষি যন্ত্রের উৎপাদনও এই সময়ই শুরু হয়। ভারী শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এই সময় নেয়া হয়। আঙ্কারাতে বিমানের ইঞ্জিন তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় এগুলো ছিল শিল্পায়নের সর্বোচ্চ চূড়া। এর থেকে উন্নত শিল্প সেই সময়ে আর পথিবীর কোথাও ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময় এই পদক্ষেপগুলো আর সামনের দিকে অগ্রসর হয়নি। ১৯৪৭ সালে বৈদেশিক সাহায্য শুরু হয়। এই সাহায্যগুলো একটি ভুল পদ্ধতিতে আমরা ব্যবহার করি। এই সাহায্যের অর্থ উৎপাদনের পরিবর্তে আমরা উৎপাদিত পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে ব্যয় করেছি। অথচ এই অর্থগুলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা প্রয়োজন ছিল।

এটাকে আমি দু'টি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চাই। সাল ১৯৫৫। বৈদেশিক সাহায্য আসছে। দেশের অনেক বড় বড় প্রয়োজনগুলো সেই সময় এই অর্থের মাধ্যমেই পূরণ করা হতো। সেই সময় ইস্তাম্বুলে ৪০০ পাবলিক বাসের প্রয়োজন ছিল। আমি সেই সময় ইস্তাম্বুল টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম। এখনো মনে আছে যে, সেই সময় জাপান, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার কোম্পানিগুলোসহ ৬৪টি কোম্পানি এই পাবলিক বাসগুলো দেয়ার ব্যাপারে আবেদন করে বলেছিল যে, 'আমরা আপনাদেরকে বাসগুলো দিই'। ইস্তাম্বুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে আমাদের কাছে আসেন। তারা বলেছিলেন এই প্রকারের বাসগুলোর জন্য এমন দাম চাচ্ছেন কোনটি সবচেয়ে উপযুক্ত দাম, বিবেচনা করে আমাদেরকে একটা রিপোর্ট দেন' আমরা এজন্য যে রিপোর্টটি লিখেছিলাম আশা করি সেটি এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। আমার মতে এই রিপোর্ট ঐতিহাসিক একটা রিপোর্ট হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। কারণ সেই সময় এই বিষয়টিকে পর্যালোচনা করে আমাদের বন্ধু-বান্ধবসহ প্রথম প্যারাতে যে কথাগুলো

www.pathagar.com

লিখেছিলাম সেগুলো ছিল 'এই ৫০০ বাসের জন্য যে পরিমাণ অর্থ চাওয়া হয়েছে আমরা পর্যালোচনা করে দেখলাম যে, এই অর্থ দিয়ে এমন বাস তৈরি করার কারখানা প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি এই বাসগুলোও উৎপাদন করা যাবে।' আমরা বলেছিলাম যে, 'আসুন এই অর্থগুলো বাস কিনে ব্যয় করার চেয়ে আমাদের দেশেই সে রকম কারখানা প্রতিষ্ঠা করি।' ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় একটি ঘটনা ঘটে। ইস্তাম্বুলে বিশ্ব মহাসড়ক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কনভেনশনে সকল দেশের রাস্তা বিশেষজ্ঞগণ যোগদান করেছিল। সেই সময়ের একটি অঞ্চলের মহাসড়ক ব্যবস্থাপক যুগোস্লাভিয়ার একটি গ্রুপকে এক রাত তিনি মুসাফিরগিরি করান। পরের দিন রাতে একটি প্রোগ্রামে যুগোস্লাভিয়ার প্রতিনিধি দল কি বলেছিলেন সেগুলো তিনি এভাবে বলছিলেন:

আমরা যুগোস্লাভিয়াতে রাস্তা কিভাবে করব এটা আপনাদের কাছে শেখার জন্য তুরস্কে এসেছিলাম। কারণ আপনাদের মতো আমরাও ১৯৪৭ সালে বৈদেশিক সাহায্য নিয়েছি। আপনারা এই বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে অন্যদেশ থেকে মেশিন নিয়ে এসে এই দশ বছরের মধ্যে আপনাদের দেশে অনেক রাস্তাঘাট স্থাপন করেছেন। রাস্তা তৈরি করার পদ্ধতিগত দিক থেকে আপনারা আমাদের চেয়ে অগ্রসর। আমরা সেই বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা অন্য দেশ থেকে মেশিন আমদানি করার পরিবর্তে মেশিন তৈরিকারী কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছি। এখন আমরা প্রয়োজনীয় মেশিন ও যন্ত্রপাতি নিজেরাই উৎপাদন করতে পারি। এখন রাস্তা কিভাবে করতে হয় এটা শেখার জন্য আপনাদের কাছে এসেছিলাম। এটাও শেখার পর আমাদের নিজেদের মেশিন দিয়ে আমাদের নিজেদের রাস্তা আমরা নিজেরাই করব।'

এটা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে, বাহির থেকে আনা এসব মেশিনারি অল্পদিন পরই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। হ্যাঁ, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাস্তা তৈরি করতে পেরেছিলাম। কিন্তু সেসব রাস্তা তৈরি করতে যেসব মেশিনারির প্রয়োজন সেটার অধিকারী আমরা হতে পারিনি। এই সময় যুগোস্লাভিয়া, স্পেনের মতো দেশগুলো এই সাহায্যগুলোকে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কাজে লাগিয়ে শিল্পায়নের দিকে গুরুত্ব দিতে পেরেছিল।

শুধুমাত্র ৫০০ নুডলস কারখানার মালিক হওয়ার নাম শিল্পায়ন নয়। শিল্পায়ন হলো সেই ৫০০ নুডলস কারখানা করতে পারবে এমন কারখানা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করা। শিল্পায়নের অর্থ এটা নয় যে, যে ১০টি নকল কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছে বাইরে থেকে খুচরা যন্ত্রাংশ এনে, এখানে বসে সেই যন্ত্রাংশগুলো জোড়া লাগানো। এমন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে সেটা ৫ থেকে ১০ বছরের ব্যবধানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে।

এ রকম শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করার মতো প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অধিকারী হওয়াকে আসল শিল্পায়ন বলে। তাছাড়া '৫০টি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি করেছি, ৪টি চিনির ফ্যাক্টরি করেছি, ৩০০টি নুডুলসের ফ্যাক্টরি করেছি 'এমন কথা সত্যিকারের শিল্পায়নের কোনো তাৎপর্য বহন করে না।

সত্যিকারের শিল্পায়ন হলো কারখানা তৈরি করতে পারবে এমন কারখানা প্রতিষ্ঠা করা। শিল্পায়নের আসল রুহ হলো সর্বশেষ উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তির অধিকারী হওয়া। সত্যিকারের শিল্পায়নের জায়গায়, দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের দিকে আমরা বেশি জোর দিয়েছিলাম। শিল্পায়নের দিক থেকে অনগ্রসর হওয়ার মূল কারণ এটাই। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটি বড় সমস্যা হলো এগুলো প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুসম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়া। আজ ইস্তামুল-ইজমিত সড়কের আশপাশে নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠা করার মতো কোনো অবস্থা নেই। অপরদিকে অন্যান্য শহরগুলোতে করখানার সংখ্যা অপ্রতুল যার কারণে সেখানে বেকারত্ব ও ক্ষুধা দারিদ্র্যের হারও বেশি। এই জন্য সেই সকল শহরেও শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান সময় শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পেছনে থাকার অন্যতম বড় একটি কারণ হলো, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব না দেয়া এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।

ট্রাফিক পুলিশ যেভাবে কাজ করে থাকে রাষ্ট্রও সেই ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা পালন করেছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন প্রজেক্ট সরকারকে দিয়েছিলেন কিন্তু রাষ্ট্র ট্রাফিক পুলিশের মতো হয়তোবা লাল সংকেত অথবা সবুজ সংকেত দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। তুরস্কের কোথায় কোন ধরনের শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত করা সবচেয়ে বেশি উপকারী? এই এলাকাগুলো কিভাবে নির্ধারিত হবে? অবশ্যই সকল পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি এই অনুযায়ী হওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এগুলো করা হয়ে ওঠেনি। বিভিন্ন আবেদনপত্রকে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' এই ধরনের জবাব দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেছেন।

www.pathagar.com

আরেকটি বিষয়কে এখানে উল্লেখ করা খুবই জরুরি মনে করছি। আর সেটা হলো যেসব শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সেগুলোকে পরিচালনা করার জন্য সকল ধরনের প্রকৌশলী (Engineering) সেবা বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল। অথচ একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী জনশক্তি। আজকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে এটা বলতে হচ্ছে যে, আমরা বলে থাকি যে, আমরা একটি চিনির ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা সত্যিকার অর্থে কি করতে পারি? সেখান থেকে শুধু আমরা উৎপাদন করতে পারি; কিন্তু যান্ত্রিক কোনো কিছু আমরা বুঝি না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চিনির ফ্যাক্টরির নিয়ন্ত্রণ করা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য কম্পিউটারের বড় বড় প্রোগ্রামিং এবং পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ।

একটি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌশলগত (Strategic) সেক্টরের মধ্যে অন্যতম একটি বড় সেক্টর হলো প্রতিরক্ষা শিল্প (Defense Industry) কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরও বিদেশের সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের বিমান, ট্যাঙ্ক, ক্ষেপণাস্ত্র এগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকি। ইতিহাস সাক্ষী, কাদেশ যুদ্ধে (Battle of Kadesh) সবচেয়ে বেশি যুদ্ধযান (Combat Car) ব্যবহৃত হয়েছিল। ফেরাউনদের শাসনাধীন মিশরের সাথে মেসোপটেমিয়ার হিতিতদের (Hitit) মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে ফেরাউনের সেনাবাহিনী বিজয় লাভ করেছিল। কারণ মিশরের যুদ্ধযানগুলোর চাকা ছিল (Combat Car) লোহার তৈরি এবং এর ভেতরে দু'জন মানুষ অবস্থান করতে পারত। অপরদিকে মেসোপটেমীয়দের যুদ্ধযানগুলো ছিল পাথরের তৈরি এবং এতে একজন মানুষ অবস্থান করতে পারত। এই লোক একই সাথে গাড়ি চালাত আবার তীরও নিক্ষেপ করত। টেকনিক্যাল (Technically) মিশরের সেনাবাহিনী অধিক শক্তিশালী ছিল। কাদেশ যুদ্ধে পাথরের চাকা লোহার চাকার কাছে পরাজিত হয়েছিল। যুদ্ধ প্রযুক্তিতে (War Technology) যারা একধাপ এগিয়েছিল তারাই এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল।

ইয়াহুদিরা আজ তাদের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে মানবতাকে ধ্বংস করছে। আমেরিকা লোহিত সাগরে রণতরী মোতায়েন করে বাগদাদে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। এন্টারপ্রাইস (Enterprice) রণতরী ইস্তানবুলে আসার পর আমাদের একটি পার্লামেন্টারি গ্রুপকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সেই রণতরীটিকে পরিদর্শনের

www.pathagar.com

জন্য। পরিদর্শন শেষে তারা পরবর্তীতে সেখান থেকে ফিরে এসে, আমাকে তাদের সে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিল। তাদের বর্ণনা মতে, বড় একটি হলরুমের ভেতর নারী-পুরুষ একত্রে বসে আছে। সেখানে বসা সবার পেছনে কফি প্রস্তুত করার জন্য জায়গা এবং সামনে কফির পেয়ালা রাখা। তারা সবাই টেবিলে বসে কফি খাচ্ছে আর গল্প করছে। 'এটা কেমন রণতরী'। এ কথা বলে আশ্চার্যান্বিত না হওয়া অসম্ভব।

এরপর তারা মাইকে ঘোষণা দিলো যে, মেহমানদের জন্য এখন আমাদের কার্যপ্রণালী প্রদর্শন করব। ক্যাপ্টেন বললেন যে, 'এখন আমরা যে ক্ষেপণাস্ত্রটি নিক্ষেপ করব এটা এখান থেকে ১০ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত মহাসাগরের অমুক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানবে।' সবাই আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছে।

ক্যাপ্টেন তার হাতের কফির পেয়ালা রেখে, ডানপাশে ঘুরে কম্পিউটারের কিবোর্ডে চাপ দিচ্ছে। সেই ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছে। জাহাজে একটি ধাক্কা লেগে, জাহাজ থেকে প্রবল বেগে বের হয়ে যায় ক্ষেপনাস্ত্রটি। আমাদেরকে পর্দায় (Screen) দেখানো হয় যে, ক্ষেপণাস্ত্রটি তার পথেই যাচ্ছে এবং তার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতেই আঘাত হানছে। অর্থাৎ তারা প্রযুক্তিকে এতটাই উন্নত করেছে যে, কফি খেয়ে বসা অবস্থাতেই তারা সবচেয়ে বড় জুলুম করতে পারে।

এখন আমরা মুসলিম বিশ্ব এবং সমগ্র শোষিত পৃথিবীব্যাপী নিজেদের অধিকারকে রক্ষা করতে চাই। কিভাবে রক্ষা করব? তার ৪০টি রণতরী রয়েছে। তাহলে আপনি বলবেন যে, 'আমিও ৪০টি রণতরী বানাব।'

আপনি ৪০টি বানাতে বানাতে সে ৮০টি বানিয়ে ফেলবে। তখন কি করবে?

কিভাবে তুমি তাদেরকে তোমার কথা বোঝাবে? তাদের কাছে যে এই সর্বোচ্চ প্রযুক্তির অস্ত্র রয়েছে আমরা কি কখনো তাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারব?

আপনি উপরে এমন একটি চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করবেন যে, সেই যুদ্ধ জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র উপরেই ধ্বংস করতে পারবেন। এমনকি আরও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঐ ক্ষেপণাস্ত্রকে ঘুরিয়ে লক্ষ্যবস্তু সেই জাহাজ/রণতরীকে ধ্বংস করতে পারবেন। বাতাসে এমন অনেক ঘর্ষণ ধাতু আছে যে, যেগুলো

www.pathagar.com

দিয়ে এমন ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা সম্ভব যেগুলো তাদের তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র থেকে হাজার গুণ দ্রুতগামী হবে। এরপর বাতাসে একটি চুম্বকীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি হবে সেটা তার নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রকে ধরে অকার্যকর করে দেবে। তাদের যে রণতরী বানাতে খরচ হয় ১০০ মিলিয়ন ডলার। আর আমি বললাম, এই চুম্বকীয় চাল/ব্যূহ বানাতে খরচ হবে মাত্র ৫ লাখ ডলার। তার ১০০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে তৈরি অস্ত্রকে, আপনি ৫ লাখ ডলার দিয়ে তৈরি অস্ত্রের মাধ্যমে প্রতিহত করতে পারছেন। প্রযুক্তি এমন একটি জিনিস।

এটা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বড় একটি রহমত। অনুন্নত দেশগুলোও যে উন্নত দেশ হিসেবে উচ্চ মর্যাদার দাবিদার দেশগুলোর সামনে দাঁড়ানোর জন্য এটি একটি বড় সুযোগ। আপনি যখন এটা করবেন তখন আর আপনাকে রণতরী বানাতে হবে না। তার তৈরি রণতরী (Aircraft Carrier) আপনার বলে গণ্য হবে। সে যতই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করুক না কেন এটা তার উপরেই নিক্ষিপ্ত হবে। আমরা কি বর্ণনা করছি? কোথা থেকে আমি এসব জানি? আমি একই সময় একজন টেকনিক প্রফেসর। বছরের পর বছর ধরে আমি এই গবেষণা করেছি। এজন্য বিদেশীদের সাথে সম্পৃক্ত এবং অপূর্ণাঙ্গ একটি শিল্পায়নকে কখনো গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের শিল্পায়ন, আমাদের যুদ্ধ এই পয়েন্ট থেকে শুরু হয়। তাদের যদি ক্ষেপণাস্ত্র থাকে আমরাও যাতে সেগুলো ঘুরিয়ে তাদের উপর মারতে পারি এমন প্রযুক্তি আমাদেরকে উদ্ভাবন করতে হবে।

আমরা বলে থাকি যে, আমাদের এই সম্মানিত জাতি এই সামর্থ্য এবং শক্তি অর্জন করতে সক্ষম। আর এটা তখনই সম্ভব যখন একটি বিশ্বাসের আলোকে সবকিছু পরিচালিত হবে।

www.pathagar.com

ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নবী করীম (সা.)-এর সময় থেকে খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া, আব্বাসীয়, সেলজুক এবং উসমানীয় খলিফাগণ ১১শ' বছর পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলে। ৬২২ সাল থেকে ১৬৮৬ সাল পর্যন্ত ইসলাম সমগ্র দুনিয়াকে শাসন করেছে এবং একটি সোনালী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে এটাকে রক্ষা করেছেন। সর্বশেষ ৩০০ বছর দ্বিতীয় ভিয়েনা আক্রমণের পরে অর্থাৎ ১৬৮৩ সালের পর অর্থনৈতিক শক্তি বর্ণবাদী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীদের হাতে অর্পিত হয়েছে। দুনিয়ার সকল মানুষকে নিজেদের গোলাম বানানোর জন্য তারা আজকের দুনিয়ার এই শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। আজকে আমরা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উপনীত হয়েছি। এটি ইতিহাসের একটি মাহেন্দ্রক্ষণ/যুগসন্ধিক্ষণ। দুনিয়ার শাসনভার কি বর্ণবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতেই থাকবে? নাকি মানবতা একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করবে?

আমরা দেখতে পাই যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমগ্র দুনিয়া সাম্রাজ্যবাদের অধীন ছিল। আর এগুলো হলো উসমানীয় সাম্রাজ্য, রাশিয়ান সাম্রাজ্য, গ্রেট ব্রিটেন এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে এই সকল সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলশ্রুতিতে এরপর/তদস্থলে কিছু দেশে ফ্যাসিস্ট একনায়কের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে স্ট্যালিন, হিটলার, মুসোলিনি, ফ্যাংকো উল্লেখযোগ্য। এরা মানুষের উপর চরম জুলুম-নির্যাতন পরিচালনা করে। এই জুলুমের ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ পুনরায় মানবতাকে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চলে স্নায়ুযুদ্ধ (cold war) সমগ্র দুনিয়া দু'টি ব্লকে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মানবতা পুনরায় এক সঙ্কটের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে থাকে। গ্লাসনস্ট আন্দোলন (Glasnost movement) এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মনে করা হয়েছিল যে, পৃথিবীতে, শান্তি-শৃঙ্খলা, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। যাই হোক না কেন স্নায়ুযুদ্ধ (cold war) শেষ হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, প্রত্যাশিত কোনো

www.pathagar.com

কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে আরও অনেক বেশি রক্ত ঝরছে। অনেক বেশি শোষণ হচ্ছে এবং আরও অনেক কান্না-আহাজারি আকাশ-বাতাস ভারি করে তুলছে। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পাশ্চাত্যের নেতৃবৃন্দ শান্তিময় একটি পৃথিবী গড়ে তোলার পরিবর্তে পুনরায় শত্রুতা এবং অশান্তিময় একটি বিশ্ব গড়ার পথ বেছে নিয়েছেন।

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে দুনিয়ার সবচেয়ে স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলোতে ফিলিস্তিন, ইরাক, বসনিয়া, আফগানিস্তান, সিরিয়া, চেচনিয়াতে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা চালানো হয়েছে। শুধু ইরাকের ঘটনাবলী থেকেই এটা বুঝার জন্য যথেষ্ট যে, দুনিয়ার কর্তৃত্ব কোন পাশ্চাত্যের নেতৃবৃন্দের কাছে রাখা নিরাপদ নয়। স্নায়ুযুদ্ধ (cold war) শেষ হওয়ার পর সকল কিছু মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে যাওয়া এবং শুধু মুসলিমদেরকেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা নিঃসন্দেহে আকস্মিক কোনো বিষয় নয়। এর পেছনে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনাই বিশ্বব্যাপী শোষকগোষ্ঠীর (Global exploiters) পরিকল্পনা মাফিক হচ্ছে।

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, ১৯৯০ সালের শুরুতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার (Margaret Thatcher) স্কটল্যান্ডে অনুষ্ঠিত NATO'র সম্মেলনে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তার সেই বক্তব্য। স্নায়ুযুদ্ধের পর, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর 'এখন আমরা কি করব, NATO কি বিলুপ্ত করে দেবো?' এই প্রশ্নের উত্তরে থ্যাচার এই জবাব দিয়েছিলেন।

এর বিপরীতে পৃথিবীতে শান্তিশৃঙ্খলা এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন একটি পথে প্রবেশ করা এবং সঠিক পথে ফিরে আসা জরুরি। এজন্য একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের সময় অতীতের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নেয়া অন্যতম প্রধান শর্ত।

কি সেই শিক্ষা? প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো বস্তুবাদ (materialism) নয়, আধ্যাত্মিকতাকে (Spirituality) মূল ভিত্তি হিসেবে নিতে হবে। কারণ টোট্যালিট্যারিয়ান শাসনামলের সকল জুলুম-নির্যাতন, বস্তুবাদী দর্শনের একটি ফলাফল। ডারউইন দর্শনের মতে শক্তিশালী জাতিগুলো দুর্বল জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দেবে। এটা তাদের জন্মগত অধিকার। উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য সর্বদাই একটি শত্রুর প্রয়োজন এবং এই শত্রুর সাথে সর্বদা যুদ্ধ

www.pathagar.com

করা হলো জীবনের একটি নীতিমালা। এজন্য সকল টোটালিটেরিয়ান শাসনামলের একনায়ক (Dictator) শাসকরা এই ভুল মানসিকতার প্রভাবাধীন ছিল। এই দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠা এবং আধ্যাত্মিকতাকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষের দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বস্তুবাদ (materialism) এবং ডারউইনবাদ Darwinism) আর চলতে পারে না। বরং এর পরিবর্তে পারস্পরিক সৌহার্দ, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি এবং শৃঙ্খলার বার্তাবাহক আধ্যাত্মিকতাই মানবিকতাকে মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে। আজ রাশিয়ার মানুষগণও গির্জার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এজন্য বিংশ শতাব্দী থেকে আমাদেরকে যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি নিতে হবে সেটি হলো বস্তুবাদ (materialism) নয়, আধ্যাত্মিকতা (Spirituality); অন্যকথায় যুদ্ধ নয়, শান্তির শিক্ষা। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে সংলাপকে (Dialogue) মূল ভিত্তি হিসেবে নিতে হবে। যুদ্ধের ব্যাপারে বলতে গেলে, দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো পাশ্চাত্য এর ভিত্তিমূল ইসলামকে উৎখাত করতে চায়। সত্যিকার অর্থেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি হলো, উসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা, বিভক্ত করা এবং মুসলিমদেরকে নিঃশেষ করে দেয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পশ্চিমারা মুসলিম দেশগুলোকে দখল করে নিতে শুরু করে। কিন্তু মুসলিম জনগণকে নির্মূল করতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম দেশগুলো পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করতে শুরু করে। কিন্তু এবার মুসলিম দেশগুলো অন্য একটি শোষকগোষ্ঠীর জালে আটকা পড়ে। শতাব্দীর শেষের দিকে তারা ইসলামকে শত্রু হিসেবে টার্গেট করে এই শত্রুকে নির্মূল করার জন্য যুদ্ধ এবং গণহত্যা পরিচালনা করে। এর মাধ্যমেও কোনো শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, শত্রুতা কখনোই শান্তিপূর্ণ সমাধান বয়ে আনতে পারে না। শান্তিশৃঙ্খলার জন্য শত্রুতা নয় সংলাপ, আন্তরিকতা এবং সংহতি, শান্তিপূর্ণভাবে একসাথে বহু সংস্কৃতির বসবাসযোগ্য একটি পথিবীর জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অন্য একটি তদবির হিসেবে দ্বিমুখিতা (Double Standard) নয়, আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। ইসলামের ভিত্তিমূল শান্তি এবং সংহতি হওয়ার পরও পাশ্চাত্য ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সাথে একই

www.pathagar.com

কাতারে ফেলার চেষ্টা চালিয়েছে। এই আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র সমাজের বিভাজন, শত্রুতা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থাকেনি একই সাথে মুসলিম দেশগুলোতেও দ্বিমুখী নীতির বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে। এই দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনের ফলে মুসলিম দেশগুলোর উপর আরোপিত অবরোধ সেই দেশগুলোর নিরীহ জনসাধারণ মানবিক মূল্যবোধের সাথে বসবাস করার অধিকারটুকুও হারিয়েছে। এই মানসিকতা/শত্রুতা সমাজের মধ্যে সুখ-শান্তির বদলে হতাশা সৃষ্টি করেছে। শিক্ষা নেয়ার মতো এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানবাধিকার এবং স্বাধীনতা Freedom) শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, সমগ্র মানবতার জন্য প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ দ্বিমুখিতা নয়, ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা জরুরি।

আরও একটি তদবির হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ববোধ (Superiority) নয় সমতাকে (equality) মূল ভিত্তি হিসেবে নেয়া। বিংশ শতাব্দীতে কিছু উন্নত দেশ তাদের অর্থনৈতিক শক্তির জোরে অন্য দেশগুলোকে সবসময় নিচু ও হীন হিসেবে গণ্য করেছে। তদুপরি একই বিংশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক শক্তি কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে তার স্থান পরিবর্তন করতে পারে এটাও দেখিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বিগত ২০ বছরে দূরপ্রাচ্যের (Fareast) দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতি এবং এই দেশগুলোর কিছু কিছু গ্রাম যেখানে মাঝিরা (মাছ ধরে যারা) বসবাস করত সেই গ্রামগুলোতেও মাত্র ১০ বছরের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল প্রতিষ্ঠা করা এ কথাই প্রমাণ করে যে, অর্থনৈতিক শক্তি কত সহজে এবং কত দ্রুত তার অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে। গবেষণায় দেখা যায় যে, একবিংশ শতাব্দীতে দুনিয়ার অর্থনীতিকে পরিচালনাকারী গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলো ইউরোপ এবং আমেরিকার পরিবর্তে দূরপ্রাচ্য (Fareast) এবং এশিয়াতে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শান্তির জন্য উঁচু-নিচুর ধারণাকে ভুলে সমমর্যাদাকে ভিত্তি হিসেবে ধরতে হবে।

অর্থাৎ সবাইকে এবং সকল সমাজের মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করা, গোলামের মতো আচরণ না করা বিংশ শতাব্দী থেকে আমাদের যে শিক্ষানীতি হবে তার মধ্যে এটি একটি। পুনরায় তদবির হিসেবে শোষণ নয় পারস্পরিক সহযোগিতাকে ভিত্তি হিসেবে নিতে হবে। বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের কিছু ধনী দেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে চড়া সুদে ঋণ দিয়ে, তাদের ধন-সম্পদকে এককভাবে শোষণ করছে। উন্নয়ন/সফলতা একসাথে হয়। প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকলে কারো উদরপূর্তি থাকলেও সে সুখী হতে পারে না। একগোষ্ঠী অপর

www.pathagar.com

গোষ্ঠীকে শোষণ করা, দরিদ্র করে রাখা, উন্নতি-অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করা পরিবেশ তাদের জন্যও ক্ষতিকর। অনুরূপভাবে বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর এই চরিত্রহীন ও নিষ্ঠুর আচরণ ধনীদেরকে আরও ধনী এবং দরিদ্রদেরকে আরও দরিদ্রে পরিণত করেছে। সমাজের মধ্যে আয়ের সমতাকে বিনষ্ট করেছে। দরিদ্র দেশগুলো উচ্চ সুদে নেয়া ঋণের সুদও পরিশোধ করতে পারবে না এ অবস্থায় উপনীত হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় এই ভুল পদ্ধতি/নীতির পরিবর্তন না হলে একবিংশ শতাব্দীতেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যা, দরিদ্র আজকের লাখো লাখো দরিদ্র মানুষ অতীতের মতো চোরাপথে কিংবা অবৈধ পথে ইউরোপে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে। তাই বিংশ শতাব্দী থেকে নেয়া অন্যতম শিক্ষা হলো মানবগোষ্ঠীর মধ্যে শোষণ নয়, সকলের জন্য উপযোগী এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের নেতৃত্বে ১৫ জুন ১৯৯৭ সালে D-8 প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি। বিংশ শতাব্দীর পক্ষ থেকে একবিংশ শতাব্দীকে দেয়া মূল্যবান একটি উপহার। আজকে পৃথিবীতে ১৯০টি দেশ রয়েছে। এর মোট জনসংখ্যা হলো প্রায় ৬০০ কোটি। এই ১৯০টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত দেশ হলো ৭টি, যার জনসংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি। এই দেশগুলো নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য এবং পৃথিবীতে তাদের প্রভাবকে আরও সম্প্রসারণের জন্য G-7 প্রতিষ্ঠা করেছিল।

এখন তারা G-8 এ পরিণত হয়েছে। এর বাইরে ১৭০টি দেশ যাদের মোট জনসংখ্যা ৫০০ কোটি তাদের এমন কোনো সংগঠন নেই। উন্নয়নশীল দেশসমূহকে নিয়ে গঠিত D-8 সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের গঠিত সংগঠন G-8 এর সমান্তরাল একটি সংগঠন। আমরা সকলেই জানি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইয়াল্টা (Yalta) কনফারেন্সের মাধ্যমে আজকের এই দুনিয়াকে গঠন করা হয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা গঠিত এই দুনিয়া সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, যুদ্ধবিগ্রহ, শোষণ-বঞ্চনা ও জুলুম ব্যতীত অন্য কোনো ফলাফল বয়ে আনতে পারেনি। এখন D-8 এর সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা হলো দ্বিতীয় একটি কনফারেন্সের আয়োজন করে সত্যের ভিত্তিতে নতুন এক দুনিয়া গঠন করা।

D-8 গঠন করার অন্যতম বড় উদ্দেশ্য হলো, এটা ভবিষ্যতে বিশ্বের সকল দেশকে একত্রিত করবে এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে। আফ্রিকান ইউনিয়ন, আরবলীগ, Far Fast Asian Union, দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকান ইউনিয়ন স্বতন্ত্রভাবে কিছু কাজ করলেও G-8 এর সাথে পাল্লা দিয়ে কোনো কাজ করার ক্ষমতা রাখে না। এজন্যই D-8 সবার আগে সকল উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করবে এবং গতিশীলভাবে কাজ করার সামর্থ লাভ করার জন্য প্রথমে ৮টি দেশের সমন্বয়ে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, মিশর, তুরস্ক এবং নাইজেরিয়াকে নিয়ে গঠিত হয় D-8। D-8 এর এই সদস্য দেশগুলো স্ব স্ব অঞ্চলে আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসেবে এবং ভূ-রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। উন্নয়নশীল সকল দেশ এবং অন্যান্য তুর্কিশ অধ্যুষিত দেশসমূহসহ সকল মুসলিম দেশ তাদের জনসংখ্যা যাই হোক না কেন তারা সকলেই স্বাভাবিকভাবেই D-8 এর সদস্যভুক্ত। D-8 এর সদস্য দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং তাদের আঞ্চলিক চুক্তি ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার করেই D-8 এর মূলনীতিসমূহকে ঠিক করা হয়। D-8 হলো বিশ্বজনীন একটি প্রতিষ্ঠান। এর শক্তি অর্জনের স্বার্থে পরস্পরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, তাদের নিজেদের স্বার্থে যোগদানকারী আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের নীতিমালার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অপ্রয়োজনীয় সমস্যাবলী যাতে বের হতে না পারে এ ব্যাপারে গভীর দৃষ্টি রাখা প্রভৃতি এর মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত।

D-8 যদি একে-অপরের সাথে মিলে কাজ করে তাহলে এটি অনেক বড় একটি সম্ভাবনাময় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। এই বিশাল সম্ভাবনাকে নিজের সদস্যদের জন্য এবং সমগ্র মানবতার জন্য উন্নয়ন ঘটানো D-8 এর একটি বড় উদ্দেশ্য। এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য শুধুমাত্র মুখের কথায় নয়, উন্নয়ন এবং উৎপাদন বিশ্বাসী D-8, তার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে এবং কোনো কোনো বিষয়ে অগ্রাধিকার দেবে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করেছে। কোন দেশ কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারবে, কোন প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারবে তাদেরকে সে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তুরস্ককে শিল্প উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অন্যসব দেশের মতো তুরস্কও D-8 এর প্রজেক্টগুলোকে আগ্রহের সাথে আঁকড়ে ধরে

www.pathagar.com

এবং আমাদের দল ক্ষমতায় আসার পর রেফাহ-ইয়ল (Refar-Yol) সরকারের সময় এক্ষেত্রে অনেক বড় বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। D-8 এর সদস্যভুক্ত সকল দেশের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশকবাহী বিমান উৎপাদন প্রকল্প এই সময় সফলতার সাথে শেষ হওয়া প্রকল্পসমূহের একটি।

D-8 দেশসমূহের লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত সকল প্রকল্প সদস্যভুক্ত দেশসমূহের উন্নতির জন্য নিয়ামক শক্তির ভূমিকা পালন করবে। D-8 এর এই সকল লক্ষ্যকে বাস্তবায়নে সদস্যগুলোর উন্নয়ন অথবা মানবতার উন্নয়নের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতাকে সাথে নিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণের প্রাক্কালে 'নতুন দুনিয়া'র প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রথমে ৪২০ মিলিয়ন জনসংখ্যা সম্বলিত ৮টি সদস্য দেশের উন্নতির জন্য এবং শোষিত ও বঞ্চিত ৫০০ কোটি মানুষের সুখ, শান্তি ও উন্নতির জন্য D-8 এর সদস্যভুক্ত দেশসমূহকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা বাঞ্ছনীয়। D-8 এর সদস্যভুক্ত সকল দেশের জনসংখ্যার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাও গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, শুধুমাত্র আমাদের ভ্রাতৃপ্রতীম তুর্কি প্রজাতন্ত্রসমূহ নয়। সমগ্র সোভিয়েত ব্লকে ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং ন্যায়ভিত্তিক একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়েছি। সেই সময় তুরস্কে নিযুক্ত রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত এবং পরবর্তীতে ইউরেশিয়া অঞ্চলে অনেক বড় দায়িত্ব পালনকারী আলবার্ট চেরনিশেভের আমন্ত্রণে 'ন্যায়ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা' নামে একটি কনফারেন্স করেছিলাম। দিনব্যাপী এই কনফারেন্সে আমরা সবাই তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ন্যায়ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে ব্রিফিং দিয়েছিলাম রাশিয়ান এম্বাসিতে অনুষ্ঠিত আমাদের এই কনফারেন্সে, রাশিয়া থেকে অনেক প্রফেসর ও শিক্ষাবিদগণও যোগদান করেছিলেন। এই ব্রিফিং এর পর, আলবার্ট চেরনিশেভ তার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর, আমাদেরকে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলো এবং আমাদের মাঝে এমন একটি কথোপকথন হয়েছিল।

জনাব এরবাকান! আমরা জানি যে, সকল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতি যে কোনো সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আপনি আমাদের সামনে যে অর্থনৈতিক মডেল পেশ করেছেন এটি কোনো সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তির সাথে সম্পৃক্ত? এ ব্যাপারে জানতে আমি খুবই আগ্রহী।

www.pathagar.com

আমি বলেছিলাম যে, 'জনাব চেরনিশেভ! আপনি কি খুঁজছেন?' –সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আমরা আসলটা খুঁজে বেড়াচ্ছি। –আপনার মতে আসলটা কি?

–আসল, আসল, এছাড়া তার কিছু হতে পারে কি?

–এই বিশ্ব জাহানে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এর সবই আসল। আসল সত্য আমাদের সামনে বিদ্যমান। এটাকে আমাদের দেখা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা চাই আমরা যেটাকে খুঁজে পাব সেটা যাতে জ্ঞানভিত্তিক হয়। আমি বললাম, অবশ্যই সেটা জ্ঞানভিত্তি হবে। কিন্তু জ্ঞান (ইলম) কি? সেটা আগে আমাদের বর্ণনা করতে হবে। ইলম (জ্ঞান) হলো, আল্লাহ্ বিশ্বজাহানে যে আইন-কানুন পেশ করেছেন সেটা খুঁজে পাওয়া। আপনি ইচ্ছা করলে সেটা আপনার বিবেককে (আকল) ব্যবহার করে সে আইন-কানুনসমূহকে প্রাকৃতিক পন্থায় খুঁজে পেতে পারেন অথবা আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত কুরআন শরীফে চোখ রাখুন, আপনি একই ফলাফল পাবেন। কেননা আমাদের ধারণা মতে কোনো সত্যকে যখন আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে খুঁজে পাব একই সময় সেই সত্যটিকে আমাদের দ্বীনেও খুঁজে পেতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞান+দ্বীন = সত্য (আসল) ফর্মুলাটি প্রযোজ্য।

এটা শুনে সেদিনের সেই কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীগণ কেমন একটা গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন, আজও সেটা সেদিনের মতো স্মরণ করতে পারি।

এখান থেকে যে ফলাফল পাই সেটা হলো: মূলত সত্য আমাদের সামনে উপস্থিত। দুনিয়াবী সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আমাদের যুক্তিগুলো এমন হলে সত্যকে খুঁজে পাওয়া আরও সহজ হবে।

এজন্য সকল ঘটনাবলীকে হেদায়েতের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। আর হেদায়েত হলো, আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) প্রদত্ত সমাধানসমূহ। ব্যক্তি জীবন অথবা সামাজিক জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইসলাম প্রদত্ত মূলনীতিসমূহের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যে সমাধান দ্বীন থেকে উৎসারিত হয় না, সেটা কখনো সত্যিকারের কোনো সমাধান হতে পারে না।

দীর্ঘ ৭০ বছর মানবতাকে শোষণ ও জুলুম-নির্যাতন করার পর কম্যুনিজম দেওলিয়া ও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এখন কম্যুনিজমের যমজ ভাই পুঁজিবাদ

www.pathagar.com

(Capitalism) ও এই সময় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে এর মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয় যে, পুঁজিবাদও (Capitalism) আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এবং সময়ের ব্যবধানে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অবশ্যই ধ্বংস হবে।

কেননা পুঁজিবাদ কতিপয় গোষ্ঠী ব্যতীত সমগ্র মানবতাকে দুর্বিষহ এক যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দিয়েছে। বঞ্চিত এবং শোষিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সকল কার্যপ্রণালী এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ মানবজাতিকে অন্ধকার এক ভবিষ্যৎ ব্যতীত অন্যকিছুর প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি। তথাপি যদি আজকের এই বিশ্বব্যবস্থা জারি থাকে, তাহলে দিনে ১ ডলারের নিচে আয়কারী মানুষের সংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশিতে পৌঁছে যাবে। আজ পৃথিবীতে ২শ' কোটি মানুষ কাঠখড়ি ও পশুর বিষ্ঠা দিয়ে খাবার রান্না করে থাকে। গ্রামাঞ্চলের ২শ' কোটি মানুষ আজ স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত অবস্থায় বসবাস করছে।

প্রতিদিন ৪০ হাজার শিশুসহ ১ লাখ ৫০ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। প্রায় ৮০ কোটি মানুষ রাতের বেলায় উপোস অবস্থায় ঘুমাতে যায়। ৫০ কোটি মানুষ পান করার জন্য বিশুদ্ধ পানি পায় না। এক পরিসংখ্যান মতে আগামী বছরগুলোতে জিম্বাবুয়ের মানুষের গড় আয়ু ২০ বছর কমে যাবে। কিন্তু শোষণকারী বর্ণবাদী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এখনো চিন্তা করে যে, 'আমি জিম্বাবুয়ের এই মানুষগুলোকে আরও কিভাবে শোষণ করতে পারি?' দুনিয়ার একদিকে রয়েছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য অপরদিকে রয়েছে অপচয় ও বেলেল্লাপনা।

আফ্রিকার শিশুগুলো ক্ষুধার যন্ত্রণায় মারা যাচ্ছে, অথচ, পাশ্চাত্যের ৬টি দেশের কুকুর ও বিড়ালের খাবারের জন্য ১ সপ্তাহে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৭০০ মিলিয়ন ডলার। মেয়েরা শুধুমাত্র তাদের প্রসাধনী ও মেকআপের জন্য প্রতি বছর ৬৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে থাকে। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ১০ জন ধনীর সম্পদের পরিমাণ ১৩৩ বিলিয়ন ডলার। অপরদিকে সবচেয়ে দরিদ্র ২০টি দেশের মোট ঋণের পরিমাণ হলো ৫.৫ বিলিয়ন ডলার। শুধুমাত্র ইউরো ডিজনি'র (Euro Disney) নির্মাণ ব্যয় এর চেয়ে বেশি। এমনিভাবে ধনী দেশগুলো যদি তাদের সম্পদের শতকরা এক ভাগও আফ্রিকাতে দান করে তাহলে সেখানে একজন মানুষও দরিদ্র থাকবে না। বর্তমান দুনিয়ার ভিত্তি এমন একটি নির্মম অর্থব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতি হলো অত্যাচারির-

www.pathagar.com

নিপীড়িত একটি পদ্ধতি। আর এই কারণেই কম্যুনিজমের (Communism) মতো এই ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই অন্যায়-অবিচারকে চিরতরে বিদায় করার জন্যই পরিশ্রান্ত না হয়ে আমরা সকল শক্তি দিয়ে ন্যায়ভিত্তিক পদ্ধতি সকলকে বুঝিয়ে থাকি। ন্যায়ভিত্তিক এই পদ্ধতিকেই মানবতায় উত্তরণের একমাত্র পথ বলে আমরা বিবেচনা করে থাকি।

কারণ অন্যান্য সকল পদ্ধতি মৌলিকতার দিক থেকে এক ও অভিন্ন। সবগুলোই সুদী ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ধনীদের থেকে নয় দরিদ্রদের কাছ থেকে কর (Tax) আদায় করে থাকে। প্রতিদানহীনভাবে মুদ্রা ছাপিয়ে থাকে। মুদ্রার (Currency) মূল্য তাদের নির্দেশে কমে ও বাড়ে। ব্যাংকগুলো স্তন থেকে দুধ দোহন করার মেশিনের মতো। ধনীদেরকে ঋণ দেয় কিন্তু বর্ধিত ঋণগুলো কৌশলে গরিবদের দ্বারা শোধ করায়। একজন আরেকজনের সমালোচনা করার সময় বলে থাকে যে, 'আমি তার চেয়ে অনেক কম ব্যথা দেব।'

ন্যায়ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় কোনো সুদ থাকবে না, অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া কর (Tax) রহিত করা হবে, মুদ্রার মূল্য সত্যিকারের বিনিময় মূল্য হিসেবে গৃহীত হবে, প্রতিদানবিহীন/বিনিময়বিহীন কোনো মুদ্রা ছাপান হবে না। ঋণকে ন্যায়ভিত্তিকভাবে এবং উপকারী কাজ করবে এমন সবাইকে দেওয়া হবে। এভাবে প্রত্যেকেই আজ যে টাকায় ১টি রুটি কিনতে পারছে আগামী দিনে সে একই টাকায় ৩টি রুটি ক্রয় করতে পারবে। আজকে যে টাকায় সে যা উৎপাদন করছে এই পদ্ধতিতে সে এর তিনগুণ উৎপাদন করতে পারবে। সবকিছুর দান ৩ থেকে নেমে ১-এ আসবে। সবাই তিনগুণ জিনিস কেনার সক্ষমতা অর্জন করবে। ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থায়, কে কোন ধর্ম, বর্ণ থেকে এল এটা বিবেচনা করা হয় না। সমগ্র মানবতা জন্মগতভাবে প্রদত্ত অধিকারসমূহের সমান মালিক বলে বিবেচিত হবে। এগুলো হলো রাসূলগণের শিক্ষা দেওয়া অধিকারসমূহ। সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শিক্ষার স্বাধীনতা, সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা, বসবাসের স্বাধীনতা এবং ইবাদত-বন্দেগী করার স্বাধীনতা রয়েছে। এই স্বাধীনতাসমূহের যদি একটিও ঘাটতি থাকে তাহলে সে দেশে মানবাধিকার নেই বলেই বিবেচিত হবে।

এগুলো হলো মানুষের মৌলিক অধিকার। আমরা যখন অধিকারের কথা বলব তখন আমাদেরকে এটা এভাবেই গ্রহণ করতে হবে। ন্যায়বিচার

www.pathagar.com

(আদালত)-এর উপর ভিত্তি করে কিছু অধিকার রয়েছে। দু'জন মানুষকে দিয়ে যদি একই কাজ করিয়ে নেই, একজনকে ৫০০ টাকা দিয়ে থাকলে অপরজনকেও ৫০০ টাকা দিতে হবে। এটাই আদালত বা ন্যায়বিচারের দাবি। পরিশ্রম মানুষের অধিকারের জন্ম দেয়। আমি পরিশ্রম করেছি আপনার বোঝা কমিয়ে দিয়েছি, আপনার নিয়ামতকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছি। এটা আমার জন্য অধিকারের জন্ম দেয়। আমার এই অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো আপনার অবশ্যই কর্তব্য। পাশ্চাত্যের অধিকারের (হক-Right) ভিত্তি হলো শক্তি, সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Majority), শ্রেষ্ঠত্ব (Superity), স্বার্থপরতা (Benifit)। তাদের সবকিছুর মূল ভিত্তি হলো 'আমার শক্তি আছে, আমার যা ইচ্ছা তাই করব।

জর্জ ডব্লিউ বুশ বলেছিল, 'ইরাকে আমার স্বার্থ আছে। আমি শক্তিশালী।' এ কথা বলে সে নির্লজ্জভাবে ইরাকে হামলা চালিয়েছিল। একটি দেশ ধ্বংস করা এবং লাখ লাখ মানুষ হত্যার জন্য সে দায়ী হয়ে আছে। আর শ্রেষ্ঠত্ব হলো 'আমি সাদা, তুমি কালো। আমি শহরের অধিবাসী তুমি গ্রামের অধিবাসী। আমি গাড়িতে উঠব আর তুমি এটাকে ধাক্কিয়ে নিয়ে যাবে।' এ কথা বলে নিজেকে বড় হিসেবে প্রকাশ করা।

সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে (Majority) অধিকারের (Right) কারণ হিসেবে গ্রহণকারীগণ, নিজেদের আঙ্গুল উঠিয়ে নামিয়ে অধিকার (Right) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশ্বাস করে। আঙ্গুল উঠিয়ে নামিয়ে কখনো সত্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিবেক এবং জ্ঞানের সমন্বয়ে সত্যকে (হক) খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আর সেটা হলো ইসলাম। ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত সমাজ হলো, মানবকেন্দ্রিক (Human-Centered), সত্যকে সবকিছুর উপরে স্থান দেওয়া এবং বন্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়ের ভিত্তিতে বন্টনের অনুসরণ। ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য মতাদর্শ কর্তৃক প্রবর্তিত ব্যবস্থার (System) বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যগুলোর যে কোনো একটির কারণেও অন্যান্য মতাদর্শের নীতি পদ্ধতিসমূহ মানুষের কোনো প্রকার সেবা করতে সক্ষম নয়। **এই পার্থক্যসমূহ কি?** মিল্লি গরুশের বাইরে অন্যান্য মতাবলম্বীগণ আধ্যাত্মিক (Spiritual) নয়। নিয়ে আসুন তাদের সকলের নীতিমালাসমূহকে পড়ুন, ভেতরে আধ্যাত্মিকতা (Islam) নেই। ভেতরে আখিরাত নেই। আধ্যাত্মিকতা ব্যতীত আখিরাতের

www.pathagar.com

সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। আখিরাতের সফলতা রাখুন, দুনিয়াতেও কোনো সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। একজন মানুষ কেন শহীদ হবে, তার দেশকে কিভাবে রক্ষা করবে? আধ্যাত্মিকতা ছাড়া শাহাদাতের মর্যাদা কি করে আমাকে বুঝাবে? আধ্যাত্মিকতাবিহীন একজন মানুষের কাছে শাহাদাত, বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সত্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত আমাদের এই সভ্যতা, শক্তির (power) উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পাশ্চাত্য সভ্যতার চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা বিজয়ের পর মানুষের অধিকারকে নিশ্চিত করেছিলেন। তাদের সকলের প্রাপ্য অধিকার তিনি দিয়েছিলেন। মুসলমানদের উপর যারা চরম জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছিল তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেছিলেন। এটা কতই না মহান এক শিক্ষা; কতই না মহান এক উপমা। হযরত উমর (রা.) বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করেছিলেন। সকলকে তিনি বিশ্বাসের স্বাধীনতা (Freedom Of Faith) দিয়েছিলেন। হিংস্র অন্তরের অধিকারী রিচার্ড এসে বায়তুল মুকাদ্দাসে ১ লাখ মুসলমানকে হত্যা করে। তাদের ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস অনুযায়ী, রাস্তায় এত পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল এতে ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল। এর ৬০ বছর পর সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আসেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করেন। তিনি এটা বলেননি যে, 'তুমি ১ লাখ মানুষ মেরেছ। আমি দুই লাখ মানুষ মারব। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও হযরত উমর (রা.) যে আচরণ করেছিলেন তিনিও তাদের প্রতি একই আচরণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর উম্মত, আমি কাউকে আঘাত করব না।' তিনি কোনো প্রকার ক্রোধ প্রকাশ করেননি।

অপরদিকে পাশ্চাত্যের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন আন্দালুসিয়ার ধ্বংসযজ্ঞ, শত বছরের যুদ্ধ, এঙ্গিজিসিয়ান, (Engizisyon), ত্রিশ বছর যুদ্ধ, হিটলার ও স্ট্যালিনের ধ্বংসযজ্ঞ... আরও যে কত। আমাদের ইতিহাস যদি পাশ্চাত্যের হতো আর পাশ্চাত্যের ইতিহাস যদি আমাদের হত তাহলে তারা আমাদের কথাও বলতে দিত না। চুপ করে থাক, তারা একথা বলত। এই ইতিহাস নিয়ে তারা কিভাবে কথা বলে? লজ্জাহীনভাবে কিভাবে মানবাধিকার এবং স্বাধীনতার কথা বলে? আমাদের ইতিহাসের সাথে পাশ্চাত্যের ইতিহাসের কোনো তুলনাই চলে না। মানুষকে সভ্যতা শিখানো, মানবাধিকার

www.pathagar.com

শিক্ষাদানকারী, জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো দানকারী আমাদের এই সভ্যতাকে পরিত্যাগ করে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে, খ্রিস্টিয়ান ইউনিয়নে প্রবেশ করতে চাও। কি রেখে কোথায় যাও? বসুন রাত পর্যন্ত একটা চিন্তা করুন! আমরা কি করছি, আমরা কে, আমরা কি? এজন্য আমাদের সভ্যতাকে (Civilization) ইউরোপীয় সভ্যতার চেয়ে ছোট করে দেখা অনেক বড় একটি ভুল এবং যারা এ ধরনের চিন্তা-চেতনার অধিকারী তারা আমাদের দেশের ও মানবতার কোনো সেবা করতে সক্ষম নয়।

যারা দালালী মানসিকতার অধিকারী তারা ন্যায়ভিত্তিক একটি নতুন দুনিয়া 'প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ঘুর্ণাক্ষরেও চিন্তা করে না। নতুন একটি দুনিয়ার প্রতিষ্ঠা যে কতটা প্রয়োজন, এটা সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহালও নয়। কারণ এমন একটি দুনিয়া সম্পর্কে তারা জানেই না। এ জন্যই বর্তমান এই দুনিয়ার সকল পদ্ধতিকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পবিরর্তন না করে একটি শান্তিময় পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া মানুষের সেবা করা মোটেই সম্ভবপর নয়। এজন্য এই (দালালী) চিন্তার অধিকারীগণ যেসব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত এগুলো বাচ্চাদের কাজ। এ চিন্তা দিয়ে মানবসেবা সম্ভব নয়। আমরা ইতিহাসের একসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। হয়তো আমরা ইতিহাসের এক সম্মানজনক অবস্থায় পৌছে যাব অথবা নির্যাতিত ও শোষিত হয়ে ইসরাইলের একটি প্রদেশে পরিণত হব। ইতিহাসের সম্মানজনক অবস্থায় পৌছার একমাত্র পথ হলো 'মিল্লি গরুশ' এর চিন্তা-চেতনাকে ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

ভুল এবং দেশ/জাতীয়তা বিরোধী রাজনীতির কারণে আমাদের দেশ আজ ধাপে ধাপে ইসরাইলের প্রদেশ হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা যেসব পদক্ষেপ-নিচ্ছে এর শেষ হবে ইসরাইলের প্রদেশ হওয়ার মধ্য দিয়ে। আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশ করবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশের উদ্দেশ্য কি? ইউরোপীয় ইউনিয়নের হাতে বন্দী হয়ে পড়বে। ১৫ বছর সংলাপ চলবে। কোন কোন বিষয়ে আপসরফা করতে হবে প্রতিদিন সেসব বিষয়ে আলোচনা করবে। যদি তারা চায় তাহলে নেবে আর যদি না চায় তাহলে নেবে না। সময় মতো ইসরাইল ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশ করবে। ইসরাইলের সাথে এক দেশে পরিণত হবে। কারণ তারা বলবে 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন অনেক বড় হয়েছে এটাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা দরকার, মধ্যপ্রাচ্যের জন্য আলাদা

www.pathagar.com

একটি ব্লক হওয়া প্রয়োজন।' এরপর তুরস্ক এবং ইসরাইল এক দেশে পরিণত হবে। এটি হলো তাদের উদ্দেশ্য। ইসরাইলের প্রদেশ বানানো। আমাদের জাতি আজ অপরিণামদর্শী শাসকদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে। যেসব বিষয়ে আপোস করা হচ্ছে তা গোপন রাখা হচ্ছে। দেশবাসী ভুল ও অসত্য তথ্যের মাধ্যমে প্রতারিত হচ্ছে। এজন্য যারা সত্যকে গোপন করে দেশবাসীকে প্রতারিত করে তারা কখনো দেশ এবং জাতির সেবা করতে পারে না। সকল টেলিভিশন, সংবাদপত্র তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নিজেরাই বলে, নিজেরাই খেলে। মিথ্যা তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে সত্যকে আড়াল করে।

আজকের জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ (IMF) এ সবগুলো সংগঠন সাম্রাজ্যবাদীদের, ইয়াহুদিদের সংগঠন। একাধিপত্যবাদী (monopolist) পুঁজিকে (Capital) প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে বর্ণবাদী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বর্তমান দুনিয়ার এই পদ্ধতি দ্বারা ন্যায়পরায়ণমূলক কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। এসব প্রতিষ্ঠানের স্থলে নতুন একটি জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমানে দুনিয়ার এই পদ্ধতিকে পবিরর্তন করার জন্য নতুন এক রাজনৈতিক দীক্ষা দেয়া হবে। প্রযুক্তিগত সহযোগিতা (Technological Co-operation) প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ সক্ষমতা অর্জন করা। নতুন মুদ্রাব্যবস্থা চালু করা হবে (New Currency) মানুষ যাতে ডলারের মাধ্যমে শোষিত না হয়।

নতুন সহযোগিতা চুক্তির মাধ্যমে নতুন বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হবে। সকল দেশের উন্নয়ন এবং সেবার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করবে। নতুন একটি আইএমএফ প্রতিষ্ঠা করা হবে। মানুষকে শোষণ করা সে কাজ হবে না, দুনিয়াতে যাতে একটি দরিদ্র মানুষও অবশিষ্ট না থাকে সে লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। সাংস্কৃতিক সাহায্য সংস্থা (muslim countries cultural collaboration) গড়ে তোলা হবে। মানুষকে সত্যিকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কি সেটা জানানো হবে। প্রচার ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হবে। সঠিক খবর প্রচারিত হবে এবং মানুষকে সত্যিকারের খবর জানানো হবে। নারী ও পরিবার সুরক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। নারীদের উপর সকল জুলুম ও বঞ্চনার অবসান হবে এবং পারিবারিক সম্পর্ক ধরে রাখার জন্য কাজ করবে। কেননা সফলতার মূল চালিকা শক্তি হলো পরিবার বা পারিবারিক সংগঠন।

www.pathagar.com

উপরে বর্ণিত উচ্চক্ষমতার এই প্রতিষ্ঠানসমূহ D-8 সদস্যভুক্ত দেশসমূহে, D-60 এবং D-160 দেশগুলোতে ১০টি উচ্চক্ষমতার কমিটি গঠন করা হবে এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ একটি সিনেমা যদি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি হুমকি হয় এবং এটা প্রদর্শিত হবে কি হবে না এর জন্য বিভিন্ন স্তরে আবেদন করে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পড়তে হবে না। এই প্রতিষ্ঠান মিটিং আহ্বান করবে, সকল দেশেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সকল দেশগুলোকে ধ্বংসের দিকে নয়, সত্য ও সুন্দরের দিকে আহ্বান করবে। নতুন দুনিয়া হবে এমন একটি দুনিয়া। **মানবজাতির ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে নতুন একটি দুনিয়ার বিশেষত্বসমূহকে এভাবে সাজাতে পারিঃ** নতুন ন্যায়ভিত্তিক দুনিয়ায় দ্বীনি ও নৈতিকতার আলাদা মর্যাদা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলাদা পদ্ধতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলাদা পদ্ধতি, রাজনৈতিক পদ্ধতির আলাদা পদ্ধতি, নতুন দুনিয়ায় রাষ্ট্রের যা দায়িত্ব রাষ্ট্র সেটাই করবে। রাষ্ট্র তার ক্ষমতা বলে কোনো অনৈতিক কাজ করতে পারবে না। এজন্যই মানবজাতির ইতিহাসে অর্থনৈতিক পদ্ধতি বার বার পরিবর্তিত হয়েছে এবং উন্নত হয়েছে। এখন পুনরায় এটার পরিবর্তন প্রয়োজন। কেননা এটা এভাবে চলতে পারে না। রাষ্ট্র মানুষকে শোষণ করছে, নির্যাতন চালাচ্ছে। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে এক ডলারের নিচে ব্যয় করতে বাধ্য হবে। মানবজাতি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। অধিকার সম্পর্কে অসচেতন মানুষ তার অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে পারবে না। সকল জায়গায় সবকিছুরই উপর সত্যের অবস্থান থাকা বাঞ্ছনীয়। এজন্য সবাই অংশীদার হবে এবং কাজে অংশগ্রহণ করবে। এভাবে হক ও আদালত (সত্য ও ন্যায়ের) উপর ভিত্তি করে একটি নতুন দুনিয়া গড়ে উঠবে। প্রায় ৩৫০ বছর ধরে শক্তিকে (Power) যারা একমাত্র শক্তি মনে করে এবং এর উপর ভিত্তি করেই যারা সবকিছু গড়ে তুলেছে সেই বর্ণবাদী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করছে। এটি এমন একটি সভ্যতা যেটি শক্তিকে সবার উপর স্থান দেয়। শুধু জুলুম-নির্যাতন পরিচালনা করে যাচ্ছে। তথাপি এই সভ্যতা যমজ দুই ভাইয়ের মতো সমগ্র মানবতাকে শোষণ করছে। এদের একটি হলো কম্যুনিজম (Communism) অপরটি হলো পুঁজিবাদ (Capitalism)।

মৌলিকভাবে এই দু'টি পদ্ধতি এক ও অভিন্ন। কারণ এই দু'টি আদর্শই শক্তিকে যারা সবার উপর স্থান দেয় সেই আদর্শের দিকেই ধাবিত হয়। আর

www.pathagar.com

এই কারণে এই পদ্ধতি হলো নিপীড়কদের একটি পদ্ধতি। মানুষকে শোষণের হাতিয়ার। যাদের কাছে অর্থ রয়েছে এটা শুধুমাত্র তাদেরকেই খুশি রাখে এবং মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কাছে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে থাকে। আজ কম্যুনিজমের পতন হয়েছে। শত্রু ছাড়া কোনো আদর্শ টিকে থাকতে পারে এই বাতিল চিন্তার অধিকারী ইয়াহুদি সম্পদশালী গোষ্ঠী, পুঁজিবাদের শত্রু হিসেবে ইসলামকে তাদের প্রতিপক্ষ বানিয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদও (Capitalism) দুনিয়াতে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা থেকে আজ যোজন যোজন দূরে অবস্থান করার কারণে কম্যুনিজমের মতো ধ্বংস হতে বাধ্য। সমগ্র মানবতা আজকের এই অবস্থায় হঠাৎ করে এসেই উপনীত হয়নি। প্রথম মানুষ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। এই উত্থান পতনসমূহকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের বৃদ্ধি, বেঁচে থাকার স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক পর্যায় পেরিয়ে বর্তমান সময়ে আসার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। এই অর্থনৈতিক পর্যায়সমূহ একদিক থেকে সেই সময়ের সভ্যতাসমূহকে প্রভাবিত করেছে এবং সভ্যতা ও অর্থনৈতিক পর্যায় এবং পদ্ধতিসমূহকে প্রভাবিত করেছে। মানবজাতির ইতিহাসে যতগুলো সভ্যতা অতিবাহিত হয়েছে সেগুলোর দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই যে, মানবজাতির ইতিহাসে 'শক্তিকে উচ্চে স্থানদানকারী' সকল সভ্যতার পতনের পর 'ন্যায় ও সত্যকে উচ্চেস্থানদানকারী' শান্তি ও সংহতির ধারক-বাহক একটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সভ্যতা মানবজাতিকে সফলতা দান করেছে, পৃথিবীর বুকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, আইন-কানুনসহ সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে এবং উন্নতির জন্য সকল প্রকার সমর্থন যুগিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম ইউরোপ এবং আন্দালুসিয়া ইসলামী সভ্যতার প্রভাবাধীন ছিল। একদিক থেকে আন্দালুসিয়ার বিশাল ইসলামিক সভ্যতা, অপরদিক থেকে ভেনিস ও জেনোইজগণ (Venetian and Genoese) সামুদ্রিক জাহাজ চালনায় পারদর্শিতা অর্জন করায় মুসলমানদের থেকে অনেক বই-পুস্তক এবং সংবাদ বহন করে নিয়ে আসত। এই ওসিলায় পশ্চিম ইউরোপ মুসলিমদের কাছ থেকে অনেক কিছুর শিক্ষা গ্রহণ করে। মূলত এই প্রভাবের কারণেই ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয় পশ্চিম ইউরোপ মূলত মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবেই মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন এঙ্গিজিসিয়ন (Engizisyon) যুগ থেকে বের হয়ে আজকের সভ্যতার গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য মুসলমানদের কাছ থেকে যা শিখেছিল সেটার অবক্ষয় ঘটিয়েছে। কেননা আজ তারা আগের মিশরীয় ও গ্রিক সভ্যতার মতো শক্তিকে উচ্চে স্থাপনকারী একটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে। ইতিহাসের এই ক্রমধারা একটুও পরিবর্তিত হয়নি।

আজ পর্যন্ত মানবতা যেমনভাবে রাত ও দিনের আবর্তনকে অবলোকন করেছে তেমনিভাবে 'ন্যায়কে উচ্চে স্থাপনকারী' 'উজ্জ্বল সোনালী একটি সময়ের' পর 'শক্তিকে উচ্চে স্থান দানকারী' একটি 'অন্ধকার জুলুমের সময়' অতিক্রম করেছে। প্রায় ৩শ' বছর ধরে মানবজাতি পাশ্চাত্যের অন্ধকার সভ্যতার জুলুমনির্যাতনের শিকার। এখন ইনশাআল্লাহ পুনরায় মানবতা সত্যকে সবকিছুর উপর স্থান দানকারী সোনালী একটি সভ্যতা ফিরে পাবে। এই নতুন সময়ের অর্থনৈতিক পদ্ধতি হবে 'ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি।'

ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি হলো, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের কোনো স্তরেই শোষণ করার সুযোগ দেবে না, সবাইকে তার অধিকার নিশ্চিত করবে। সকলের সাথে সমান ব্যবহার করবে এবং সবাইকে সমান সুযোগ প্রদান করবে। সকলের উপকার হবে, গঠনমূলক কাজে সমর্থন যোগাবে, অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাবে, অর্থনৈতিক উন্নতির পথে সকল অন্যায় বাধা-বিপত্তি দূরীভূত করবে এমন একটি পদ্ধতির নাম হলো ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতি।

দেখুন মানুষকে এবং জীবজন্তুকে নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ এবং জীবজন্তুর সৃষ্টির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। পশুপাখিরা অনেক বেশি উৎপাদন করে আর কমভোগ করে। মৌমাছি নিয়ে ল্যাবরেটরিতে এক গবেষণায় দেখা গেছে, মৌচাকের ভেতরে মধু কমে গেলে, মৌমাছির ক্ষুধা কমে যায় এবং মৌমাছি কম মধু ভক্ষণ করে। আল্লাহ্ এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, তারা কখনো মধু শেষ করে ফেলে না। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, মধু আরও কমে গেলে মৌমাছিগুলো মারা যায় কিন্তু অবশিষ্ট থাকা মধু কখনো শেষ করে না। অর্থাৎ অনেক বেশি উৎপাদন করে কিন্তু ভক্ষণ করে কম। এর হিকমত হলো আল্লাহ পশু-পাখিকে মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের বেলায় আসলে, মানুষ এই অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ মানুষকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা

www.pathagar.com

হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ শুধুমাত্র ভোগ করতে চায়। উৎপাদন করার কষ্টে তারা ভাগিদার হতে চায় না। এজন্যই একজন মানুষকে খাবারের জন্য ডাকলে তার মুখে হাসি ফোটে। কিন্তু যদি বলা হয় 'এই কোদালটি নাও এখানে খনন কর' তখন সে মুখ ভারি করে। অর্থাৎ শুধুমাত্র খাবে, কোনোকিছুই উৎপাদন করবে না। মানবসন্তান এটাই চায়। ভোগ করার কথা বললে তার খুব ভালো লাগে কিন্তু উৎপাদন করবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলবে এই কথা বললে সে বিরূপ হয় এবং সেখান থেকে পালায়। সৃষ্টি যদি এমন হয় তাহলে মানুষের মধ্যে কিভাবে ন্যায়ের ভিত্তিতে বণ্টন করবে, ন্যায়ভিত্তিক একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করবে?

দেখুন, আর একটি পদ্ধতি বলছি, এমন একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করব যে, এ পদ্ধতিতে একজন ইচ্ছুক ইচ্ছামতো ভক্ষণ করতে পারবে কিন্তু একটি শর্তের ভিত্তিতে, সেটা হলো যতটুকু উৎপাদন করবে ততোটুকুই ভোগ করবে। অন্য কারোর অধিকার ভক্ষণ করতে পারবে না।

'পুঁজিবাদী ব্যবস্থা' অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত, উদ্দীপনা দানকারী এবং ক্ষতিপূরণমূলক একটি ফ্যাক্টর হলো 'লাভ' এর সাথে শোষণ এবং নির্যাতনের হাতিয়ার 'সুদ'কেও স্থান দিয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মুক্তবাজার অর্থনীতির মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা এবং ট্রাস্টের একচেটিয়া বাজার দখলের ব্যাপারে কোন বাধা দেয় না।

এর বিপরীতে কম্যুনিস্ট শাসনব্যবস্থা, মূলনীতির দিক থেকে সুদ বিরোধী অবস্থান নিয়ে এর সাথে সকল সম্পদের রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে 'লাভের' বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে। যেটা মানুষের স্বাভাবিক অধিকারকেও ক্ষুণ্ন করে। মুক্তবাজার অর্থনীতিকে নিষিদ্ধ করে কেন্দ্রীয় সরকার তার ইচ্ছামতো টেবিলের উপর সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু এই পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে তারা অর্থনীতিকে ধ্বংস করে এর ব্যাস্টিক (Micro Economy) অর্থনীতির ভারসাম্য স্থাপন করতে পারে না।

'ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতি' সত্যের দিকে ধাবিত হওয়া, উদ্দীপনা দানকারী একটি উপাদান লাভ'কে সুযোগ দেয়ার পর একটি অবিচার ও শোষণের হাতিয়ার সুদকে নিষিদ্ধ করে থাকে। অপরদিকে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতাকে বহাল রেখে এবং মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে এগুলো থেকে

www.pathagar.com

মানুষ যাতে উপকৃত হতে পারে। এর পাশাপাশি মনোপলিকে কোনো প্রকার স্থান না দিয়ে এর অপকারিতা থেকে মানুষকে এবং অর্থনীতিকে রক্ষা করে। এ কারণেই ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতি সত্যকে উচ্চে তুলে ধরা একটি চিন্তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা পরিপূর্ণ এবং আদর্শ একটি পদ্ধতি।

এটা সকলের কাছে পরিচিত যে, গণিতবিদ্যা একটি পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিকে সঠিকভাবে প্রমাণ করার জন্য মৌলিক কিছু সূত্রাবলী রয়েছে সেটাকে সেই সূত্রাবলী দিয়ে প্রমাণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ ওকলিতের জ্যামিতি চারটি সূত্রের উপর নির্ভর করে।

অপরদিকে লভাচেভসকির জ্যামিতি অন্য তিনটি সূত্রের উপর নির্ভর করে। অনুরূপভাবে একটি খেলা (Game) যুক্তিসঙ্গত একটি খেলা হওয়ার জন্য এর কিছু মৌলিক নীতিমালা আছে। দাবা, খেলা হওয়ার জন্য এরও কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। একইভাবে ফুটবল খেলারও মৌলিক কিছু নীতিমালা রয়েছে। উসুলে ফিকহর মৌলিক বিষয়াবলী ধারণকারী 'মেজেল্লে' নামক একটি গ্রন্থ রয়েছে।

এগুলোর মতোই, অর্থনীতিতেও যদি একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতি পুঁজিবাদীব্যবস্থার মৌলিক নিয়মাবলীর ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাহলে সেটা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা, তেমনি সেটা যদি কম্যুনিজমের (Communism) মূলনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাহলে সেটা কম্যুনিস্ট পদ্ধতি। ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতিরও নিজস্ব কিছু মৌলিক নীতিমালা রয়েছে।

ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্র, দেশ এবং অঞ্চলের সামষ্টিক (Macro) পরিকল্পনা করবে। এসবের সাথে সম্পৃক্ত বিনিয়োগের পরিকল্পনা করবে। এভাবে সকলেই দেশের কৃষি, শিল্প এবং সার্ভিস সেক্টরে মজবুত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে অথবা দেশের স্বার্থে নতুন কোন কোন সেক্টরে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন সেটা আগে থেকেই জানবে।

ব্যক্তি নিজে অথবা কোম্পানির মাধ্যমে অথবা সমবায়ের মাধ্যমে এই প্রজেক্টগুলোর যে কোনো একটিকে ইচ্ছামতো বাছাই করে এটাকে পরিচালিত করবে। রাষ্ট্র এই প্রজেক্টসমূহকে সকল দিক দিয়ে সমর্থন যোগাবে এবং কোন প্রকল্পটি বেশি উপকারী এবং উৎপাদনশীল বিভিন্নভাবে সেটা জানানোর চেষ্টা করবে।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের অর্থনীতি বিষয়ক কর্মকাণ্ড সমূহে: ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে দু'ভাবে সমর্থন যোগাবে। এগুলো হলো সাধারণ সেবা এবং গঠনমূলক সেবা।

রাষ্ট্রের সাধারণ সেবাগুলোর মধ্যে: নিরাপত্তা, প্রশাসন, আইন, জ্বালানি, পানি, রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহন, কাঠামোগত উন্নয়ন, যোগাযোগ ইত্যাদি। রাষ্ট্র নোটারি, হিসাবরক্ষক, স্থাপত্যের জন্য আলাদ ব্যুরো, গুদাম সব আরও অন্যান্য সেবার আঞ্জাম দেবে।

আর রাষ্ট্রের গঠনমূলক সেবা হলো: ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্র আদালাভাবে মৌলিক অর্থনৈতিক সম্পদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। যেমন, ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতি, আজকের ফসল উৎপাদন অফিসের স্থানে ধান উৎপাদন ফাউন্ডেশন গঠন করবে। ফাউন্ডেশন নামকরণ করার কারণ হলো রাষ্ট্র এখান থেকে কোনো প্রকার লাভ করবে না। এই ফাউন্ডেশনের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে মানুষের সেবা করা। দেশের সকল থানা পর্যায়ে এই ফাউন্ডেশনের শাখা-প্রশাখা থাকবে।

ধান যারা বিক্রি করতে চাইবে তারা তাদের ধানকে এই ফাউন্ডেশনে দেবে এবং সে সময়ের দাম আদায় করে নেবে। অথবা যারা ধান কিনতে চায় তারা ঐ সময়ের দাম অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করে প্রয়োজন মতো ধান কিনে নেবে।

ফাউন্ডেশনের কাজ হবে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং গুদামে রক্ষিত ধানকে ভালোভাবে সংরক্ষণ করা। এই কাজকে শুধু সেবার মানসিকতা নিয়ে করতে হবে। এই সেবার জন্য কোনো প্রকার লাভ নেয়া যাবে না। ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতিতে সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। তারা এই কাজকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোম্পানির মাধ্যমে অথবা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পরিচালনা করবে।

আদর্শ এবং মানুষের ফিতরাতের (প্রভাবের) উপযোগী একটি পদ্ধতি হলো ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতি। এটা দ্রুত সময়ের মধ্যে উন্নতি করবে এবং সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখে সমানভাবে অংশীদার হয়ে উন্নয়ন এবং অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে।

ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতিতে 'শ্রমপদ্ধতি' (Labor System) নয় 'অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতি' (Partnership system) মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ

www.pathagar.com

করবে। ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতিতে উৎপাদন, উদ্যোগ, শ্রমিক, ভূমি, কাঁচামাল এবং অন্যান্য সেবাধর্মী কাজ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হবে। উৎপাদনের পর অর্জিত মুনাফা অংশীদার সকলের মাঝে সমানভাবে বণ্টিত হবে। এর মাধ্যমে অর্থনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ হবে সেটা হলো 'শ্রমিক এবং মালিকানায়' 'অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কারবার'।

ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতি সত্যকে সর্বোচ্চে স্থান দান করার কারণে সমাজের মধ্যে কোনো শ্রেণী পার্থক্য না করায় সংঘাত সংঘর্ষ নয়, শান্তির একটি পদ্ধতি স্থাপিত হবে। এটি প্রকাশ্য, সহজ, নির্মল এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহজ একটি পদ্ধতি। সকলের অংশীদারিত্ব ভিত্তিক একটি পদ্ধতি হবার ফলে এবং উৎপাদনে সকলেই উৎসাহিত হওয়ার কারণে এই অর্থনীতির সামনের সকল সমস্যাগুলো দূরীভূত হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন গতিশীল হবে। সকলের জন্য উন্নতি অগ্রগতি নিশ্চিত করবে। এ কারণে এটি একটি আদর্শ অর্থনৈতিক পদ্ধতি। অন্যান্য পদ্ধতির অর্থনৈতিক সুবিধাগুলোর চেয়ে ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক সুবিধা আরও বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। আর এতে ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই।

সুদভিত্তিক অর্থনীতি, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে সকল প্রকার ধ্বংস ডেকে আনে এবং সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে ধনীকে আরও ধনী এবং দরিদ্রকে আরও দরিদ্রতার দিকে ঠেলে দেয়। এই পদ্ধতি মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় এর থেকে উৎসারিত ধ্বংসের প্লাবন থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রলেপ দেয়া হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে সকলের উপর অন্যায্য করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। এভাবে সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক পদ্ধতি দেশ এবং দুনিয়াকে সামাজিক বৈষম্য এবং এক অসম যুদ্ধের দিকে ধাবিত করে।

ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতিতে, সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির মতো কোনো জীবাণু না থাকায় সকল প্রকার বৈষম্যও দূরীভূত থাকে। সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে, সকলের কল্যাণের জন্য সকল প্রকার নীতি-পদ্ধতি ন্যায়ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় রয়েছে।

মূলত ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা 'সত্যকে সর্বোচ্চ স্থানদানকারী' একটি পদ্ধতি হওয়ার কারণে সকলের অধিকারকে রক্ষা করবে এবং কেউ যাতে কাউকে শোষণ করতে না পারে এ ব্যাপারে আপোষহীন ভূমিকা পালন করবে।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের অন্যতম বড় দায়িত্ব হলো সকলে যাতে সম্মান ও মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে এর নিশ্চয়তা দান করা। বৈশ্বিক এত উন্নতির পরও পুঁজিবাদ যে শাসনতন্ত্র কায়েম করছে এবং সমগ্র মানবতার বড় একটি অংশকে ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতিতে এর কোনো স্থান নেই।

উপরের বর্ণনা মতে এটা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থায় অর্থনীতি দ্রুততার সাথে উন্নত হবে। রাষ্ট্র বহুগুণে ধনী হবে, সকল অঞ্চল এবং সকলেই কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারবে। এ জন্যই এই ন্যায়ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা অনগ্রসরতা, রাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীভূত করবে।

সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বস্তুবাদকে (Materialism) মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার কারণে আত্মশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করে না। চরিত্র বিধ্বংসী কাজে সহযোগিতা করে। এটা হলো পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় ধ্বংসযজ্ঞ। অপরদিকে ধ্বংস এবং দেওলিয়ার পথ উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রেও এটি একটি মূল ভূমিকা পালন করে।

কারণ যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি কি সেটা জানে না, সে দরিদ্রতায় নিরুপায় হয়ে খুব সহজেই চরিত্রহীন/চরিত্র বিধ্বংসী কাজে জড়িয়ে পড়বে। সুদের মাধ্যমে এবং অযাচিত ঋণের মাধ্যমে অনেক ধনী গোষ্ঠী চরিত্রহীনতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। কারণ অবৈধভাবে সুদের মাধ্যমে অর্জিত এবং ঋণ ও মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে রাতারাতি অঢেল সম্পদের মালিক হওয়ার কারণে এই গোষ্ঠীটি জেনা-ব্যাভিচার, মদ-জুয়া এবং অন্যান্য চরিত্র বিধ্বংসী কাজে জড়িয়ে পড়ে। আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। তারা চরিত্র বিধ্বংসী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, বার (Bar), নাইট ক্লাব, জুয়াখেলার ঘর (Casino) প্রতিষ্ঠা করে থাকে। একবার যখন ধনীদের দ্বারা এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন দরিদ্র ও অন্যান্য মানুষও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চরিত্র বিধ্বংসী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। চরিত্র বিধ্বংসী এই মহাপ্লাবন সমগ্র সমাজকে ক্যান্সারের মতো ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। ফৌজদারী অপরাধ (Criminal offence) বৃদ্ধি পায়, নেশা, মদ, চুরি, মাফিয়া এবং সকল প্রকার চরিত্রহীন কাজের মূলে হলো সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা।

www.pathagar.com

এসব ধ্বংসের পথকে রোধ করে মানুষ এবং সমাজের জন্য সফলতা ফিরিয়ে আনার অন্যতম একটি হাতিয়ার হলো ন্যায়ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। এই পদ্ধতি হলো এমন একটি পদ্ধতি যেটি আজকের দুনিয়ার সকল সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে টেকসই এবং সুন্দর সমাধান দিতে সক্ষম। অনেক বড় বড় অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টির মূল উৎস সুদভিত্তিক এই অর্থব্যবস্থা। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের একটি বড় পথ হলো ন্যায়ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। মজুত প্রতারণামূলক এবং গোলামীর এই শাসন পদ্ধতি মূলত পুরনো উপনেবিশক শাসনের আধুনিক রূপ। এটা হলো জালেমদের একটি শাসনব্যবস্থা। ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা হলো সত্যকে সর্বাগ্রে স্থান দানকারী, সকলের অধিকার প্রদানকারী, কাউকে শোষণের সুযোগ দান না কারী, মানুষ এবং সমাজকে আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক উন্নতিতে সাহায্য দানকারী। সকলের বিশ্বাসের আলোকে তার বসবাসের অধিকার দানকারী সুখ, শান্তি, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং কল্যাণকারী এক শাসনব্যবস্থার নাম। এই পদ্ধতিতে সকলের বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ হবে, খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আমাদের দেশ ও জাতি আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক উন্নতি লাভ করবে। ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থায় রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং চরিত্রের উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তি এবং ব্যক্তি সমষ্টির মাধ্যমে গড়ে উঠবে এবং গড়ে তোলার ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনা দান করবে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনীতিকে গঠনের নামে ধ্বংস করতে পারবে না, স্বায়ত্তশাসনের মতো এবং উদ্দীপনা দানের মাধমে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা পালন করবে। দ্বীন এবং চরিত্র উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় মানুষ গড়ার একটি কারখানার মতো দায়িত্ব পালন করবে। ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থায়, শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ করে দ্বীন ও চরিত্রগত ব্যবস্থা একজন মানুষকে ইরফানের অধিকারী একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। উৎপাদন ও উন্নয়নের পাশাপাশি, শিক্ষা, আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ এবং আত্মশুদ্ধির জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করবে। জনগণ আদর্শ ও উত্তম চরিত্রের গুণাবলী নিয়ে বেড়ে উঠবে।

কেউ অপচয় ও অপব্যয় করবে না। সবাই সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসবে। ইবাদতের মানসিকতা নিয়ে একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়াবে। এসব বিষয়সমহূ যখন একীভূত হবে তখন

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত উন্নয়নের যে পরিকল্পনা সেটা সফল হবে। এভাবে পুঁজিবাদের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এই জুলুমতন্ত্রের অবসান হবে, ন্যায়পরায়ণতার উপর ভিত্তি করে ন্যায়পরায়ণ একটি দুনিয়া গড়ে উঠবে। সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক শক্তির প্রতারণার কারণে এবং অবৈধ প্রভাবে মিডিয়া সর্বদা মিথ্যা, ভুল এবং পক্ষপাতমূলক সংবাদ প্রচার করে থাকে। এতে বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ না জেনে না বুঝে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে তোষণকারী ও তাদের পদলেহনকারীদের সমর্থন দান করে থাকে। এভাবে ক্ষমতায় আরোহণকারী সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহনকারীরা সহজেই IMF নামক মোটরের প্রভাবে প্রভাবিত হয় এবং জনগণের রক্ত ও জ্ঞানকে দু'টি কোষাগারে জমা করে থাকে। এর একটি হলো ব্যাংক অপরটি হলো বিভিন্ন কোষাগার ও ফান্ডসমূহ। এখানে জমাকৃত সঞ্চয়কে পরবর্তীতে বর্ণবাদী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এবং তাদের লালিত গোষ্ঠীদের করতলগত হয়। ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে উপরে বর্ণিত কর্মীগণ মিল্লি গরুশের আদর্শে উৎসাহিত হয়ে উঠবে। জ্ঞান এবং ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর কর্মকর্তাবৃন্দ ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত আমাদের সকল স্তরের দায়িত্বশীলগণ মানবসম্পদ খনিজ সম্পদ, বন-বনানী, কৃষি, ভূমি, চারণভূমি, পানিসম্পদ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিনিয়োগ এবং অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আগে উৎপাদনে এবং পরবর্তীতে শক্তি অর্জন করায় সচেষ্ট হবে। সমগ্র দেশ একটার পর একটা উৎপাদনশীল ও লাভজনক প্রকল্পের মাধ্যমে খনিজসম্পদ, সার্ভিস সেক্টর, পশুপালন, শিষ্টাচারসম্পন্ন পর্যটন (Islamic Tourism), কৃষি, বন-বনানী, ছোট শিল্প, জাতীয় যুদ্ধ শিল্প, ভারি শিল্প সম্পর্কিত প্রকল্পের দ্বারা সজ্জিত হবে।

মানবসম্পদ এসব প্রকল্পের মাধ্যমে অল্প সময়ের ব্যবধানে বিশাল এক সফলতা বয়ে নিয়ে আসবে। এই লাভ/সম্পদ দেশের সকলের মাঝে বণ্টন করা হবে এবং সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করবে। অপরদিকে রাষ্ট্র এসব কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করার কারণে তার অধিকারসমূহকেও আদায় করে নেবে। এভাবে সকল প্রকার অন্যায় করের বোঝা হ্রাস করার কারণে সকলেই সম্পদশালী হয়ে উঠবে। রাষ্ট্র তার দায়িত্বের অংশ হিসেবে অর্থনীতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করবে, সেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং জনগণের মাঝে উদ্দীপনা যোগানোর জন্য কাজ করে যাবে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল

www.pathagar.com

মানুষ যাতে মানবিক মর্যাদায় সম্মানের সাথে বসবাস করতে পারে এর জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

অপরদিকে 'ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে' এবং 'ন্যায়ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার' ফলশ্রুতিতে দেশ বর্ণবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোলামী এবং অধীনতা থেকে মুক্তি পাবে।

সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের দোসরদের শোষণ থেকে দেশের সকল সম্পদকে রক্ষা করবে। ফলশ্রুতিতে দেশ ও জনগণ ধনী হবে, সম্পদশালী হয়ে দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। বৈদেশিক ঋণ ও সুদের পদতলে পিষ্ট হওয়ার পরিবর্তে ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম দেশসমূহের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য এগিয়ে আসবে। সকল প্রকার উন্নয়ন, উৎপাদন এবং প্রতিরক্ষা শিল্পের উন্নয়নের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা সম্প্রসারিত করবে। এর সাথে সাথে জীবিকার সন্ধানে তুরস্ক থেকে বিভিন্ন দেশে কাজ করতে যাওয়া আমাদের তিন মিলিয়ন সন্তান সকলেই তাদের পিতৃভূমিতে ফিরে আসবে। নিজের দেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানায় তারা কাজ করবে। এর ফলে তুরস্ক পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে শ্রমিক নয়, পর্যটক পাঠানোর মতো অবস্থায় পৌঁছবে। তুরস্কে ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তুরস্ক একটি বসবাসযোগ্য দেশে পরিণত হবে। রাষ্ট্র এবং জনগণের মিলনবন্ধনে তুরস্ক, নতুন একটি বৃহৎ তুরস্কের রূপ লাভ করবে। নতুন বৃহৎ তুরস্কের নেতৃত্বে সত্য এবং ইনসাফের উপর ভিত্তি করে নতুন এক পৃথিবী গড়ে উঠবে। এই উন্নয়ন এবং অগ্রগতি দুনিয়ার দুর্ভাগ্যকে পরিবর্তন করে দেবে এবং মানবতাকে একটি শান্তি ও ন্যায়ের দুনিয়ার দিকে ধাবিত করবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা না নিজেকে চেনে, না সম্পূর্ণভাবে ইসলামী সভ্যতাকে চেনে। পাশ্চাত্যের সাথে স্নেহময় এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে আসল সত্যটা বুঝানো মানবতার জন্য কল্যাণকর।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় বড় হওয়া মানুষ, উপরে বর্ণিত মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদের সভ্যতার ভিত্তিমূলে অনুপস্থি;ত এ সম্পর্কে তারা অবগত নয়। এই অবস্থার জন্য আজকে তারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এটা স্বাভাবিক একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাছ যেমন চিন্তা করে যে, সমগ্র সৃষ্টি তাদের পানির দুনিয়ার মতো। তেমনিভাবে তারাও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যবস্থা এবং বৈশিষ্ট্যের মাঝে বড় হয়েছে সেটাকেই একমাত্র সকল সমস্যা সমাধানের অবলম্বন মনে করে থাকে। এর বাইরেও যে মানবসভ্যতার উন্নয়ন, উন্নতির জন্য অন্য কিছু থাকতে পারে এটা তারা চিন্তা করতে পারে না। তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার সময় তাদেরকে এটা বুঝাতে হবে যে, এর মাধ্যমে যে সংলাপ হবে সেটা হবে সমগ্র মানবতার কল্যাণে। মানবতার সমস্যা সমাধানের জন্য; এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার সংলাপ (Dialogue) এবং কাঙ্ক্ষিত দুনিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব মৌলিক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সেগুলোকে এভাবে সিরিয়াল অনুযায়ী আমরা সাজাতে পারি।

দেড়শ' কোটি মুসলমানের কাছে পরিচিত এবং গ্রহণযোগ্য, চিন্তাশীল, জ্ঞানী এবং কর্মক্ষম ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল গঠন করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানটি হবে মুসলিম বিশ্বের সমগ্র সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী, সংলাপের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত এবং সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো এমন একটি নতুন দুনিয়া গঠন করা যেখানে মানুষ মানবিক মূল্যবোধ এবং সুখ, শান্তিতে বসবাস করার নিশ্চয়তা পাবে।

কোলন বিশ্ববিদ্যালয় (Koln University) ইসলামিক গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর মরহুম প্রফেসর ফালাতুরী। পাশ্চাত্যের অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে জার্মানির স্কুলের বইগুলোতে এবং রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা সংস্থার মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডকে উপস্থাপন করে বই আকারে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। এ রকম কাজ আরও বেশি মাত্রায় করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেননা পাশ্চাত্যের অনেক শাসকই তার দেশে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিচালিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন।

পাশ্চাত্যের অনেক দেশের কম উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার ফলে মিডিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের সাথে সংলাপ অপ্রয়োজনীয় এই চিন্তার প্রভাবাধীন। আগে যেমন বলা হয়েছে পাশ্চাত্য নিজেকেও চেনে না ইসলামকেও চেনে না। দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের মধ্যে সংলাপ অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্তমান চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য সকল দেশে মিডিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজনৈতিক দলের

www.pathagar.com

সদস্যদের কাছ থেকে যতটুকু সম্ভব সাহায্য নিয়ে বড় একটি অংশকে বুঝানোর জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশ অথবা যেসব দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক কাজগুলো অপর্যাপ্ত এবং অসম্পূর্ণ। এই লবিকে (Lobby) আরও জোরদার করা, তদারকি করা, উন্নয়ন করা এবং শক্তিশালীকরণের দিকে নজর দেয়া জরুরি।

এই মূল কাজ পরিচালনার পাশাপাশি সংলাপ ইনস্টিটিউট (Dialogue Institute) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সংগঠনসমূহের সাথে শান্তি এবং সংহতির জন্য সংলাপের আয়োজন করতে হবে। এর ফলশ্রুতিতে উন্নয়নশীল দেশ এবং উন্নত দেশের সকল প্রতিনিধিগণ গোলটেবিলে বসে আলাপ-আলোচনা করবেন।

অপর কথায় D-8 এর সাথে G-8 বসে দ্বিতীয় ইয়ালটা কনফারেন্সের আয়োজন করবে। এভাবে আমাদের এই দুনিয়া, শান্তি, সংলাপ, আদালত, সমতা, সহযোগিতা, মানবাধিকার, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র এসব মূলনীতির আলোকে শক্তিকে নয়, সত্যকে সর্বোচ্চে স্থানদানকারী, একটি নতুন দুনিয়া গড়ে তুলবে। সংলাপ ইনস্টিটিউটের কাজের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সাথে সংলাপ মূলত এ উদ্দেশ্যেই হবে, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

আমরা যখন সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্য কাজ করছি, সেই সময় একদল লোক বের হয়ে বলে থাকে 'না সমগ্র মানবতা নয় শুধু আমরাই সুখী হব। আমরা হলাম শ্রেষ্ঠ জাতি, অন্যরা সবাই আমাদের গোলামী করবে।' আমাদের কর্তব্য হলো এ রকম চিন্তা-চেতনার লোকদেরকে সংশোধন করা এবং দুনিয়ায় সত্য প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে চলা। তাছাড়া কারো সাথে আমাদের শত্রুতা কিংবা ঝগড়া-বিবাদ নাই। আমরা সকলের কল্যাণ চাই এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মিল্লি গরুশ তুরস্কের সবচেয়ে প্রাচীন মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে। কারণ মানুষকে আল্লাহ্ প্রদত্ত সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো ঈমান এবং এরপর সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো ঈমানের দাবি পূরণকারী বিবেক (আকল)।

আকল হলো মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং গবেষণার একটি মাধ্যম। মানুষ যাতে হেদায়েত, দূরদৃষ্টি এবং হিকমাহ্র অধিকারী হতে পারে যার জন্য আকল

www.pathagar.com

দান করা হয়েছে। প্রবাদ আছে যে, 'আকলহীন মাথার জরিমানা, পা আদায় করে থাকে'। এজন্য সকল কাজ আল্লাহ্ প্রদত্ত এই মহান নিয়ামতের সাহায্য নিয়ে একসাথে পরিচালনা করা দরকার। ইসলামী আন্দোলনের চেতনাসম্পন্ন কর্মীদের কাজ শুরু করার সময়, পরিকল্পনাসমূহ নেয়ার সময় রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি বুদ্ধিভিত্তিক পদক্ষেপসমূহও একই সাথে নেয়াটা অতীব প্রয়োজনীয়।

এভাবে মিল্লি গরুশ প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা অথবা অন্যান্য সংগঠনের সাথে সহযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে, তাদেরও অবদানের মাধ্যমে মিল্লি গরুশ এবং ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থার গবেষণাসমূহ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সহ অন্যান্য সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গবেষক গ্রুপ এবং গবেষকদেরকে আলিঙ্গন করবে; এমন একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি মাত্র। সকল বিষয়ে এবং ক্ষেত্রে অপচয় রোধ করে ফলপ্রসূ এবং সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা, দেশ এবং জাতিকে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে 'অপচয় হারাম' এই স্লোগানকে সামনে রেখে সকল কাজ করা প্রভৃতি অতীব জরুরী।

এই চিন্তা-চেতনার আলোকে কাজ করলে এর একমাত্র উদ্দেশ্য সত্যকে এই দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ। যার কারণে গবেষণা অনেক বড় একটি নিয়ামত। যাতে এটার অপচয় না হয় এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। একটি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকারী হওয়া কিংবা সে প্রতিষ্ঠানের কাজ করা মূল কথা নয়। বরং মূল বিষয় হলো কাজ করে তুমি কি উৎপাদন করছ এবং কোন উদ্দেশ্যের জন্য তুমি প্রচেষ্টা চালাচ্ছ? এই ব্যাপারে তোমার চেতনা আছে কিনা?

এই বিষয়ে আমাদের চারটি মূলনীতি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো 'আখলাক এবং আধ্যাত্মিকতা'। এই মূলনীতিটি হলো সবার আগে স্থান দখলকারী। দ্বিতীয়টি হলো 'সম্মানজনক পররাষ্ট্রনীতি' (respectful Foreign Policy). তুরস্ক কোনো স্যাটেলাইট দেশ হবে না নেতৃত্ব দানকারী একটি দেশ হবে। আচ্ছা কেন নেতৃত্ব দানকারী দেশ হব? অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য নয়। সকল মানুষের প্রত্যাশিত, আকাঙ্ক্ষিত, 'সত্যকে সর্বোচ্চে' স্থান দানকারী একটি দুনিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য তুরস্ককে শক্তিশালী হওয়াটা জরুরি এ

www.pathagar.com

জন্য। তৃতীয়টি হলো ঔপনৈবেশিক ধরনের উন্নয়ন 'নয় নেতৃত্ব দানকারী দেশের উন্নয়নের মডেল' হলো আমাদের মূল ভিত্তি। এগুলো বছরের পর বছর ধরে মিল্লি গরুশের আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠা পাঁচটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী পোস্টার এবং প্রচারণার মাধ্যমে দেশবাসীকে জনানো আমাদের মূল লক্ষ্য। চতুর্থ মূলনীতি হলো, 'পৃথিবীর সকল ধ্বংসযজ্ঞ প্রতিরোধ করার এবং তুরস্কসহ সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্য কাজ করা।'

যারা বলে থাকে যে, 'আপনি তো এসব কথা বলছেন বাস্তবে কি করেছেন?' তাদের জবাব দেওয়ার মতো আমাদের অনেক সফলতা রয়েছে। তুরস্ক ১৯৬০ সালে European Economic Comunity (European Union এর আগের নাম) সাথে আনকারায় একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ককে উপনিবেশ (colony) বানাতে চেয়েছিল। আমরা না বলে 'পুনরায় বৃহৎ তুরস্ক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি।'

তুরস্ক নতুন দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করবে, 'তোমরা যা করছ এই ব্যাপারে কি তোমরা অবগত? তুরস্ককে ইউরোপের উপনিবেশ (colony) বানাতে চাও।' এই কথা বলে এই ভুল মানসিকতাকে অস্বীকার করে এর বিপরীতে ১৯৬৯ সালে কাজ শুরু করেছি।

সেই সময় তারা আঙ্কারা চুক্তির মাধ্যমে জাতিকে প্রতারিত করে অন্ধকারে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। মিল্লি গরুশ সেই সময় স্বাক্ষরকারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছিল, 'আসুন এখানে দেখুন আপনারা কিসের চুক্তি করেছেন।' এই চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ক শোষিত হবে। আগে আলোচনা করেছি বলে এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব না।

শুধু সেদিনের একটি বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলোচনা করব। চুক্তিতে তারা একটি ধারা রেখেছিল যে, ২২ বছরে শুল্ক সমান হবে এবং আস্তে আস্তে এটা তুলে দেয়া হবে। আচ্ছা কিভাবে তুলে দেওয়া হবে? এই শুল্ককে রহিত করার জন্য তুরস্ক প্রতিবছর শতকরা ৫ ভাগ হারে শুল্ক হ্রাস করবে। একই সাথে ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। এটার অর্থ কি দাঁড়ায় তাহলে? এটার অর্থ হলো তোমরা কি শিল্পায়ন করতে পারবে না। তোমরা আমাদের উপর নির্ভরশীল একটি রাষ্ট্র হিসেবে থাকবে।

www.pathagar.com

সেই ৪০ বছর পূর্বে মিল্লি গরুশ আজকে তুরস্ক যে দুর্যোগে নিপতিত হয়েছে সে সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। মিল্লি গরুশ বলেছিল, 'আপনারা ভুল পথে যাবেন না, মিল্লি গরুশকে ভিত্তি হিসেবে ধরুন, তুরস্ককে আধুনিক ঔপনিবেশিক (modern colonial state) রাষ্ট্র বানাবেন না।

'আমরা কারো উপনিবেশ হব না, নেতৃত্ব দানকারী দেশ হবো' এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করার সময়, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শক্তিবর্গ কর্তৃক বিভিন্নভাবে আমাদের জাতিকে প্রতারিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তারা বলত যে, 'আমরা যদি সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে, পাশ্চাত্যের সাথে সমঝোতা করে না চলি, তাহলে আমরা আমাদের আপন শক্তিবলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। আমাদের অর্থনীতিকে সম্প্রসারিত করতে পারব না। বেঁচে থাকার জন্য আমরা তাদের মুখাপেক্ষী, তাদের সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক করা প্রয়োজন।'

মিল্লি গরুশ সেই প্রথম থেকেই এই ভুল মানসিকতার বিরোধিতা করে এসেছিল। মিল্লি গরুশ বলেছে, 'কে বলছে যে, আমরা আমাদের নিজস্ব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারব না?'

'অর্থনীতিতে জাতীয় সমাধান' নামে প্রকল্পের উদ্ভাবন করে মিল্লি গরুশ জাতিকে দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো সম্ভব। বছরের পর বছর ধরে আমাদের তুরস্কের কি কি সম্পদ

আছে এবং এগুলোর মাধ্যমে বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করে কত বিশাল সম্পদের মালিক হওয়া সম্ভব এ ব্যাপারে সিরিজ কনফারেন্স ও সেমিনারের আয়োজন করেছে।

এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আমরা আমাদের নিজেদের শক্তি বলে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারব এবং শক্তিশালী একটি দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারব। সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে আমরা যদি প্রতারিত হয়ে তাদের অনুসরণ করি তাহলে আমরা শোষিত হব। গোলামে পরিণত হব এবং নিঃশেষ হয়ে যাব। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ৪০ বছর পূর্ব থেকে 'অর্থনীতিতে জাতীয় সমাধান' নামে মিল্লি গরুশ তার কার্যক্রম শুরু করেছে এবং অনেক বড় বড় প্রকল্প হাতে নিয়ে সেগুলোকে বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

www.pathagar.com

আমাদের এই কার্যক্রমসমূহ শুধু চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ১৯৭৪-১৯৭৮ সাল পর্যন্ত গঠিত তিনটি কোয়ালিশন সরকারে অংশ নিয়ে এবং ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে আমাদের নেতৃত্বে গঠিত ৫৪তম সরকারের মাধ্যমে এই পরিকল্পনাসমূহকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা চালিয়েছি। এভাবে শক্তিশালী একটি দেশ হওয়ার জন্য তুরস্ককে কখনোই বৈদেশিক শক্তির সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় এটা বাস্তবে দেখিয়ে দেয়া হয়েছিল। মিল্লি গরুশের বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা দিয়েছি এবং অংশ নেয়া সরকারগুলোতে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একই সাথে চিন্তা দিয়ে এবং বাস্তবায়ন করে জাতিকে দেখিয়েছি। তুরস্ক যদি আজকে কোনো একটি অবস্থায় এসে পৌঁছে থাকে এর আসল কৃতিত্ব মিল্লি গরুশের। যা কিনা আসল চিন্তা-চেতনা দিয়ে এবং বিভিন্ন সরকারে অংশগ্রহণ করে তুরস্কের একটি অভীষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল এবং সেখানে পৌঁছার জন্য কাজ করেছিল। সবকিছুর পরও কারও সাথে আমাদের কারো কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই।

অনেক মুসলিম দেশে হামলা করা হয়েছে, তাদের উপর অকথ্য জুলুম ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে এবং সমগ্র দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এরপরও আমরা কারও কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রতিশোধ নিতে চাই না। আমাদের সকল হিসাব নিকাশ হলো সমগ্র মানবতার কল্যাণে কি করা যায়। কিভাবে মানবতা শান্তিতে বসবাস করবে এটাই আমাদের দাওয়াত। আমরা পৃথিবীতে শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। এ জন্য এই মানসিকতাকে বিশুদ্ধ করা প্রয়োজন। তাছাড়া না কারো সাথে আমাদের হিংসা-বিদ্বেষ, না আছে কারো সাথে কোনো শত্রুতা। সাম্রাজ্যবাদীদের মূল কথা হলো 'হয়তো মারা যাবে, না হয় আমাদের গোলামী করবে।' ইরাকে, আফগানিস্তানে এবং ফিলিস্তিনে যা হচ্ছে তার অর্থ হলো এটাই। এখন আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হলো সকল মানুষের কল্যাণের জন্য সকল শক্তি ও উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করা।

কেননা মানবতার সফলতা ও কল্যাণ একমাত্র মিল্লি গরুশের মধ্যেই নিহিত। মিল্লি গরুশের ব্যাপক পরিচিতির জন্য কাজ করা সবচেয়ে বড় সেবা। অনেক বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে অনেক বড় একটি হ্যারিকেনের উৎপত্তি হয়েছিল। এই হ্যারিকেন উত্তর দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল। এটা সন্দেহ করা হয়েছিল যে, এই হ্যারিকেন ভারত ও চীনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে লাখ

www.pathagar.com

লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটাবে। এই হ্যারিকেন পূর্ণশক্তি সহকারে অগ্রসর হচ্ছিল। সবাই যখন ভয়াবহ ধ্বংসের কথা মনে করে হাঁপিয়ে উঠছিল তখন দেখা গেল যে, এই বৃহৎ হ্যারিকেন অস্ট্রেলিয়া পার হওয়ার পর চীন ও ভারতে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে তার গতিপথ পরিবর্তন করে শেষ মুহূর্তে মহাসাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হ্যারিকেন মহাসাগরে গিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং মানবতা ভয়াবহ এক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পায়। আবহাওয়াবিদগণ, পদার্থবিদগণ এবং রসায়নবিদগণ এই দৃশ্য দেখে আশ্চার্যান্বিত হয়ে যান। তাদের গবেষণার বিষয় ছিল– কি এমন ঘটল যে এই বিশাল শক্তি সম্পন্ন হ্যারিকেন শেষ মুহূর্তে তার গতিপথ পরিবর্তন করে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে এসে, এশিয়াতে হামলে পড়ার সময়, এমন কি হলো যে, এটা মহাসাগরের দিকে ধাবিত হলো? তারা এটা বিশ্লেষণ করা শুরু করলেন। সর্বশেষে তারা সর্বসম্মতিক্রমে একটি রিপোর্ট পেশ করেছিল। সেটা ছিল: ঠিক সে সময় যে তারিখে প্রজাপতিদের উঠে অন্য জায়গায় যাওয়ার মৌসুম ছিল। একই সময় কোটি কোটি প্রজাপতি তাদের পাখনা চালানো শুরু করে। প্রজাপতিদের পাখনা চালানোর ফলে তাদের পাখনার বাতাসে একটি বিশাল শক্তির সৃষ্টি হয়। যার ফলে এ শক্তিটি সেই হ্যারিকেনের গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়।

তাই মিল্লি গরুশের কার্যক্রম মানুষকে ধ্বংসে নিপতিতকারী বৃহৎ হ্যারিকেনের দিক পরিবর্তনকারী সেই প্রজাপতিসমূহের মতো। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া অনেক বড় বড় ঘটনাবলীর কারণে অন্যান্য সকল সময়ের তুলনায় মিল্লি গরুশের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিস্থিতি এমন হওয়ায় আমাদেরকে আরও বেশিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সকল ঘটনা আজ দিনের আলোর মতো আমাদের সামনে উদ্ভাসিত। এ জন্য আমাদের গতিতে পরিবর্তন আনতে হবে।

চিন্তা-চেতনা দূষিতকারী কাজগুলোকে প্রতিহত করার জন্য অনেক বেশি কাজ প্রয়োজন। নতুন একটি দুনিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য মিল্লি গরুশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অঙ্গ সংগঠনকে অনেক বেশি আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করতে হবে। প্রথমে চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব ঘটানোর জন্য কাজ করতে হবে। অপরদিকে অন্যান্য দেশগুলোর সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত সম্পর্ক বৃদ্ধি করবে এমন সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম মুসলিম দেশগুলোসহ অন্যান্য সকল দেশের সংগঠনসমূহকে একসাথে করে

www.pathagar.com

এসব বিষয়ে আলোচনা করা যাতে তারাও তাদের দেশে এগুলো বুঝাতে পারে। কেননা সকলের জন্য শান্তি এবং কল্যাণ নিশ্চিত করবে এমন একটি দুনিয়া প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শুধু আকাঙ্ক্ষা থাকলেই চলবে না। একই সাথে শক্তিশালী হওয়াটাও জরুরি। যারা শক্তিকে অধিকারের (Rights) উৎস মনে করে তারা কখনো মুখের কথা বুঝবে না। তাদের জুলুম-নির্যাতনকে বন্ধ করবে এমন একটি শক্তির অধিকারী হতে হবে।

শক্তিশালী কোনো প্রতিরোধের জন্য রাজনৈতিক শক্তি, অর্থনৈতিক উন্নতি, স্বাধীন ক্ষমতা এবং প্রযুক্তিতে উৎকর্ষ সাধন করা সময়ের দাবি। তাহলে সেই সময় এসব কাজ প্রভাব ফেলতে পারবে। চিন্তা-চেতনাকে দূষিত করার জন্য বর্তমান সময়ে তারা অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। জনগণ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ 'আধুনিকতা' এজন্য বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। কেন এটাকে নকল করা হয়েছে? এই শব্দের মাধ্যমে তুমি তোমার মৌলিক বিষয়ে ছাড় দেবে। কি সম্পর্ক আছে? আপনার আধুনিকতা মাধুনিকতা! আপনার প্রতি আমার একটি প্রশ্ন আছে, আপনি কি কল্যাণ চান নাকি চান না? রাখেন আপনার ঐসব শুকনো কথাবার্তা আসল প্রশ্নের উত্তর দেন। তুমি যদি কল্যাণ চাও, তাহলে যে সকল শর্ত কল্যাণের পথ সুগম করে সে শর্তের আলোকে কাজ করতে হবে। আপনি আধুনিক হয়েছেন তো কি হয়েছে?

তাই যদি হয়, আমাদের আন্দোলনের মূল পয়েন্ট হলো সমবেদনা এবং ভালোবাসা। মিল্লি গরুশের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্য কাজ করা।

www.pathagar.com

শেষ কথা

আজ নতুন একটি যুগের এবং নতুন একটি বিজয়ের প্রয়োজন। যার জন্য সমগ্র মানবতা আজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। নতুন একটি শান্তিময় দুনিয়া গঠন করার জন্য আমাদের এই মুসলিম জাতি পুনরায় নেতৃত্ব দিবে। সম্মানিত একটি জাতির এবং সম্মানিত একটি ইতিহাসের উত্তরাধিকারীগণ এই বিজয়ের পতাকাবাহী হিসাবে কাজ করবে।

ইস্তানবুল বিজয়ের খুব বেশি আগে নয়, মাত্র ৫০ বছর আগে ১৪০০ সালের শুরুর দিকে তৈমুর লং যখন আনাতোলিয়াতে (Anatoliya) আক্রমণ করছিল তখন সবাই ভেবেছিল যে সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মুসলিম বিশ্ব সবচেয়ে বড় দুর্দশায় নিপতিত হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে আমাদের এই জাতি সব কিছুকে সাজিয়ে গুছিয়ে, ইস্তানবুলের বিজয়ের মধ্য দিয়ে একটি যুগের অবসান ঘটিয়ে নতুন এক সোনালী যুগের সূচনা করেছিল। তেমনিভাবে আজও একটি নতুন যুগের নতুন একটি বিজয়ের প্রয়োজন।

কিন্তু এর জন্য ইস্তানবুলের বিজয়কে খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

আমাদের প্রিয়নবী মানবতার মুক্তির দূত মুহম্মদ (সঃ) এই হাদিসের মাধ্যমে আমাদেরকে ইস্তানবুল বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছিলেন।

لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ وَلَنِعْمَ اَمِيرُهَا الْاَمِيرُ فَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ (مسند أحمد)

অর্থাৎ অবশ্যই অবশ্যই ইস্তানবুল বিজিত হবে। সেই বিজয়ের সেনাপতি কতই না উত্তম সেনাপতি আর সেই বিজয়ের সৈনিকগণ কতই না উত্তম। (মুসনাদে আহমাদ)

এই হাদীস থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। কি বলা হয়েছে এই হাদীসে?

لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ (লাতুফতাহান্নাল কুসতান্তিনিয়্যাতু) এই কথা বলা হয়েছে। এখানে রয়েছে লামে তাকিদ এবং নুনে সাকিলা। এর দ্বারা বক্তব্যকে জোরালো করা হয়েছে। অর্থাৎ ইস্তানবুল অবশ্যই অবশ্যই বিজিত হবে। বিজয়ের জন্য মৌলিক শর্ত হলো এমন দৃঢ় বিশ্বাস।

www.pathagar.com

অর্থাৎ যদি বিজয়ী হতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। দৃঢ়ভাবে এবং সন্দেহাতীত ভাবে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। মুহাম্মদ (সাঃ) "অবশ্যই অবশ্যই বিজয় হবে" এই কথা বলার কারণে মুসলমানগণ এই সম্মানের অংশীদার হওয়ার জন্য বহুবার বিজয়াভিযান পরিচালনা করেছে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের মধ্য থেকে এই মহান সম্মান সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহকে নাসীব করেছে।

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ তার বাল্যকাল থেকেই ইস্তানবুল বিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন। এই হাদীস শরিফে বর্ণিত এই বিরল সম্মানের অংশীদার হওয়ার জন্য তিনি রাত-দিন কঠোর সাধনা করেছিলেন। বলতে গেলে, ইস্তানবুল বিজয়ের জন্য সুলতান ফাতিহ পাগলপারা হয়ে গিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনও তাঁকে এই মহান সম্মানের ভাগীদার করেছিলেন।

সুতরাং আমরা যে দাওয়াত এবং আন্দোলনকে বিশ্বাস করি সেই আন্দোলনকে তার লক্ষ্যপানে পৌছানোর জন্য আমাদেরকেও সেই আন্দোলনের জন্য পাগলপারা হতে হবে।

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ সিংহাসনে সমাসীন হওয়ার সাথে সাথেই দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে ইস্তানবুলের বিজয়ের জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন। দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর শহর ইস্তানবুলের বিজয়ের জন্য তিনি সকল কিছুকে সুসংহত করেছিলেন। দুই লাখ সৈন্যের অংশগ্রহণে এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন। এর পাশাপাশি তিনি প্রচুর পরিমাণে আগুনের গোলা তৈরি করেন। এগুলো ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তি। "ঈমান খাসী ছাগল থেকেও দুধ বের করতে পারে"। এই কথার উপর আস্থা রেখে পাহাড়ের উপর দিয়ে জাহাজ চালিয়েছিলেন।

যদি একটি বিজয় চাই তাহলে ঈমান, আত্মবিশ্বাস, আগ্রহের পাশাপাশি সেই সময়ের সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী হতে হবে এবং সব চেয়ে উন্নত পন্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪৫৪ সালের ৬ এপ্রিল বাইজান্টাইন সম্রাটকে আত্মসমর্পণের আহবান জানান। এটা হলো মুসলমানদের মূলনীতি। রক্তপাত যাতে না হয় এই জন্য তিনি এই আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু বাইজান্টাইনগণ এটাকে গ্রহণ না করে

www.pathagar.com

যুদ্ধ ঘোষণা করে। সুলতান ফাতিহও আক্রমণের নির্দেশ দান করেন। এর আগে তিনি তার সকল সেনাবাহিনীকে নিয়ে নামাজ আদায় করেন এবং বিজয়ের জন্য মহামহীম সম্রাট আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে দোয়া করেন। দোয়া করার সময় অসহায় এক বান্দার মত আকুতি মিনতি করে দোয়া করেন। দোয়া করার পর সেনাবাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে, তিনি তার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করার সময় পাহাড়সমূহকে কাঁপিয়ে দিচ্ছেন এমন এক নর শার্দূলের ন্যায় তাঁকে দেখা যাচ্ছিল।

ইয়া আল্লাহ্! কত বিশাল এক যুদ্ধ, কত বড় উদ্যম, কত মহান এক প্রয়াস, ২৯শে মে ফজরের সময়ে প্রাচীরগুলোকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। ইস্তানবুলের বিজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। বাইজান্টাইনের প্রাচীরে সর্বপ্রথম ইসলামের পতাকা উত্তোলন করার ভাগ্য উলুবাতলি হাসানের হয়েছিল। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহর সেনাবাহিনী ভেঙে ফেলা প্রাচীরের ভেতর দিয়ে তীব্রতার সাথে স্রোতের মত ইস্তানবুলে প্রবেশ করেছিল। এই ভাবে একটি যুগের পতন হয়ে অন্য যুগের সূচনা হয়েছিল। ইস্তানবুল বিজয় হওয়ার পর বিজয়ী সেনাপতি সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ আল্লাহ্ তালার শুকরিয়া আদায় করার জন্য আয়া সুফিয়াকে (Hagiya Sufiya) মসজিদে রূপান্তরিত করেন এবং দুই রাকাত শুকরানা নামাজ আদায় করেন। এরপর তিনি হযরত আইয়ুব আল আনসারীর কবর যিয়ারত করতে যান। এইভাবে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ এত বড় বিজয়ের পর অত্যন্ত বিনয়ী হয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া জ্ঞাপনের এক অনুপম দৃষ্টান্ত পেশ করেন।

আজ আমরা মুসলিম হিসাবে, প্রাচীরের সামনে অবস্থানকারী সেনাবাহিনীর মত। আমরা আজ নতুন এক বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছি। আগামী দিনের বিজয়ের জন্য নতুন উদ্যমে লড়ে যাচ্ছি। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি তিনি আমাদেরকে এমন মর্যাদা সম্পন্ন একটি জাতির উত্তরাধিকারী করেছেন। ইস্তানবুলের বিজয় থেকে আমরা যে সকল শিক্ষা নিতে পারি এর মধ্যে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল হযরত আইয়ুব আল আনসারী (রা.)।

জিহাদের ঘোষণা শুনার সাথে সাথে হযরত আইয়ুব আল আনসারী (রা.), কুরআনে কারীম বন্ধ করে সাথে সাথে উঠে দাঁড়ান। তার সন্তানগণ তাঁকে এই

www.pathagar.com

বলে বাধা দেন "বাবা তুমি বস, বসে বসে কুরআন পড়, নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিও না। উত্তরে তিনি তাদেরকে বলেছিলেন" হে আমার প্রিয় সন্তানরা, তোমরা আমাকে বলছ তুমি বসে বসে কুরআন পড়। কিন্তু আমি যখন কুরআন পড়ি, কুরআন তখন আমাকে বলে উঠে দাঁড়াও, জিহাদ কর।

এই মহান সাহাবী ৯০ বছর বয়সে ইস্তানবুলের প্রাচীরের কাছে আসেন। তার বয়সের কারণে তার নিরাপত্তার জন্য সৈন্যগণ তাঁকে তাদের পেছনে রাখতে চেয়েছে কিন্তু তারা তাঁকে তা করতে পারেনি। যুদ্ধের সেই চরম মুহূর্তে আগুন এবং তীরের নিচে দাঁড়িয়ে তিনি সৈন্যদেরকে "দুনিয়াবী কাজে মশগুল হয়ে জিহাদ থেকে দূরে থেকে নিজেদেরকে হুমকির মুখে ঠেলে দিও না" এই আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং তরুণ সৈন্যদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। এত ত্যাগ তিতিক্ষার পর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বাইজান্টাইনের প্রাচীরের পাদদেশে শাহাদাত নাসিব করেন।

"ইসলাম কেমন একটি দ্বীন?" এই বিষয়ে যদি কেহ উৎসাহ বোধ করেন সে যেন ৯০ বছর বয়সে ইস্তানবুল বিজয়ের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে আসা হযরত আইয়ুব আল আনসারী (রা) এর দিকে তাকায়। ইসলামের মূল রূপ হল এটা। দ্বীন ইসলাম হল, জিহাদের দ্বীন। এই জন্য আপনারা শুধু নামাজ পড়বেন, তাসবিহ তাহলিল পাঠ করবেন এই কথা বলা হল মূর্খতা। যদি তাই হত এই মহান সাহাবী, রাসূল (সাঃ) মদিনায় হিযরত করার পর যার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তিনি মদিনা থেকে পৃথক না হয়ে সেখান থেকে সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতিতে নামাজ পড়তেন এবং তাসবিহ তাহলিলে মশগুল থাকতে পারতেন।

ইস্তানবুল বিজয়ের জন্য হযরত আকশেমসেদ্দিন এর ভুমিকাও অনেক বিশাল। তাকেও আমাদেরকে আমাদের আদর্শ হিসাবে স্মরণ করতে হবে। তিনি ছিলেন একজন বড় আলেম। ইস্তানবুলের বিজয়াভিজানে তিনি আমাদের জন্য এক অনুপম দৃষ্টান্ত। ফাতিহর একজন উস্তাদ হিসাবে, প্রতিটি গুহায় গিয়ে গিয়ে তিনি সৈন্যদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনা জুগিয়েছিলেন। এর থেকে যাতে বর্তমানের কিছু আলেমগণ শিক্ষা গ্রহণ করেন এই জন্য উনার কথা আলোচনায় নিয়ে আসলাম। কেননা এটা ধারণা করা হয়ে থাকে যে শুধু তারা নামাজ পড়ে তাসবীহ তাহলিল করার মধ্যেই ইবাদতকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। না, নতুন একটি দুনিয়া প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা যদি সর্বাত্মকভাবে সকল শক্তি দিয়ে

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা না চালাই তাহলে নিজেদেরকে সত্যিকারের ঈমানদার বলে দাবি করতে পারব না।

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ যখন ইস্তানবুল বিজয় করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন ২১ বছরের একজন টগবগে যুবক। ইস্তানবুলের বিজয় যেমন অনেক বড় এবং মহান একটি ব্যাপার ঠিক তেমনিভাবে যারা ২১ বছর বয়সে এই বিজয়ের জন্য ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে কাজ করেছেন তারাও তেমন মহান এবং মর্যাদাবান। একটি দেশের আসল শক্তি ট্যাঙ্ক, ক্ষেপণাস্ত্র এবং অর্থবিত্ত নয়। বরং একটি দেশের আসল শক্তি হলো ঈমানের বলে বলীয়ান যুবসমাজ।

হে আমার প্রানপ্রিয় যুবক ভাই!

আমাদের এই জীবন সত্যের সাথে মিথ্যার, সুন্দরের সাথে অসুন্দরের, উপকারীর সাথে ক্ষতিকারীর, আদালতের সাথে জুলুমের দ্বন্দ্বের সাথে সম্পৃক্ত। ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, সমগ্র দুনিয়ায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার সকল উপাদান ইসলামে রয়েছে। আর যুবকরা হলো এই শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি। শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সমৃদ্ধি সমগ্র মানবতার চাহিদা। মুসলিম যুব সমাজকেও এই গুণাবলীসমূহকে বুকে ধারণ করে চলা একান্ত কর্তব্য।

এই গুণাবলীকে ধারণ করে না চলার কারণে সমগ্র মানবতা আজ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। মুসলিম বিশ্ব বর্ণবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের রোষানলে পড়ে আজ এক রক্ত গঙ্গায় পরিণত হয়েছে। অপরদিকে ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্ব এবং চরিত্রহীনতা সমগ্র যুবসমাজকে এক হতাশার সাগরে নিমজ্জিত করেছে। এই হতাশা এবং দুর্দশা থেকে বের হওয়ার একমাত্র পথ ইসলাম।

মানবতার কল্যাণের জন্য কাজ করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আমাদের দাওয়াতের মূল ভিত্তি হল সম্মত করানো (convince)। আমাদের উদ্দেশ্য হল সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্য আমাদের সকল শক্তি দিয়ে কাজ করা। যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের দিক পরিবর্তনকারী এবং ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার আন্দোলনে মূল চালিকা শক্তি ছিল যুবকগণ। এই জাতি চেলেবি মেহমেত, সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহর মত অনেক বীরের জন্ম দিয়েছে, ভবিষ্যতে আরও দিবে ইনশাল্লাহ।

www.pathagar.com

যুবকরাই হলো আমাদের আন্দোলনের ইঞ্জিন। ইসলামের পতাকাকে সর্বোচ্চ শৃঙ্গে স্থাপনকারী, উলুবাতলি হাসানের পথ ধরে দাওয়াতের পতাকাকে বহন করে সামনের দিকে এগিয়ে যায় যুবকেরাই। জীবনকে মানবতার কল্যাণের আন্দোলনে উৎসর্গকারী ইসলামী আন্দোলনের এই যুবকেরা, গতকালের মত আগামী দিনেও বীরত্বের মহাকাব্য রচনা করার মত এক বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনের যুবকদেরকে দৃঢ় আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী হতে হবে, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার দিকে নজর রাখতে হবে। ইবাদতসমূহকে কোন ক্রমেই অবহেলা না করা, চরিত্রবান একজন মানুষ হিসাবে নিজের আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সমগ্র মানবতার কল্যাণে কাজ করা।

আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ শুধুমাত্র অনেক বড় রাষ্ট্রনায়ক, অনেক বড় বিজ্ঞানী হওয়ার কারণে নয়, একই সাথে সকল দিক থেকে শক্তিশালী হওয়ার কারণেই দুনিয়ার এত বড় বড় সেবা করার তওফিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে দিয়েছিলেন। কেননা আমাদের এই আনাতোলিয়াতে সব সময় আলেমগণ মানুষকে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন এবং সব সময় আমাদের যুবকদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়েছিলেন। এই সুন্দর মানুষের উদাহরণকে সামনে রেখে তাদের আদর্শকে বুকে ধারণ করে একই ঈমান এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠেছিল। একজন সাঈদ চাউশঅলু এভাবেই আসত। ইতিহাসের সকল বিজয় অস্ত্র দিয়ে নয়, সামরিক শক্তির বলে নয় বরং ঈমান এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে। ঈমান সকল কিছুর মুলকে গঠন করে এবং যুবক হিসাবে আমাদেরকে মজবুত একটি ঈমানের অধিকারী হতে হবে।

প্রিয় যুবকরা,

মানুষের মুক্তি এবং কল্যাণের জন্য সকল শক্তি দিয়ে কাজ কর। প্রতিটি নিঃশ্বাসের হিসাব দিতে হবে এই বিষয়টিকে মনে রেখে সত্য এবং কল্যাণের পথে এগিয়ে চল। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাও। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে আজ তোমাদের অনেক দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে।

কেননা আসল মারিফাত হল দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করা এবং সেবার মাধ্যমে সত্যের পথে অটল ও অবিচল থাকা। তাছাড়া চা স্টলে বসে বীরত্ব দেখানো অনেক সহজ।

www.pathagar.com

জুলুমে পরিপূর্ণ আজকের এই দুনিয়ায়, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য দেহের সবচেয়ে সুস্থ কোষ, ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত সন্তানদের উপর অর্পিত হয়েছে। যদি একটি দেহের সুস্থ কোষসমূহ কাজ করে তাহলে দেহ সুস্থ এবং সবল থাকে আর যদি দূষিত ও অসুস্থ কোষসমূহ কাজ করে তাহলে দেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে। সুস্থ কোষ সমূহ হল ইসলামী আন্দোলন। ইসলামী আন্দোলনের কাজসমূহ মানবজাতির বছরের পর বছর ধরে প্রতীক্ষিত কল্যাণ এবং শান্তিময় একটি পৃথিবীর জন্য।

বর্ণবাদী সাম্রাজ্যবাদীগণ যেমনিভাবে বাতিল মতবাদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে আজকের এই জুলুমতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে, আমাদেরকেও সত্য এবং ন্যায়ের ঝাণ্ডাকে বুকে ধারণ করে জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে দো'জাহানের সফলতার জন্য জান-মাল দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের এই জাতি ১০০০ বছরের বেশি সময় ধরে ইসলাম এবং মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিল। এই জাতিকে ভয় দেখিয়ে, জুলুম করে, নির্যাতন করে তাদের বিশ্বাস থেকে, ইতিহাস থেকে পৃথক করতে পারেনি। ডানপন্থী, বামপন্থি, লিবারেল এই সকল পরিভাষার কোন সম্পর্ক আমাদের বিশ্বাসের সাথে এবং ইতিহাসের সাথে নেই।

আমরা এই সকল পরিভাষার কোনটিকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি না। আমরা এগুলার কোনটিই নই। আমাদের একমাত্র এবং কেবলমাত্র আদর্শ হলো ইসলাম। পাশ্চাত্যের এই সকল ইজম দিয়ে মানবতার কোন কল্যাণ আসেনি, আসবেও না। ১৯৬৯ সালে আমরা আমাদের আন্দোলন শুরু করেছি। আমাদের এই আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি হল ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত যুব সমাজ। তোমাদের কাজের বরকতেই সমগ্র মানবতা মুক্তির দিশা পাবে ইনশাআল্লাহ্।

আমাদের দাওয়াত হলো ইসলাম। আমাদের উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করা। আমাদের লক্ষ্য হলো আল্লাহর এই জমীনে আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের আশা হলো সমগ্র মানবতার কল্যাণ সাধন করা। আমাদের পথ হলো জিহাদ। আমাদের পদ্ধতি হল মানুষকে সম্মত (convince) করানো। মানবজাতির মুক্তি কেবল মাত্র ইসলামের মাধ্যমেই সম্ভব। ইসলাম হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি জীবন বিধান।

www.pathagar.com

২০০৭ সালে এক আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর সাথে।

ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেইনের সাথে। যাকে আমেরিকান বাহিনী এক ঈদের দিন সকালে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে।

www.pathagar.com

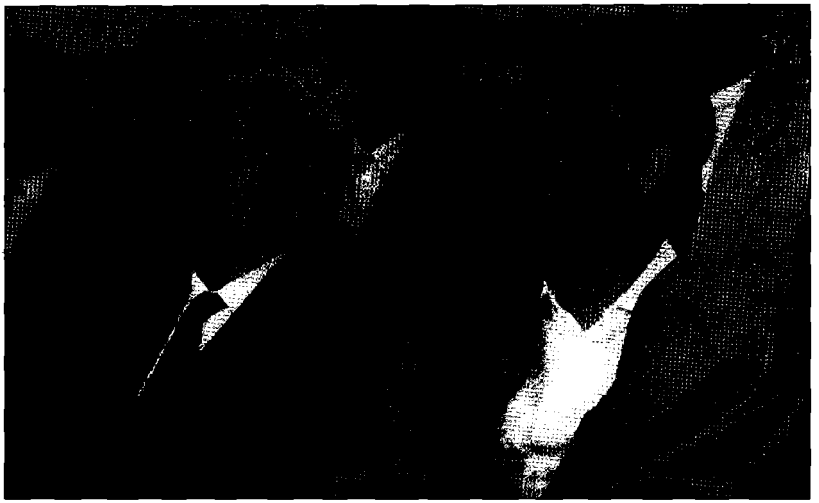

তিউনিসিয়ার ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা রশিদ আল ঘানুশির সাথে।

সৌদি আরবের সাবেক বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজের সাথে।

www.pathagar.com

এই জন্য এটি একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, এখানে না আছে বেশি না আছে কোন কমতি। এই আন্দোলনের জন্য কাজ করার ভাগ্য সকলের হয় না। এই দ্বীনের বিজয়ের জন্য রাত-দিন সমগ্র শক্তি দিয়ে কাজ করুন অথবা সুন্দর বিছানায় ঘুমিয়ে থাকুন, এই সত্য দ্বীনের বিজয় না একদিন এগিয়ে আনতে পারবেন, না একদিন পিছিয়ে দিতে পারবেন। সব কিছুর মূল হলো আমি এই আন্দোলনে কতটুকু ভূমিকা পালন করছি।

এই জন্য মহান আল্লাহ্ যদি তার কোন বান্দাকে পছন্দ করেন তাহলে তাঁকে দিয়ে এই আন্দোলনে কাজ করাবেন। সব সময় সুন্দর এবং কল্যাণের পথে কর্মব্যস্ত রাখবেন। আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করবেন, যাতে করে আল্লাহ্র সাহায্য আসে। যখন আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য আসবে তখন কেউ আপনাদেরকে পরাভূত করতে পারবে না। দুনিয়াকে সঠিক পথে পরিচালনা মিল্লি গরুশের কাজের সাথে সম্পৃক্ত। আপনাদের মধ্যকার ঐক্য এবং শৃঙ্খলা বিনষ্ট করবেন না।

হে ইসলামী আন্দোলনের ভাইয়েরা, আমি যা বলছি দয়া করে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। ইতিহাসের এই ক্ষুদ্র সময়ের মূল্য হয়তো আজ আমরা বুঝতে পারছি না। কিন্তু এমন এক সময় আসবে আপনারা এমন কি কাজ যে করলেন, ভবিষ্যৎ বংশধর আপনাদেরকে বুঝবে, আপনাদের কথা আলোচনা করবে। এই সকল কাজের সময় সর্বদা আমাদের এই দোয়া করা প্রয়োজন "ইয়া রিব্বি, তুমি সব সময় সত্যকে, আমাদের সামনে সত্য হিসাবে দেখাও এবং বাতিলকে বাতিল হিসাবে দেখাও। সত্যকে ধারণ করে চলার জন্য তওফিক দান কর এবং বাতিল থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।"

আপনাদের এই প্রচেষ্টা এবং বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা এই কথা প্রমাণ করে যে ইসলামিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কেউ বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। এই বাস্তবতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। অবশ্যই অবশ্যই ইসলামিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হবেই প্রাচ্য হোক আর পাশ্চাত্য হোক, যে কোন পদ্ধতি হোক না কেন কখনো চিরকাল ধরে থাকবে না। তারা যাই করুক না কেন, যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন তাদের সকল ষড়যন্ত্র ধ্বংস হবেই হবে।

এটা সবাই জেনে রাখুন যে,

وَاللّٰهُ نُورِه مُتِمُّ-

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র ফায়সালা হলো তিনি তার নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেনই। এই সকল ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী আপনাদের সামনে পেশ করার পর সবশেষে আমি আপনাদেরকে এই কথা বলতে চাই যে, আমি এই সংগ্রাম কোন পদ-পদবি, শান-শওকত কিংবা নির্বাচনে আমাকে ভোট দিবে এই উদ্দেশ্যে করি নাই। আমি যাই করেছি সব কিছুই মহান আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

বসনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা এবং ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ জ্ঞান সম্রাট আলিয়া ইযযেতবেগভিচের সাথে।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ইয়াসির আরাফাতের সাথে।

www.pathagar.com

লিবিয়ার দীর্ঘদিনের প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফির সাথে।

২০১১ সালে বোমা হামলায় শাহাদাত বরণকারী আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট বুরহান উদ্দিন রব্বানীর সাথে।

www.pathagar.com

বিশ্বের অন্যতম পরিচিত মুখ জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সাবেক আমীর এবং বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা মরহুম কাজী হুসেইন আহমেদের সাথে।

আজারবাইজানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আবুল ফাইজ এলচির সাথে।

www.pathagar.com

চেচনিয়ার প্রতিরোধ আন্দোলনের মহান নেতা, ২০০৫ সালে রুশ বাহিনীর কমান্ডো হামলায় শাহাদাত বরণকারী শহীদ আসলান মাশহাদভের সাথে।

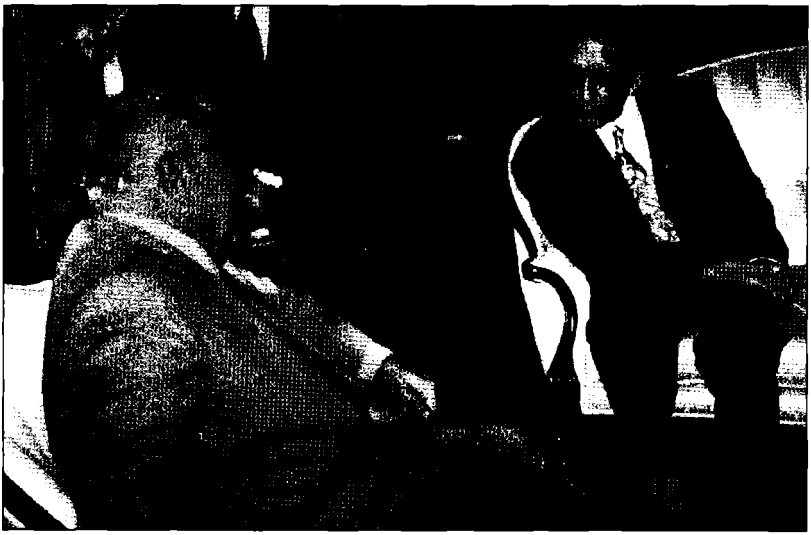

উইঘুর-এর মহান রাজনীতিবিদ, পূর্ব তুর্কিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে আজীবন সংগ্রামকারী নেতা ইউসুফ আল্পতেকিনের সাথে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহান নেতা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইসলামের পথে সংগ্রামকারী এবং জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে শাহাদাতের অমীয় সুধা পানকারী নেতা প্রফেসর গোলাম আজমের সাথে।

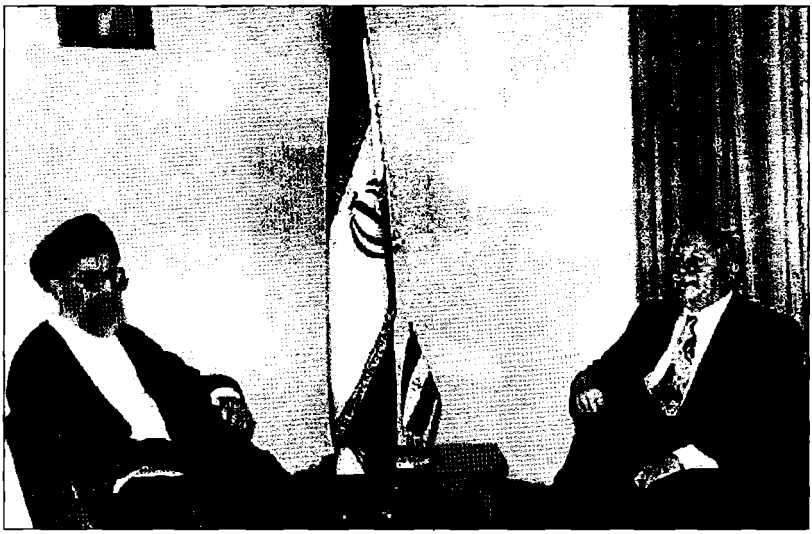

ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেই এর সাথে।

www.pathagar.com

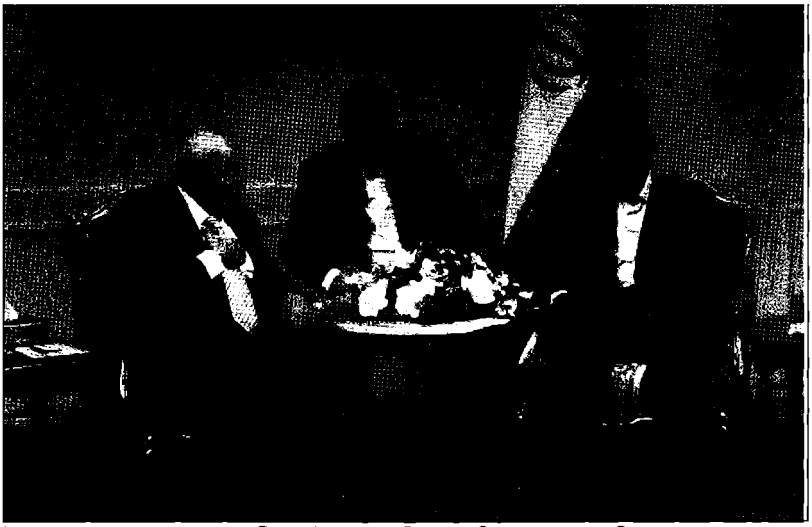

ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুসলিম বিশ্বের জনপ্রিয় মুখ মাহমুদ আহমাদিনেজাদের সাথে।

আমেরিকান মুসলিম নেতা লুইস ফাররাখান এর সাথে।

www.pathagar.com

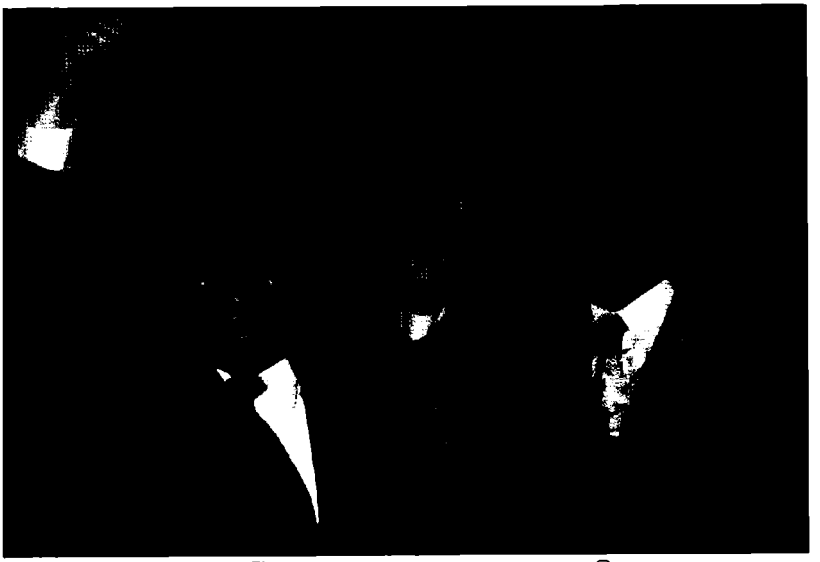

বিশ্ববিখ্যাত বক্সার পরবর্তীতে মুসলমান হওয়া মুহাম্মাদ আলী ক্লে এর সাথে।

ডি-৮ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে মিসরের স্বৈরশাসক হুসনি মুবারকের সাথে এক আলোচনায়।

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ার ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা পাস এর সংগ্রামী আমীর আব্দুল হাদি আওআং এবং সুদানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ যাবের আজ জাহেব এর সাথে।

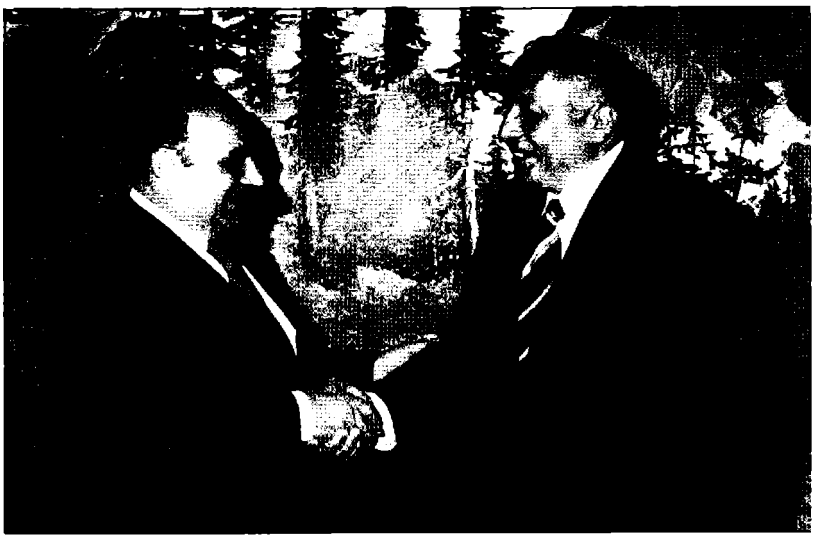

সাইপ্রাসের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মহান নেতা রাউফ দেক্কতাশ এর সাথে।

www.pathagar.com

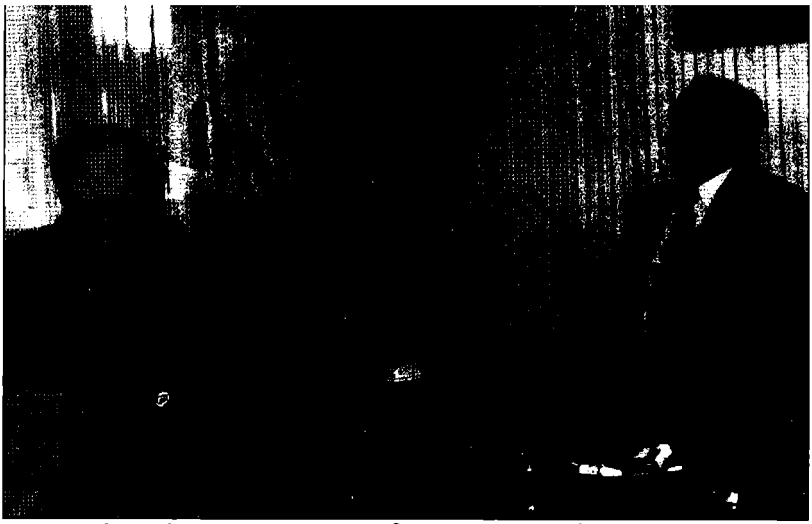

সাইপ্রাস বিজয়াভিযানে নেতৃত্ব দানকারী তুরস্কের তৎকালীন সেনাপ্রধান জামাল গুরসেলের সাথে।

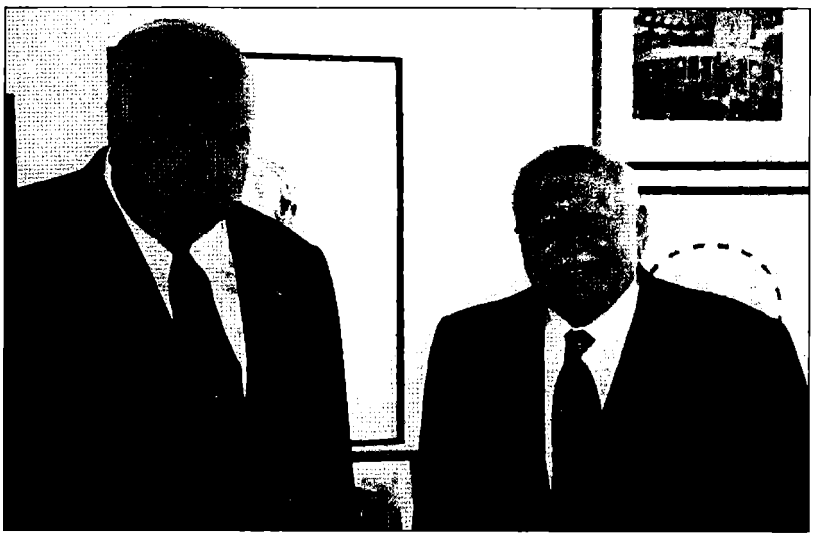

জার্মানীর সাবেক চ্যান্সেলর হেলমুত কহল এর সাথে।

www.pathagar.com

ইয়াহুদীবাদের অন্যতম পরিচিত মুখ আমেরিকার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের সাথে।

ডি-৮ প্রতিষ্ঠার পর ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হাশিমি রাফসানজানির সাথে এক আনন্দময় মুহূর্ত।

www.pathagar.com

তুরস্কের আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মেহমেত জাহিদ কত--- সাথে।

মিল্লি গরুশ আন্দোলনের প্রথম দিকে ঘুরে বেড়াতেন মানুষের ঘরে ঘরে।

www.pathagar.com

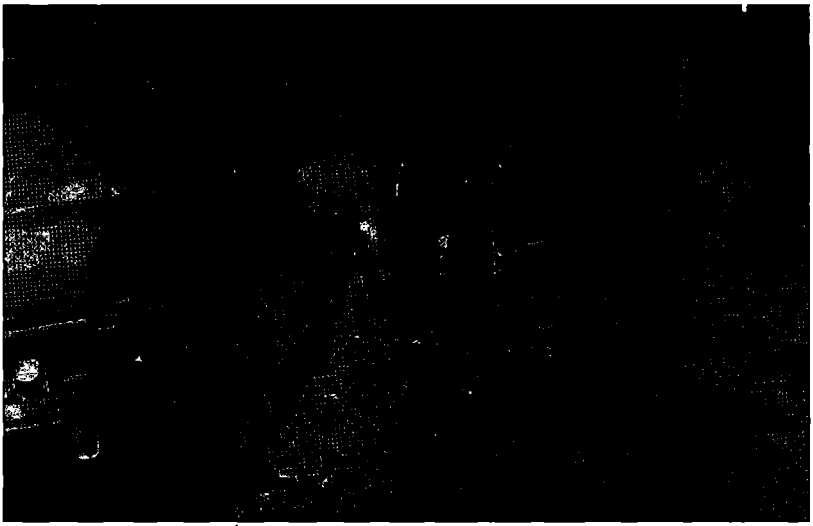

হয়ত একটি রাস্তা প্রতিষ্ঠা করবেন না হয় একটি রাস্তা খুঁজে বের করবেন। পাহাড়, পর্বত সকল কিছু পাড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশের প্রান্ত থেকে প্রান্তরে।

তুরস্কের আদিয়ামান শহরের একটি বৃহৎ কারখানা উদ্বোধনকালে।

www.pathagar.com

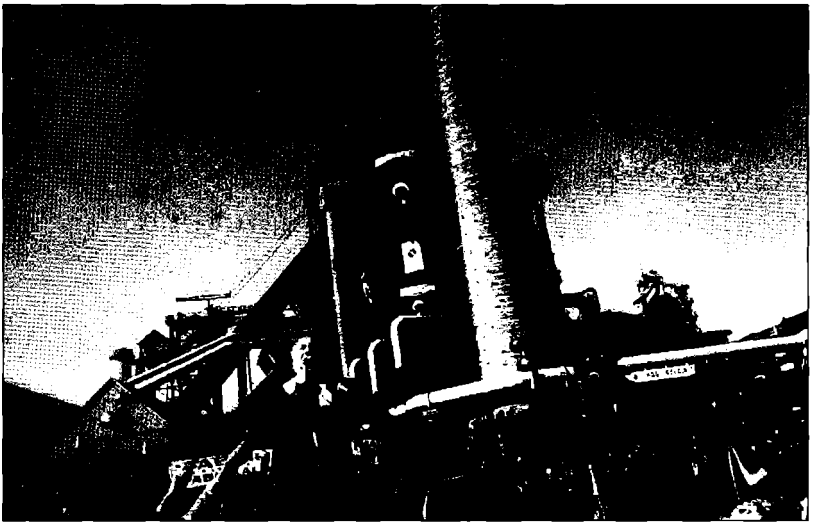

ইস্কেন্দিরিয়া শহরে লোহা এবং ইস্পাত শিল্পের উদ্বোধনকালে জনতার উদ্দেশ্যে দেয়া এক বক্তব্য।

শীত ও বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রান্তর থেকে প্রান্তরে।

www.pathagar.com

মিল্লি সালামেত পার্টির কাউন্সিলে বক্তব্য দেওয়ার সময়ে।

শিল্পায়ন ছাড়া দেশকে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাড় করানো সম্ভব নয় এই শ্লোগান কে সামনে রেখে ফ্যাক্টরি উদ্বোধনকালে।

www.pathagar.com

হে প্রভু কেবলমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই। তুমিই কেবল মাত্র আমাদের ভরসার স্থল।

আদালতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে শুনানী করছেন।

www.pathagar.com

মানবতার এখন সময় হল ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় ফিরে আসা।

মিল্লি নিজাম পার্টির সময়ে অর্থনৈতিক বিষয়ক একটি কনফারেন্স বক্তৃতা দেয়ার সময়ে।

ডি-৮ এর প্রথম সম্মেলন উদ্বোধনকালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের আহ্বান ইসলাম। আমাদের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন। আমাদের আশা সমগ্র মানবতার কল্যাণ সাধন। আমাদের পথ জিহাদের পথ। আমাদের কর্মপন্থা মানুষের মন জয় করেই তার সম্মতি অর্জন। মানবজাতির মুক্তির একমাত্র সম্ভাবনা ইসলাম, যা আল্লাহ্ প্রদত্ত একমাত্র জীবন-বিধান। এজন্যই এটি একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যাতে নেই কোন কম-বেশীর অবকাশ। এই ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মতৎপরতায় শামিল হবার সৌভাগ্য সকলের হয় না। এই দ্বীনের বিজয়ে কেউ দিন-রাত কাজ করুক বা না করুক, কঠোর পরিশ্রমী হোক কিংবা অলসতায় নরম বিছানা বেছে নিয়ে মাথা গুঁজে থাকুক, বিজয়কে একদিন এগিয়েও আনতে পারবে না একদিন পিছিয়েও দিতে পারবে না। বরং সব কিছুর মূলে হল 'এই সত্য আহ্বানের কর্মতৎপরতায় কতটুকু ভূমিকা পালন করছি' তা...

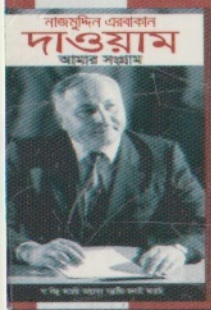

DAVAM
a book by
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Price: BDT 250.00 only US $5.00

984-311-426-0

MBP
MEDHA BIKASH PROKASHON